মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য আখ্যানকাব্যের ভিত্তিতে মধ্যযুগের বাঙালী নারী সমাজ।

শ্রীমতী মায়া ধর, (দাস) এম, এ।

পি- এইচ, ডি, (কলা-শাখা) ডিগ্রিলাভের জন্য

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত

ST - VERF

Ref.
81.093

STOCK TAKING - 2011

101695
26 JUL 1989

ভূমিকা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর মহুয়া কাব্যের 'সবলা' কবিতায় বলেছেন —

নারীকে আপনভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা ?
নত করি মাথা
পথ প্রান্তে কেন রব জাগি
ক্লান্ত ধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে ?
শুধু শূন্যে চেয়ে রব ? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ ?

গতিশীল মানব জীবন স্রোতের উৎস মুখে রয়েছে পুরুষ ও নারীর দ্বৈত ভূমিকা । একই আত্মার দুটি রূপ । একই শক্তির দু'টি মেরু । একটি ধনাত্মক অপরটি ঋনাত্মক । এই দুই মেরুর সার্থক মিলনে গতি - শীল শক্তি পায় প্রগতির পথ - প্রজ্বলিত হয় আনন্দের ও আলোর বন্যা। পরস্পর পরিপূরক দুটি মেরু আপনাপন বৈশিষ্ট্যে ও মৌলিকতায় স্বয়ং সম্পূর্ণ । কিন্তু জৈবী চাহিদার তাগিদে ও বাহুবলের ক্ষমতান্ধতায়

যখন একে অপরকে তার প্রাপ্য মর্যাদার আসন থেকে নামিয়ে এনে ভোগ লালসা চরিতার্থতায় মেতে ওঠে তখন সৃজন গতি হয় স্তিমিত । নির্যাতিতের অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে । যুগ যুগ ধরে এই দুই মেরুর পারস্পরিকতা বোধের অভাব মানব সমাজে নামিয়ে এনেছে অসাম্যের এক অচলায়তন বাধা । কবি কণ্ঠে 'নারীর আপন ভাগ্য জয় করিবার' অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা তাই বিংশ শতকের মুক্তি আন্দোলনেরই এক তাত্ত্বিক ধ্বনি । আধুনিক যুগ এই অচলায়তনের রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত হেনেছে । যে অতীত 'ভুবনে ভুবনে' গোপনে কাজ করে গেছে সেই গোপনীয়তাকে লোক চক্ষুর আওতায় এনে ফেলে আধুনিক মানসিকতা চায় অবরুদ্ধ জীবন গতিকে কলুষ মুক্ত করতে । যুক্তিবাদের নিরীক্ষায় অতীতের অন্ধকার বিন্দুগুলিকে আলোকিত করে ত্রুটিমুক্ত চলার পথ রচনা করার অনুসন্ধানী তৎপরতা আধুনিকতা ।

সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় সমাজ জীবনের নানা চিত্র । কারণ সাহিত্যিকেরা সামাজিক সংবেদনশীল মানুষ । সমাজ জীবনের সমস্ত প্রতিক্রিয়া এই সংবেদনশীল মনগুলিকে আলোড়িত করে । তাই সমাজকে জানতে হলে সাহিত্যকে একটি অন্যতম উপাদান রূপে গ্রহণ করতে হবে । মধ্যযুগের সমাজ জীবন নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে । দীনেশ চন্দ্র সেন, তমোনাশ দাশগুপ্ত থেকে শুরু করে অনেকেই মধ্যযুগের বাঙলাকাব্যে সমাজের রূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন । ঐতিহাসিকেরাও মধ্যযুগের

বাঙলার ইতিহাস লিখতে গিয়ে মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য আখ্যান কাব্যকে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা তৎকালীন বাঙলার সমাজ জীবনের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন চিত্র নিয়ে আলোচনা হয়েছে অনেক। কিন্তু আধুনিক দৃষ্টি-ভঙ্গিতে ঐ মধ্যযুগের বাঙলাকাব্যে নারী জীবনের সামগ্রিক প্রতিফলন নিয়ে কোন উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণ আমরা পাই না। আধুনিক যুগে পৃথিবীর সর্বত্র নরনারীর সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। নারী আজ সমাজ জীবনের সামগ্রিক বিকাশের ও বিবর্তনের ক্ষেত্রে সমান দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে এসেছে। নারীর এই অধিকার আক্ষরিক অর্থে স্বীকৃতও হয়েছে। আধুনিক জীবন বোধের এই চেতনার পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য তাই প্রয়োজন সমাজ বিবর্তনের পথে মধ্যযুগে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ। আর এই অবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে সে যুগের কাব্যে।

বর্তমান গবেষণায় মধ্যযুগের কাব্যে নারী চরিত্র যেভাবে প্রতি-ফলিত হয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যযুগে সমাজে নারীর স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। ভারত তথা বাঙলাদেশের সমাজ জীবনের উপর প্রাচীন শাস্ত্র-পুরাণ, বেদ, উপনিষ-দের প্রভাব অনস্বীকার্য। উপনিষদই আমাদের শিখিয়েছে — 'নৈষা মতি: তর্কেনাপনীয়া' — আমরা তর্ক করি নাই। বিভিন্ন বিধানকে আমরা বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছি। স্বাধীন চিন্তা নেই —

স্বত:স্ফূর্ত কর্ম্ম স্পৃহা নেই — কতকগুলো 'কলের পুতুল' যেন সমাজ জীবনে চলা-ফেরা করছে। বিভিন্ন বিধিবিধান, নিষেধহুঙ্কারের মধ্যে কে যেন স্বাভাবিক জীবনের স্বাদ শুষে নিয়েছে। কেউ কোন স্বাধীন চিন্তা করতে পারেনি। বিশেষত স্মৃতিশাস্ত্র দ্বারাই সমাজ জীবন শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত ছিল। এই সব শাস্ত্রানুশাসন মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করেছে। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার হস্তান্তরের দ্বারাও সমাজ জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। শাসক-গোষ্ঠীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রানুশাসনের ধারাও কখনো কখনো পরিবর্তিত হয়েছে। কাব্যরচয়িতাদের ব্যক্তিগত জীবন যেমন রাজানু-কূল্যে বা রাজরোষে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তেমনি তাঁদের কাব্যদেহেও নানা অনুকূল প্রতিকূল চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজ দেহের গঠন, বিন্যাস ও রীতিনীতির উপর শস্ত্র ও শাস্ত্রের এই প্রভাব যখন যেমন ভাবে পড়েছে তখন তেমনি ভাবে কাব্যদেহে নরনারীর চরিত্র এসে পড়েছে।

মধ্যযুগের সমাজ জীবনে নারীর স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে যে সব কাব্য গ্রন্থের ও প্রামাণিক ইতিহাস, স্মৃতিশাস্ত্রাদির সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে সেই সব গ্রন্থ, গ্রন্থকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। মধ্যযুগের জনপ্রিয় কাব্য হ'ল মঙ্গলকাব্য সমূহ। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্যগুলি বিভিন্ন নামে বিভিন্ন কবির দ্বারা রচিত হয়েছে। মূলকাহিনী ও গতানুগতিক বর্ণনা ও উপাখ্যান উপস্থাপন রীতি

একঘেয়ে হলেও বিভিন্ন রচয়িতার রচনায় স্থানে স্থানে বিদ্যুৎ ঝলকের মত ঝলকিত হয়েছে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর উজ্জ্বল রশ্মি। এই সব রশ্মির আলোকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে নারী জীবনের প্রকৃত অবস্থানের বিষয়। যিনি আমায় ছাত্রজীবনে ও গবেষণার কাজে নানা নির্দেশ সস্নেহ উপদেশ দিয়ে আমাকে নিরন্তর অনুপ্রাণিত করেছেন তিনি পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ অশ্রুকুমার সিকদার — তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

শ্রীমতী মায়া ধর (দাস)।

বিষয়-সূচী

পৃষ্ঠা

১। প্রথম পরিচ্ছেদ ... ... ১ - ৯২

২। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ... ... ৯৩ - ২৮১

৩। উপসংহার ... ... ২৮২ - ৩১১

৪। গ্রন্থপঞ্জী ... ... ৩১২ - ৩১৭

।। প্রথম পরিচ্ছেদ ।।

মধ্যযুগের সমাজে নারী : ইতিহাসে ও তত্ত্বে

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে ১২৭৮ সালের বন্যার ফলে একটি গ্রামের বর্ণনা দিয়েছেন। ''গ্রামস্থ প্রজাদিগের ধান সকল ডুবিয়া গেল। গোরু সকল অনাহারে মরিয়া যাইতে লাগিল। প্রজাগণ শশব্যস্ত। সে সময়ে জমীদারের কর্ত্তব্য, অর্থদানে, খাদ্যদানে প্রজাদিগের সাহায্য করা। তাহা দূরে থাক, খাজনা মাপ করিলেও অনেক উপকার হয়। তাহাও দূরে থাক, খাজনাটা দুদিন রহিয়া বসিয়া লইলেও কিছু উপকার হয়। কিন্তু রহিয়া বসিয়া খাজনা লওয়া দূরে থাক, গোমস্তা মহাশয়েরা সেই সময় পাইক পিয়াদার সঙ্গে বাজে আদায়ের জন্য আসিয়া দলবল সহ উপস্থিত হইলেন। ..... একটি তালিকা করিয়া ইহাদের নিকট ৫৪৵ আদায় করিতে বসিলেন। ..... আদায় করিয়া লইয়া গেলেন তাহার ৪।৫ দিনের মধ্যেই আবার উপস্থিত। বাবুদের কন্যার বিবাহ। আর ৪০ টাকা তুলিয়া দিতে হইবে।''

বঙ্কিমচন্দ্র প্রদত্ত বিবরণ উপন্যাস নয়, কেননা, তিনি সকল ঘটনা 'ইন্ডিয়ান্ অবজরবর' থেকে গ্রহণ করেছেন। পল্লীগ্রামে এই জাতীয় ঘটনা আজও ঘটছে।

তিনি লিখেছেন — ''জীবের শত্রু জীব, মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য, বাঙালী কৃষকের শত্রু বাঙালী ভূস্বামী''।

এই উদধৃতির প্রয়োজন এইজন্য যে এই জাতীয় ঘটনাই ঘটেছিল বাঙলাদেশে পাঠান আমলে সামন্ততন্ত্রের শাসনে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনেই' তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। প্রবন্ধের চতুর্থ পরিচ্ছেদে আছে —

''মুসলমানদিগের সময়ে প্রথম জমীদারের সৃষ্টি। তাঁহারা রাজ্য শাসনে সুপারগ ছিলেন না। যেখানে হিন্দু রাজাগণ অবলীলাক্রমে প্রজাদিগের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিতেন, মুসলমানেরা সেখানে কর সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইলেন। তাঁহারা পরগণায় পরগণায় এক এক ব্যক্তিকে কর সংগ্রাহক নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা এক প্রকার কর সংগ্রহের কন্ট্রাক্টর হইলেন। রাজার রাজস্ব আদায় করিয়া দিবেন, তাহার বেশী যাহা আদায় করিতে পারিবেন, তাহা তাঁহাদিগের লাভ থাকিবে। ইহাতেই জমীদারের সৃষ্টি, এবং ইহাতেই বঙ্গদেশে প্রজাপীড়নের সৃষ্টি।....রাজার রাজস্বের উপর যত বেশী আদায় করিতে পারেন ততই তাঁহাদের লাভ। সুতরাং তাঁহারা প্রজার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া বেশী আদায় করিতে লাগিলেন। প্রজার যে সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল, তাহা বলা বাহুল্য।''

আমাদের আলোচ্য সময় সীমা চতুর্দশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত, কিন্তু এই সময়ের সাহিত্য ও সমাজের রূপ বিশ্লেষণ করতে হলে একটু পেছনে ফিরে যেতে হবে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকেই পাঠান সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিলজীর আক্রমণে বৃদ্ধ রাজা লক্ষণসেনের নদীয়ার সিংহাসন ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে প্রস্থানের পর থেকে বাঙালী কোন প্রকারে আত্মরক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। স্বভাবতই কোন রকম সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা এ যুগের বাঙালীর ছিল না। বখ্‌তিয়ার খিলজীর পর থেকে (১২০৬ খ্রী:অ:) হুসেন

সাহের সিংহাসন লাভ (১৪৯৩ খ্রী:অ:) পর্যন্ত এই পাঠান শাসনের প্রতিকূল পরিবেশকে চিনে নিতে না পারলে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস বা সমাজের রূপ জানা যাবে না । এই যুগকে অনেকেই অন্ধকার যুগ বলেছেন । কিন্তু আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি । লক্ষ্য করে যেতে হবে , এই অন্ধকারেও মাঝে মাঝে আলোর শিখা জ্বলে উঠেছে — সাহিত্যের ফসলও ফলেছে । সুতরাং এই যুগকে কোন ভাবেই বন্ধ্যা যুগ বা অন্ধকার যুগ বলা চলে না । এই যুগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে বিবৃত হলো —

ক) খিলজী আমীর-ওমরাহের অধীনে বাঙলা (১২০৬ - ১২২৭ খ্রী:অ:)।

বঙ্গবিজেতা বখ্‌তিয়ার খিলজীকে নিহত হতে হয় এক বিশ্বাসঘাতকের হাতে । তারপর থেকে প্রায় বিশ বছর ধরে বাঙলাদেশে চলেছিল খিলজী বংশীয় আমীর ওমরাহ্‌গণের দ্বন্দ্ব কলহ ও বিবাদ বিসম্বাদপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা। বখ্‌তিয়ার খিলজীর হত্যাকারী ইখ্‌তিয়ারকে এই ওমরাহ্‌গণ মানতেন । এঁরা এত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন যে যখন যাকে খুশী গৌড়ের সিংহাসনে বসিয়েছেন এবং নামিয়েছেন ।

খ) দিল্লীর সুলতানদের অধীনে বাঙলা (১২২৭ - ১৩৪১ খ্রী: অ:)।

এরপর শতাধিক বৎসরের জন্য বাঙলায় প্রতিষ্ঠিত হলো দিল্লীর সুলতানদের আধিপত্য । দিল্লী থেকে তাঁরাই শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠাতেন । সুযোগ পেলে এইসব শাসনকর্তা মাঝে মাঝে দিল্লীর আনুগত্য ত্যাগ

করে স্বাধীন সুলতান হয়ে বসতেন । সুতরাং যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকতো । এই দীর্ঘ শতাব্দী ধরে দুটি উপশাখার শাসনাধীন ছিল বাঙলাদেশ - মামলুক শাসন (১২২৭ - ১২৮৭ খ্রী:অ:) এবং বলবন শাসন (১২৬৮ - ১৩৪০ খ্রী:অ:)।

গ) **ইলিয়াসশাহী বংশের প্রথম ধারা** (১৩৪২ - ১৪১৩ খ্রী:অ:) ।

এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সামসুদ্দিন ইলিয়াসশাহ্ । রাষ্ট্রে ও সমাজে শৃঙখলা স্হাপনের গৌরব এই বংশেরই প্রাপ্য । কিন্তু লোভ লালসা ও ক্ষমতালিপ্সা এই বংশের তৃতীয় পুরুষে এমন রূপ ধারণ করে যে ইলিয়াসশাহের পুত্র সিকান্দারের শেষ জীবনে তাঁর নিজ পুত্রদেরই সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় । ইলিয়াসশাহের অপদার্থ পৌত্রেরা এই বংশের শাসন বলবৎ রাখতে স্বভাবতই বেশিদিন সক্ষম হন নি ।

ঘ) **গণেশ - জালালুদ্দিনের অধীনে বাঙলা** (১৪১৪ - ১৪৪১ খ্রী:অ:) ।

ইলিয়াসশাহী বংশের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দিনাজপুরের ভাতুড়িয়া পরগণার জমিদার রাজা গণেশ ১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধ বয়সে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন । তিনি এক আদর্শ রীতির প্রবর্তন করেছিলেন — দেশের জ্ঞানী, গুণী, শিল্পী প্রভৃতির সম্মাননার রীতি । গৌড়ের দরবারে দীর্ঘকাল এই রীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল । কবি কৃত্তিবাস সম্ভবত এঁর পৃষ্ঠপোষকতাতেই রামায়ণ রচনা করেছিলেন । রাজা গণেশের পুত্র দ্বিতীয়বার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালুদ্দিন নাম নিয়ে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন । ইনি অতিশয় উৎপীড়ক ছিলেন । ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে জালালুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর

অপদার্থ পুত্র সামসুদ্দিন কিছুকাল গৌড়ের সুলতান হয়েছিলেন। অত্যাচার ও নিপীড়নের জন্য বিখ্যাত এই সামসুদ্দিন ১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীতদাস কর্তৃক নিহত হলে রাজা গণেশের বংশধারা লুপ্ত হয়।

ঙ) ইলিয়াসশাহী বংশের দ্বিতীয় ধারা (১৪৪২ - ১৪৮৭ খ্রী: অ:)।

গণেশ-জালালুদ্দিন বংশের পরে গৌড়ে আবার অরাজকতার অন্ধকার নেমে আসে। কিন্তু এই ধারাতেই বাঙলার সুলতান ছিলেন রুকনুদ্দিন বারবক শাহ। এঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ভাগবতের অনুবাদ করেছিলেন মালাধর বসু — তাঁর গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'।

চ) হাবসী শাসন (১৪৮৭ - ১৪৯৩ খ্রী:অ:)।

এরপর হাবসী শাসনে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয়, সুখের বিষয় তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। তাদের ছয় বছরের শাসন বর্বর অত্যাচার ও বীভৎস উৎপীড়নের শাসন। শেষ শাসক ছিলেন মুজাফর (১৪৮৭ - ১৪৯৩ খ্রী:অ:)। তাঁর সঙ্গে বিরোধ বাঁধলো আমীর ওমরাহ্ এবং অভিজাত বংশীয়দের। যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠলো এবং সৈয়দ হুসেন পাইকের সাহায্যে সুলতানকে হত্যা করলেন। এরপর হুসেনশাহ ক্ষমতা গ্রহণ করে (১৪৯৩ খ্রী:অ:) নতুনভাবে রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তোলার কাজে উদ্যোগী হলেন।

ত্রয়োদশ শতকের সূচনা থেকে পঞ্চদশ শতকের শেষ পর্যন্ত এই হলো বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস।

এখন এই অশান্ত অবস্থায় বাঙালী কি করেছিল তা আলোচনা করা

যেতে পারে।

বাঙালীর সংস্কৃত শাস্ত্রানুশীলন — তুর্কী আক্রমণের আঘাতে বাঙালী যেন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তবে সংস্কৃত শাস্ত্র অনুশীলন একেবারে থেমে থাকেনি। এই যুগে কোন মৌলিক কাব্য ও নাটকের সন্ধান না পাওয়া গেলেও বাঙালী নিজের ঐতিহ্য ও জাতীয় সম্পদ রক্ষা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। যথার্থ সাহিত্য রচনা শুরু হয় লক্ষণসেনের রাজত্বকালে তাঁর রাজ - সভাকে কেন্দ্র করে। এই সভায় ছিলেন পাঁচজন বিখ্যাত কবি — ধোয়ী, শরণ, উমাপতি, গোবর্ধন এবং জয়দেব। রুকনুদ্দিনের আমলে মালাধর বসু রচনা করেছিলেন —'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্য। গণেশের আমলে কবি কৃত্তি - বাস রচনা করেছিলেন 'রামায়ণ'। ত্রয়োদশ শতকে আরও দুটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল —'সদুক্তিকর্ণামৃত' এবং 'কবীন্দ্র বচন সমুচ্চয়'। প্রথমটির সংকলক লক্ষণসেনের মহাসামন্ত বটুদাসের পুত্র শ্রীধর দাস, দ্বিতীয়টির সংকলক কে তা জানা যায় নি। বাঙলা ভাষার উৎপত্তির আগে এবং পরেও বাঙালী সাহিত্য চর্চা করেছে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশে। ধোয়ীর 'পবনদূত' এবং গোবর্ধনের 'আর্যাসপ্তশতী' সংস্কৃত সাহিত্যে বিশিষ্ট রচনা।

সমাজের ইতিহাস — সাধারণ মানুষ নিয়েই সমাজ। এই যুগে যে সমস্ত পর্যটক এদেশে এসেছিলেন তাদের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে দেশে প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকতো। পাঠান যুগের ইতিহাসে জানা যায় যে গৌড়ের হিন্দু জমিদারগণ যে যত বেশী স্বর্ণপাত্র বের করতে পার - তেন তিনি ততই ঐশ্বর্যবান বলে শ্রদ্ধার আসন পেতেন। মানসিংহ বাঙলাকে এই কলঙ্ক থেকে উদ্ধার করেন। তিনি জমিজমার সুব্যবস্থা করে, অর্থনীতি ও রাজস্বের দিক থেকে দেশের উন্নতি করলেন। কিন্তু মোঘল যুগের প্রথম

থেকেই ক্রমে সঙ্কট দেখা দিল, নানা খাতে বাঙ্লার মুদ্রা বাইরে চলে যেতো। কিন্তু সাধারণ লোকের অবস্থা যে ধীরে ধীরে অবনতির পথে যাচ্ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। চৈতন্য জীবনী গ্রন্থে আমরা হিন্দুর উপর মুসলমানদের অনেক অত্যাচারের কাহিনী পড়েছি। অবশ্য কেউ কেউ প্রয়োজনবোধে মুসলমানী আদব কায়দা গ্রহণ করেছিলেন। আবার কেউ বা স্বেচ্ছায় নিজের ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন। জয়ানন্দ লিখেছেন —

ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে।
মোজা পাএ নড়ি হাতে কামান ধরিবে।। (চৈতন্য মঙ্গল)

সমস্ত ষোড়শ শতাব্দী ধরে এই ধর্মান্তর গ্রহণের খেলা চলেছিল এবং মুসলমান সাহচর্যে সমাজের বন্ধনও শিথিল হয়ে পড়েছিল। চৈতন্যাবির্ভাবের ফলে দেশে বিচিত্র বিদ্যা ও বিশেষত ন্যায় দর্শনের চর্চা বিস্তার লাভ করেছিল এবং ন্যায় দর্শন ও স্মৃতিতন্ত্র প্রভৃতির চর্চার কেন্দ্র হয়েছিল নবদ্বীপ, নবদ্বীপই প্রধান সংস্কৃতি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু জনসাধারণ দেবদেবীর পূজা করতো এবং চণ্ডী বা মনসার পূজার দোহাই দিয়ে গোপনে মদ্য মাংস প্রভৃতি খেয়ে লৌকিক দেবতার উপাসনায় প্রচুর ধন ব্যয় করতো। এমতাবস্থায় বৈষ্ণবধর্ম হিন্দু সমাজকে পুনর্গঠন করতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছে।

মঙ্গলকাব্য কি? এই কাব্যের স্বরূপ —

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত বক্তৃতায় মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। অবশ্য পরবর্তীকালে তিনি কবি কঙ্কণের উল্লেখ করেছিলেন মাত্র।

রমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৭৭ সালে ইংরেজী ভাষায় -'Literature of Bengal' নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন তাতে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের বিস্ময়কর প্রতিভার বিশ্লেষণ ছিল, কিন্তু তাতেও মঙ্গলকাব্য নামক কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থের সম্পর্কে তিনি কোন মন্তব্য করেন নি। রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে কবিকঙ্কণের কাব্যকে এবং কেতকাদাসের কাব্যকে 'মনসার ভাসান' বলেছেন। দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' মঙ্গলকাব্যকে সাহিত্যের এক বিশেষ শ্রেণীরূপে বর্ণনা করেছেন।

মঙ্গলকাব্যকে অন্তত: দুটি বিশেষ স্তরের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করতে হয়েছে। প্রথম স্তরটিকে বলা যায় ব্রতকথা। বলাবাহুল্য যে লৌকিক দেবদেবীর প্রসাদ প্রার্থনার জন্যই অন্ত:পুরের মেয়েরা ব্রতছড়ার সাহায্য নিতেন এবং আলপনা ও বিভিন্ন প্রতিচিহ্নের দ্বারা দেবদেবীর বন্দনা করতেন। ব্রতছড়ার কোন রচনাকার নেই। সমাজই ব্রতকথার স্রষ্টা, সমাজ-মানুষ থেকেই এর আবির্ভাব। অনুমান হয় মুসলমান অভিযানের আগেই সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসা এবং ব্যাধের দেবী চন্ডীর লীলা প্রচারের জন্য অনেক ছোট খাটো কাহিনী সমাজে প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয় স্তরে পুরুষ সমাজেও মেয়েলী ব্রতকথা পঠিত হতো অথবা গৃহীত হতো। দ্বিতীয় স্তরেই কাহিনীর উৎপত্তি।

মঙ্গলকাব্যের পটভূমি ও বিষয়বস্তু :—

নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেছেন, অতি প্রাচীনকালে যখন আর্য প্রভাব এদেশে শুরু হয়নি তখন এই অঞ্চলে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর কৃষিজীবী এক আদিম জাতি বাস

করতো । তাদের আচার আচরণ ব্রত এবং সেই সঙ্গে জন্ম মৃত্যুর পরে বিভিন্ন কৃত্য আর্য প্রভাবের ফলে অনেকটা নষ্ট হয়ে যায় । পরে যখন আর্য-অনার্য, দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতির সংমিশ্রনে একটি মিশ্র নৃ-তাত্ত্বিক জাতির উদ্ভব হলো তখন থেকেই গৌড় বঙ্গের অধিবাসীরা প্রাণপণে আর্য হতে চেষ্টা করতে লাগলো । সমাজে যে সমস্ত পুরুষ বাইরে কাজ কর্ম করতো তারা চাষবাস, যুদ্ধবিগ্রহ ও ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকতো । কিন্তু অনগ্রসর পুরুষ সম্প্রদায় এবং অন্তঃ-পুরবাসিনী স্ত্রীসমাজ এত সহজে আপনাপন কুলাচার ও গার্হস্থ ধর্মের বৈশিষ্ট ত্যাগ করতে পারেনি । সমাজের আর্যভাবাপন্ন উচ্চবর্ণ থেকে এই অনগ্রসর পুরুষ ও অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রী সমাজ তাদের বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে রইলো । ক্রমে তাদের দেবীরা কিছুটা সংস্কৃত প্রভাবে মার্জিত হয়ে আর্যদের দেবমন্ডপে স্থান করে নিলেন ।

যে সমাজ জগতকে ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করে, যারা জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য আত্মশক্তি ও বুদ্ধিতে অবিশ্বাসী, তাদের আধিভৌতিক উৎপাতের হাত থেকে রক্ষার জন্য এক একটি উৎপাতের দেবতার সৃষ্টি করতে হয় । আর্দ্র ভূমির দেশ বাঙালা — এখানে ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর এবং সর্বত্র সাপ । সুতরাং মনসার বন্দনা করলে সর্পাঘাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, চন্ডীর উপাসনা করলে সমস্ত আপদ কেটে যাবে, দক্ষিণরায়ের পূজা করলে আর বাঘ কুমীরের আক্রমনে প্রাণ দিতে হবে না, এমনি করে অসহায় কৃষিজীবী সমাজ, উৎপীড়িত নিম্নবর্ণের জনসাধারণ ভয়ে ভক্তিতে মনসার ভাসান গেয়েছে, চন্ডীর মঙ্গল গান বেঁধেছে, রঞ্জাবতী লাউসেন ও কলিঙ্গার অদ্ভুত কাহিনী শুনেছে ।

সুতরাং মঙ্গলকাব্যের পটভূমিকায় রয়েছে এক বিশাল গ্রামকেন্দ্রিক জলজঙ্গল বেষ্টিত নদী মাতৃক বাঙলা দেশ , যেখানে অষ্ট্রিক নরগোষ্ঠীর লোকই প্রধান — যারা শিক্ষায় ও সভ্যতায় পুরোপুরি আর্যত্ব লাভ করতে পারেনি ।

আমাদের আলোচ্য সময়সীমার মধ্যে বাঙলার শাসক ছিলেন মোগল ও পাঠান । এই সুদীর্ঘ কালের একদিকে আছে বৈষ্ণবপদাবলী এবং জীবনচরিত সাহিত্য , রামায়ণ , মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ , নানা লৌকিক দেবতার মহিমাকীর্ত্তনকারী মঙ্গলকাব্য সমূহ — অন্যদিকে আছে অন্যান্য বিচিত্র প্রণয় কাব্য ও আখ্যানকাব্য সমূহ । আখ্যানকাব্যগুলিতে মধ্যযুগের বাঙলাদেশের সমাজচিত্র বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে ।

মধ্যযুগের কাব্যে সেই যুগের যে সমাজব্যবস্থা প্রতিবিম্বিত হয়েছে তার মোটামুটি একটা চিত্র আমরা তুলে ধরতে পারি । সমস্ত সমাজেই নারীর ভূমিকা সমাজদেহে পুরুষের চেয়ে কোন অংশেই হীন নয় । পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় একথা সাধারণভাবেই বলা চলে যে সে যুগের মানুষ দৈবনির্ভর ছিল । সাহিত্যেও সেই দৈবনির্ভরতার প্রতিফলন ঘটেছে । নারীর স্থান ছিল গৃহের অভ্যন্তরে — এটাই স্বাভাবিক ।

'' ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি'' -অর্থাৎ স্ত্রীজাতি স্বাধীনতার যোগ্য নয় — এতো মনুরই বচন । একটা কথা মনে রাখতে হবে , আমাদের দেশে যারা সমাজ গঠনের জন্য , সুস্থ গৃহজীবন পরিকল্পনার জন্য নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন

সেই স্মৃতিকারদের মধ্যে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশরই প্রধান। কিন্তু এই নির্দেশগুলি যতই মঙ্গলজনক হোক না কেন আমাদের ভবিষ্যতের পক্ষে কল্যাণ-কর হয়েছে কি না বলা কঠিন। এঁরা সমাজ নির্মাণের জন্য উপদেশ দিয়েছেন, আমরা অন্যভাবে সেই নিয়মগুলি অনুসরণ করেছি। নারী জাতি অন্যায় করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত মন্ত্র জপ করেছে। ফলে সমাজের নরনারী একটি 'প্যাটার্ণে' গঠিত হয়েছে। মনু বলেছিলেন — ' ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি ' — কেননা স্ত্রী জাতির মন স্বভাবতই চঞ্চল। তাকে সতর্ক প্রহরার মধ্যেই রাখা প্রয়োজন। কিন্তু সংহিতার নবম অধ্যায়ে মনুর বিধানগুলি যে ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে তা আমাদের প্রশংসার দাবী করতে পারে না। সমাজের সকলেই স্মৃতির বিধানে তটস্থ এবং বিস্ময়ের বিষয় এই বিধানগুলির ভয়ে আমাদের দেশের শিল্পী সাহিত্যিকেরাও যেন স্বচ্ছন্দভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না। অর্থাৎ এই বিধান তাঁদের স্বাধীন চিন্তা পর্যন্ত হরণ করেছে। তাঁরা যে রাজ্যে বিচরণ করতেন তাকে এক কথায় বলা যেতে পারে 'কলের পুতুলের ' রাজ্য। একজন বিদগ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত এই সমাজ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, **'Mummification of social life'** — আমরা বলি এ যেন যক্ষপুরী বা অচলায়তন। সবাই যেন কতকগুলি বিধান মেনে চলাকেই জীবনের সার সর্বস্ব বলে মনে করেছেন। সমাজের মেয়েদের অবস্থা দুর্ভাগ্যজনক ছিল তাতে সন্দেহ নেই, এবং ছিল বলেই বিভিন্ন স্মৃতি শাস্ত্রে তার অনুলেখন রয়েছে, এবং এই স্মৃতি-শাস্ত্রে এই সম্পর্কিত বিধান ছিল বলেই শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা পর্যন্ত এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কালিদাসের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র

-কিন্তু তিনিও রঘুবংশকাব্যে রাজা দিলীপের বর্ণনায় বলেছেন -''রেখা-মাত্রম্ন ব্যতীয়ুরামনো বর্ত্মন: পরম্ ।'' অর্থাৎ দিলীপের রাজত্বে এমন সুশাসন ছিল, তখন রাজা ও প্রজাগণ মনুবিহিত জীবনচর্যার আদর্শ থেকে রেখামাত্র বিচ্যুত হয়নি । কিন্তু এটা গৌরবের কথা নয়, প্রশংসার বিষয় নয় । নিয়মের শৃংখলে বাঁধা পড়ে প্রজাদের কোন চ্যুতি ঘটাবার শক্তিই তো ছিল না । এই সেই দিন পর্যন্তও আমরা প্রথার দাসত্ব করে সতীকে চিতার আগুনে দগ্ধ করে উল্লাসে নৃত্য করেছি । খোলামন নিয়ে বিচার করলে মনুর বিধানগুলিকে সংশোধন করবার প্রশ্ন উঠবে ।

মনসামঙ্গলকাব্যে বিবৃত হয়েছে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবীমনসার কথা ও কাহিনী । অতি প্রাচীন যুগেও আদিম মানব সমাজে সর্পোপাসনার সন্ধান পাওয়া যায় । প্রাচীন যুগে আদিম সমাজের মানুষ সাপ, বাঘ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীকে ভয় করতো এবং আত্মরক্ষার জন্য তার পূজা অর্চনা করতো । ভারতের অস্ট্রিক গোষ্ঠী অপেক্ষা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মধ্যে সর্প পূজার অধিক প্রচলন ছিল । আসামের কোন কোন অধিবাসীর মধ্যে এখনও এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । এই সমস্ত আর্যেতর সংস্কার আর্যজাতিকে প্রভাবিত করেছিল । তারা অনার্যদের উপর শুধু উৎপাত করেনি তাদের অনেক সংস্কার ও আচার ব্যবহার গ্রহণও করেছে । বেদেও সর্পপূজার কথা আছে ।

সে যুগে নারী জাতি যে সমাজে মর্যাদাহীন ছিলেন তার একটি সুন্দর চিত্র আমরা বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে পাই : -

ব্রাহ্মণের নারী হইয়া নাহি ধর্মজ্ঞান ।
ভাঙগড়ার ঝি তুই কিসে অপমান ।। (পৃ - ৮৫)

যেহেতু তিনি স্বামী, সেহেতু তার নারীর উপর এমনি অধিকার যে তার একটি কথা অমান্য করলে নারীকে নিকৃষ্ট গালিগালাজ শুনতে হবে । নারীর হৃদয়ের যেন কোন দাম নেই । আধুনিক মানসিকতা দিয়ে পুরুষের এই আচরণকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না ।

কিন্তু সামাজিক অনুশাসন এতই কঠোর ছিল যে স্বামী পরিত্যক্তা নারীর উপর সামাজিক নির্যাতন স্বামীর নির্যাতন অপেক্ষাও অত্যন্ত অসহ - নীয় ছিল । তাই সামাজিক নির্যাতন অপেক্ষা স্বামীর নির্যাতনকেই নারীরা মুখ বুজে, মাথা নীচু করে সহ্য করা অধিকতর শ্রেয় বলে মনে করতেন । জরৎকারুর দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে মনসা তাঁকে অচৈতন্য করে দিয়েছিলেন । কিন্তু পিতা শিবের অনুরোধে চৈতন্য ফিরিয়ে দিলেন। যখন জরৎকারু মনসাকে ত্যাগ করে চলে যাবার উপক্রম করলেন তখন মনসা : -

মুনির চরণে ধরি করিল প্রণতি ।
অপরাধ ক্ষমা কর রাখ রাঙা পায় ।।
স্ত্রীলোকের অপরাধ ক্ষমিতে উচিত হবে ।

(বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ - পৃ:৯১)

একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয় - মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যে

এমন একটা মানবীয় আবেদন প্রাধান্য পেয়েছে যে বাঙলাদেশে রামায়ণ কাহিনীর মত এর ঘটনা ও চরিত্র প্রায় কারও অজানা নয়। এই কাহিনীতে ব্রতকথা, ব্যালাড, ও মহাকাব্যের মিশ্রণ ঘটেছে। ব্রতকথার সরল ঋজু কাহিনী, ব্যালাডের শিথিল ঘটনা বিন্যাস ও মহাকাব্যের বিশালতা এই কাব্যের কাহিনীকে একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। এই ব্যালাড বা বিশাল কাহিনীর অন্তরালে যে কোনও একটা বাস্তব ঘটনার প্রভাব থাকতে পারে। কিন্তু চাঁদ সদাগরের কাহিনীর স্থান, নদ-নদী, গ্রাম-জনপদের নাম গোটা বাঙলাদেশে এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে তার ঐতিহাসিক অংশ খুঁজে বার করাই কঠিন।

মনসামঙ্গল কাব্যের চারটি শ্রেণী :—

ক) পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্য - এই কাব্যের প্রধান কবি নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্ত, বংশীদাস ও ষষ্ঠীবর।

খ) রাঢ়ের পদ্মাপুরাণ - এই কাব্যের প্রধান কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ।

গ) উত্তরবঙ্গ ও আসাম - এই কাব্যের প্রধান কবি জগজ্জীবন ঘোষাল ও তন্ত্রবিভূতি।

এই সব অঞ্চলের মনসামঙ্গলের কাহিনীতে নানান বৈচিত্র্য ও কাহিনী আছে। মনসামঙ্গলে চাঁদের বিদ্রোহ ও বেহুলার সতীত্ব কাহিনী বাঙলা -

দেশে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কাহিনীর প্রথম অংশ দেবখন্ড। এই খন্ডে মনসার জন্ম থেকে মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য অবতরণ পর্যন্ত বর্ণিত আছে।

।। মনসামঙ্গলের কাহিনী ।।

মনসার পূজা মর্ত্যে প্রচারের জন্য প্রথমে এক দেবী কল্পিত হয়েছেন। তাঁর অনুগ্রহ পেলে আর সর্পদংশনের ভয় থাকে না।

মনসা দেখলেন নিম্নবর্ণেরা ভয়ে বা ভক্তিতে তাঁর পূজা করে বটে কিন্তু সমাজের প্রধান বণিকদের পূজা না পেলে উচ্চ সমাজে তাঁর পূজার প্রসার হবে না। বণিক সমাজের প্রধান ছিলেন চাঁদসদাগর। তিনি পরম শৈব, কিছুতেই মনসার পূজা করবেন না। মনসা নানাভাবে তাঁকে বিপর্যস্ত করলেন, কিন্তু চাঁদ তাঁর সঙ্কল্পে অটল রইলেন। মনসার ক্রোধে চাঁদের মধুকর সহ সপ্তডিঙা জলে ডুবে গেল, ছয় পুত্রের মৃত্যু হলো, তবুও চাঁদ ভ্রুক্ষেপ করলেন না।

মনসার ইচ্ছায় স্বর্গের ঊষা ও অনিরুদ্ধ মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করলেন। অনিরুদ্ধ চাঁদবণিকের ঘরে এবং ঊষা সায়বেণের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেন। মর্ত্যলোকে তাঁদের নাম হলো লখিন্দর ও বেহুলা। কালক্রমে লখিন্দরের সঙ্গে বেহুলার বিবাহ হয়ে গেল। পাছে মনসা তাদের কোন অনিষ্ট করেন তাই চাঁদ সাঁতালি পর্বতে লোহার বাসর ঘর

101695
26 JUL 1989
NORTH BENGAL
UNIVERSITY LIBRARY
RAJA RAMMOHUNPUR

নির্মাণ করলেন। কিন্তু মনসার চক্রান্তে সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে তাঁর অনুচর কাল-নাগিনী বাসর ঘরে প্রবেশ করে লখিন্দরকে দংশন করলো। লখিন্দরের মৃত্যু হলো, চাঁদ মৃত পুত্রকে কলার ভেলায় তুলে জলে ভাসিয়ে দিলেন - বেহুলাও স্বামীকে নিয়ে ভেসে চললো নিরুদ্দেশের পথে। বহু আপদ বিপদ পার হয়ে বেহুলা স্বর্গে গিয়ে তার নৃত্যে ও গীতে মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করলো। মহেশ্বর লখিন্দরের জীবন ফিরিয়ে দিলেন। মহেশ্বরের বরে তার ছয় ভাসুরও জীবন ফিরে পেলো। বেহুলা সকলকে নিয়ে দেশে ফিরলো। পুত্রবধূর অনুরোধে এইবার চাঁদ মনসার পূজা করলেন। তবু ডান হাতে নয় - বাম হাতে।

মর্ত্যে দেবীর পূজা প্রচারিত হলো। পরে যথাকালে অনিরুদ্ধ ঊষা নরদেহ ত্যাগ করে স্বর্গে ফিরে গেলেন।

।।দুই ।।

ইংরাজীতে একটা প্রবাদ বাক্য শুনেছি, —
"It is the distance that lends enchantment to the view." —
অর্থাৎ দূরত্বই কল্পনায় সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। যাদের আমরা দেখিনি, যাদের সম্পর্কে কোন ধারনাই আমাদের নেই, আমরা আমাদের কল্পনার

রঙ মিশিয়ে তাদের নতুন করে সৃষ্টি করি । উজ্জয়িনীর নাগরিকগণ কিভাবে জীবন যাপন করতেন আমরা জানি না । উজ্জয়িনীর নিসর্গ সৌন্দর্য আমা - দের কাছে অপরিচিত , তবুও আমরা কল্পনার দৃষ্টিতে যে উজ্জয়িনীকে দেখি, পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্যই সেখানে পরাভূত । কিন্তু এতো গেল দূর-ত্বের কথা , কাছের জিনিষকে সুন্দর দেখবার উপায় কোথায় ? সৃষ্টির আদিম কাল থেকে নর ও নারী পাশাপাশি অবস্থান করেছে , ব্যবহারিক জীবনে প্রতি মুহূর্তেই তাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় — সেখানে তো কল্পনার কোন অবকাশ নেই । নারীকে প্রত্যেক নরই প্রত্যক্ষভাবে চেনে । খ্রীষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে বাঙলাদেশে যে সমাজ জীবন ছিল নানা দিকে নানা বিষয়ে আমরা সে যুগ অতিক্রম করে এসেছি । জনৈক ঐতিহাসিক বলেছেন —

''বাৎস্যায়ন তাঁর কামসূত্রে গৌড়ের নারীদের মৃদুভাষিণী, অনুরাগ - বতী এবং কোমলাঙ্গী বলে তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে যে উক্তি করেছেন তা আজও মোটামুটি সত্য বললে ইতিহাসের অপলাপ করা হয় না । কিন্তু বাৎস্যায়নের উক্তির ভিতর প্রাচীন বাঙালী নারীর সমগ্র ছবিটি যে পাওয়া যাচ্ছে না তা না বললে ঐতিহাসিকের কর্তব্য করা হবে না ।

গোড়াতেই বলা চলে , বৃহত্তর হিন্দু সমাজের গভীরে — শিক্ষিত নাগর সমাজের কথা বলছি না — আজও যে সব আদর্শ , আচার ও অনুষ্ঠান সক্রিয় , প্রাচীন বাঙালী সমাজেও তাই ছিল । যে সব সামাজিক রীতি ও অনুষ্ঠান পল্লী ও নগরবাসী সাধারণ নারীরা দৈনন্দিন জীবনে আজও পালন করে থাকেন , যে সব সামাজিক বাসনা ও আদর্শ আজও পোষণ

করেন, প্রাচীন বাঙালী নারীদের মধ্যেও মোটামুটি তাই সক্রিয় ছিল। বাংলার লিপিমালা ও সমসাময়িক সাহিত্যই তার প্রমাণ।'' (বাঙালীর ইতিহাস - ড: নীহার রঞ্জন রায় - পৃ - ২৯১)।

ঐতিহাসিকের কতকগুলি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে তা ঠিক। কিন্তু এই ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত এই যে প্রাচীন সমাজের সামাজিক জীবনের যে আদর্শ ছিল এখনও মোটামুটি তাইই আছে। আছে বলেই সে যুগের স্মৃতিকারগণ যে নারী সমাজের চিত্র এঁকেছেন সাহিত্যেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। এক কথায় সাহিত্য স্মৃতির আদর্শে প্রভাবিত।

ঠিক সেই কথারই প্রতিধ্বনি পাই অন্য এক বিদগ্ধ ঐতিহাসিকের রচনায় -- " .... Certain remarks of Vātsyāna indicate that women of the royal harem of Vanga were not accustomed to move out freely, and spoke with outsiders from behind a curtain. Women were educated and probably many of them were literate. In ancient Bengal, as in the rest of India, a woman had hardly any independent legal or social status except as a member of the family of her father and husband." -- (Dr. R.C.Majumder--- History of Bengal, Volume- I, page No. -609).

এর অর্থ এই যে সে যুগে পর্দা প্রথা প্রচলিত ছিল, পর্দার আড়ালে থেকেই নারীগণ আলাপ আলোচনা করতেন পরপুরুষের সঙ্গে - এক কথায় নারীদের কোন পৃথক সত্তার স্বীকৃতি সেই সমাজে ছিল না। এই সর্বথা বন্দী নারী সমাজের চিত্রই আমরা স্মৃতিশাস্ত্রে পেয়েছি।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই স্মৃতিশাস্ত্রের প্রভাব একদিন সমাজ গঠনে ছিল অপরিসীম। শিল্পী ও সাহিত্যিকেরাও তাঁদের রচনায় নারীর যে চিত্র এঁকেছেন তা স্মৃতিশাস্ত্রেরই অনুগামী। সব মিলিয়ে সে যুগের নারীর অবস্থা ছিল শোচনীয়।

লক্ষণসেনের সভাকবি ধোয়ী রচিত 'পবনদূত' কাব্যে যে নারী জাতির বর্ণনা রয়েছে তাতে দেখা যায় পর্দা প্রথা তাতে অব্যাহত, তবে কিছু শিথিল, এই পর্যন্ত। বাৎসায়নের কয়েকটি উক্তি থেকে বোঝা যায় সেই যুগের রাজঅন্ত:পুরের মেয়েরাও স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারতেন না এবং তাদের অধিকাংশই অশিক্ষিতা ছিলেন। স্মৃতিকার জীমূতবাহন স্বামীর মৃত্যুর পরে বিধবার সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে যথেষ্ট লড়াই করেছিলেন। তাঁর সময়ে অন্য কোন উত্তরাধিকারীর অভাবে নারীরা ন্যায্য উত্তরাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতেন। তিনি বিস্তৃত তর্ক ও যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে স্বামীর অভাবে মেয়েদের দাবী সর্বাগ্রে গ্রাহ্য হবে। কেবলমাত্র ভরণপোষণের দাবী মিটলে চলবে না। অবশ্য বিধবা নারী সম্পদ বিক্রী করতে পারতেন না। এবং তার জীবনও সৎজীবনের নীতির

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোক এইটিই বাঞ্ছনীয় ছিল। তাকে স্বামীর পরিবারেই বাস করতে হবে, পিতা, মাতা তার সঙ্গে থাকতে পারেন, তবে তাকে সর্ব-প্রকার বিলাসিতা ত্যাগ করে থাকতে হবে।

আসল কথাটা এই সমাজে যে নারীর চিত্র আছে, শিল্পী বা সাহিত্যিক যখন সে নারীর চিত্র অঙ্কিত করবেন তিনি যথাস্থিত ভাবে অনুকরণ করে যাবেন এর কোন যুক্তি নেই। কবি কালিদাস শিল্পীর দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গেছেন। তাঁর কাব্যে যক্ষ তাঁর প্রিয়ার কাছ থেকে নির্বাসিত, সেই প্রিয়া একজন কিন্নরী মাত্র, আমাদের সমাজের কেউ নয়। তাঁর নাটকের পুরুরবা উর্বশীর প্রণয়লিপ্সু, কিন্তু উর্বশীও আমাদের সমাজের কেউ নয়, সে স্বর্গের নর্তকী। আর তাঁর কাব্যে আছে উমা ও মহেশ্বরের প্রণয় লীলা। কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী নাট্য-কার ভাস এই বিষয়ে যথেষ্ট স্বাধীনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পঞ্চরাত্র নামক নাটকে দুর্যোধন শেষ পর্যন্ত পান্ডবদের ন্যায্য দাবী মিটিয়ে দিয়েছেন এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও হয়নি। কবি বা সাহিত্যিক-তাঁরাও তো শিল্পী, সুতরাং তাঁরা সকল ক্ষেত্রে স্মৃতিশাস্ত্রের নির্দেশ মেনে চলবেন এর কোন যৌক্তিকতা নেই এবং কেউ কেউ মেনেও চলেন-নি। শিল্পীর রচনায় যদি আমরা নতুন সৃষ্টি না পেলাম তাহলে আর পাব কোথায়? সে যুগ আমরা নিশ্চয়ই অতিক্রম করে এসেছি - যে যুগে বিধবাদের মৎস্য, মাংস প্রভৃতি যে কোনরূপ উত্তেজক পদার্থ ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল, কোন মঙ্গলজনক অনুষ্ঠানে বিধবাদের উপস্থিতি অমঙ্গল-সূচক বলে পরিগণিত হতো এবং তারা সাধারণত উৎসব ও অন্যান্য

মঙ্গল অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারতেন না ।

নারীদের যৌনশুচিতা ও সতীত্বের আদর্শ স্মৃতিকারেরা যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে প্রচার করেছিলেন এবং সমাজের মোটামুটি আদর্শও তাই ছিল । তা সত্ত্বেও বিত্তবান নাগর সমাজে তার ব্যতিক্রমও কম ছিল না । সেই আদর্শ সমাজেও বলপূর্বক ধর্ষিতা নারী সেই যুগেও সমাজে পতিত বা সমাজ - চ্যুত বলে গণ্য হতেন না এবং বিধিবদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানেই তা শুদ্ধ হয়ে যেতো ।

এ বিষয়ে মনুর সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাক । মনুসংহিতার নবম সর্গে আছে —

''পানং দুর্জনসংসর্গ: পত্যা চ বিরহোহটনম্ ।
স্বপ্নোহন্যগেহবাসশ্চ নারীসন্দূষণানি ষট্ ।।'' (১৩)

সুরাপান, অসৎপুরুষের সঙ্গে সংসর্গ, পতি বিরহ, ইতস্তত: ভ্রমণ , অকারণ নিদ্রা এবং পরগৃহে বাস — এই ছয়টি স্ত্রীলোকের ব্যভিচার দোষের কারণ ।

''নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতি: ।
সুরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে ।।'' (১৪)

এরা রূপ বিচার করে না , বয়স সম্পর্কেও এদের কোন বিচার নেই , সুরূপ বা কুরূপ — পুরুষ হলেই হল - পুরুষ পেলেই এরা ভোগের জন্য অধীর হয়ে ওঠে ।

এই শ্লোকটির ইঙ্গিত এত কদর্য্য যে প্রতিবাদেরও অযোগ্য ।

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্ম্মে ব্যবস্থিতিঃ ।
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রীয়োহনৃতমিতি স্থিতিঃ ।। (১৮)

শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী স্ত্রীজাতির কোন সংস্কার মন্ত্রের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না । এই জন্যই এদের চিত্ত শুদ্ধ হয় না , এরা স্মৃতি ও শ্রুতি রহিত তাই এরা ধর্মজ্ঞ হতে পারে না । এরা মন্ত্রহীন , তাই পাপের স্পর্শ ঘটলে তারা মন্ত্রের সাহায্যে তার ক্ষালন করতে পারে না । এই জন্য তারা মিথ্যার মতই অশুভ ।

আমাদের মন্তব্য এই স্ত্রীজাতির সম্পর্কে মনুর মনোভাব আমরা জানি, সুতরাং এই জাতীয় নারীর স্তুতি আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে না । কিন্তু মনুর ভাষ্যকার কুল্লকও এই বিষয়ে নীরব হয়ে রইলেন এটাই বেদনাদায়ক । মনু নারী জাতি সম্পর্কে আর যে সব মন্তব্য করেছেন তা হলো — এরা সন্তান উৎপাদনের জন্য গৃহের উপকারিণী । সুতরাং তাদের সযত্নে রাখবে । মেয়েরা স্বাধীনতার যোগ্য নয় । শুধু সন্তানের উৎপাদন, প্রতিপালন, অতিথি স্বজনের সৎকার প্রভৃতি দৈনন্দিন কর্ম নারী-দের প্রধান অবলম্বন ।

মনুসংহিতার বারটি অধ্যায়ে মনু নারীজাতি সম্পর্কে বহু বিরোধী উক্তি করেছেন । সুতরাং নির্বিচারে তা অনুসরণ করা কঠিন । তবে সমাজে নারীগণ যে হীন জীবন যাপন করতেন এরকম একটা আভাষ এই

স্মৃতিদর্শনে পাওয়া যায় ।

ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারও অন্যত্র বলেছেন — ''সে যুগে মেয়েদের কোন আইনসঙগত অধিকার ছিল না , বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত হওয়ার জন্য নারীজাতি নানাবিধ দুর্দশার অধীন হতেন । সমাজে কৌলীন্য প্রথা ছিল একটি রোগ বিশেষ —— " The prevalence of polygamy must have made their lives at home somewhat irksome . Inspite of strong insistence of physical chastity of women , contempo--rary evidence , indicates that there was a certain amount of laxity in this respect . Mention may , however , be made in this connection of one redeeming feature in society which offers a striking contrast to modern ideas . " - (Dr. R. C. Majumder - The History of Bengal - Volume - I . Hindu Period , page No. 609 - 611) .

— সেন রাজত্বের পরে দীর্ঘকাল পর্যন্ত কৌলীন্য প্রথা বাঙলাদেশে দৃঢ়মূল ছিল । এই প্রথার মহিমায় বহু নারী যে হীন জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন তার নিদর্শন মধ্যযুগের বাঙলাদেশে ছড়িয়ে আছে । সাহিত্যের বিবরণ এখানে দেওয়ার অবকাশ নেই - এখানে শুধু আমরা সে যুগের সমাজ ব্যবস্থায় নারী জাতির অবস্থান ও অবস্থা সম্পর্কে জানতে উৎসুক ।

ধরা যাক, পুনর্ভূনারীদের কথা। এই জাতীয় নারী প্রসঙ্গ এসেছে বিধবাদের পুনরায় বিবাহ সম্পর্কিত আলোচনায় —

"In so far as the punarbhu is concerned, Vatsyayana gives us a somewhat different view of her status. The punarbhu is a widow who, being smitten with love through inability to control her passion, unites herself again with a man seeking pleasure and having excellent qualities. In choosing her mate she follows, above all, the inclinations of her heart. She persuades her lover to spend money on drinking parties, garden parties etc. At her lover's house she assumes the role of a mistress, being affectionate to his wedded wives, generous to his servants and friendly with his companions." - (Dr. R.C.Majumder - The History and culture of the Indian people - page No. 571 - 572).

এর তাৎপর্য — বাৎসায়ন পুনর্ভূনারীদের সম্পর্কে বিবরণ দিতে গিয়ে বলছেন যে, এই নারীর জীবন যাত্রার আদর্শ অত্যন্ত কঠিন। পুনর্ভূ অবশ্য সেই নারী যিনি বৈধব্য পালনে অসমর্থ হয়ে এবং প্রেমধর্মের আকর্ষণে অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে যুক্ত হন। এই পুনর্ভূ নারী তার মনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি কল্পেই বিবাহিত হয়েছেন এবং তিনি তার প্রেমিককে সুরাপানে এবং উদ্যান সম্মিলনী প্রভৃতিতে যথেচ্ছ ব্যয় করতে উৎসাহিত করেন। গৃহের অন্যান্য দাস - দাসী এবং আত্মীয় পরিজনের তিনি স্নেহপরায়ণ হন। তবে সৌভাগ্যের বিষয় সমগ্র মধ্যযুগের

সাহিত্যে এবং বলতে কি বাঙলা সাহিত্যের কোন পর্বেই এই পুনর্ভূ নারীর দর্শন সৌভাগ্য আমাদের হয় নি। কিন্তু এতে প্রমাণিত হয় যে বিধবারাও প্রয়োজন বোধে বিবাহিত হতেন যদিও এরূপ বিবাহের সংখ্যা নগণ্য।

এই পর্যন্ত যে উদধৃতিগুলো দিয়েছি তাতে এইটুকু প্রমাণিত হয় সে যুগের সমাজব্যবস্থায় নারীদের অবস্থা কোন দিক থেকেই আকর্ষণীয় ছিল না। এই উক্তি বিবাহিত নারীদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। —

" References in the general as well as technical literature of the early centuries before and after christ seem to indicate that married women in high families did not usually appear in public without veils . This custom was probably continued in the Gupta Age . The silence of Hiuen Tsang and Itsing , however , indicates that the women did not generally observe the purdah and remain in seclusion . For such a peculiar custom to which they were absolute strangers , would surely have been noticed by them . Besides , as noted above ; sculptured representations of female figures definitely negative the idea of a purdah. "
(Dr. R.C.Majumder, The History & Culture of the Indian people — page no. 574)

অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর আগে এবং পরে সামাজিক প্রথা এই ছিল যে শিক্ষিত নারীগণও সাধারণত পর্দা প্রথাকে মেনেই চলতেন - সাধারণত তাঁদের অন্ত:পুরের বাইরে দেখা যেতো না , বাইরে যেতে হলে তাঁরা অবগুন্ঠন ব্যবহার করতেন । গুপ্তযুগেও এই প্রথার প্রচলন ছিল । পরিব্রাজক হুয়েনশাং এবং ইৎশিং এর নীরবতা দেখে মনে হয় যে নারীরা সাধারণত পর্দা প্রথা অনুসরণ করতেন না । তাঁরা জনসাধারণ থেকে একটু দূরেই থাকতেন । এই অদভূত প্রথা খুব সম্ভবত গুপ্তযুগেও প্রচলিত ছিল । তবে এই প্রচলন কেবলমাত্র বিবাহিত নারীদের ক্ষেত্রেই সীমাবদধ ছিল , কিন্তু গুপ্ত সভ্যতার সংস্কৃতির সূচক যে সমস্ত প্রতিমূর্তি আমরা পেয়েছি তা এই সিদধান্তকে সমর্থন করে না ।

নারী সমাজ সম্পর্কে একটি কথা আমাদের গোড়াতেই মেনে নিতে হবে যে প্রাচীন ইতিহাসে আমরা নারী সমাজের যে চিত্র পেয়েছি তা শুধু সেন ও পাল বংশের আমলে প্রচলিত ছিল না -- মধ্যযুগেও মোটা-মুটি একই সমাজ ব্যবস্থা ছিল । কৌলীন্য প্রথার কথাই ধরা যেতে পারে। মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গলের বণিকখন্ডের শুরুতেই আমরা ধনপতি সদাগরের নিজ শ্যালিকাকে বিবাহ করার আগ্রহে আগ্রহান্বিত দেখতে পাই । উপলক্ষ্য অবশ্য পায়রা । আর শ্যালিকা জামাইবাবুর সঙ্গে পায়রা নিয়ে লুকো-চুরি খেলবে এতে কোন অস্বাভাবিকতা দেখি না । কিন্তু সেই সূত্রে লহনার মত সতীসাধ্বী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও খুল্লনাকে বিয়ে করে আনার প্রস্তাবে আধুনিক রুচির বিকৃতি লক্ষ্য করি । আরও আশ্চর্যের কথা এই যে নারী যেন পুরুষের কাছে নির্বোধ শিশু । শিশুকে যেমন পুতুল দেবার প্রলোভন

দিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দাবী থেকে ভোলানো যায় তেমনি ধনপতি সদাগর লহনাকে ভোলাতে চেষ্টা করেছেন ।

মধ্যযুগীয় সামন্তদের লোভ লালসার কথা মনে রাখলে ''সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী'' কাব্যের নায়ক সম্বন্ধে আর কোন মোহ থাকে না। কাব্যটিতে যে পরকীয়া প্রেম দেখতে পাই তা একান্তভাবেই দরবারী প্রেম। এ প্রেমমূলক কাহিনীর নায়ক লোরকরাজ গোহারী রাজ্যের মোহরা রাজার কন্যা চন্দ্রানীর সঙ্গে যে প্রেম করে তা সামাজিক স্বীকৃতি পেতে পারে না । এই ঘটনার মধ্যে সামন্ত রাজার শক্তির পরিচয় থাকলেও সুরুচির কোন ছাপ নেই । মোহরা নৃপতি মঙ্গল বিধান দ্বারা পরম আনন্দ সহকারে শূরবংশের ধনুর্ধর বীর অবতার বামনের সঙ্গে চন্দ্রনীর বিয়েও দিয়েছিলেন । এই তো হলো মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের মূল্যায়নের একটি দৃষ্টান্ত । আর তার পতির সঙ্গে আবার বিয়ে হলো চন্দ্রানীর । কিন্তু এসব কথাই অপ্রাসঙ্গিক । মনু তার নবম অধ্যায়ে নিয়োগ প্রথার প্রশ্নও আলোচনা করেছেন । অর্থাৎ সমাজ সুগঠিত হওয়ার আগে, নারী পুরুষের বিবাহ পদ্ধতি সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে যে নিয়োগ প্রথার প্রচলন ছিল ধৃতরাষ্ট্র, পান্ডু ও বিদুর তো সেই নিয়োগ প্রথারই ফল। মনু এই নিয়োগ প্রথাকে আপদ ধর্ম হিসেবেই দেখেছেন । এই নিয়োগ প্রথায় বিধবারও পুত্র ধারণ করা চলতো প্রয়োজনের বিধি মানতে গিয়ে । নিয়োগ প্রথা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় । কারণ এই প্রথায় নারীকে দেখা হয়েছে শুধু সন্তান

উৎপাদনের যন্ত্র হিসাবে। এই নিয়োগ প্রথা সম্পর্কে আলোচনার শেষে মনু নারী সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা কোনক্রমেই এই জাতির পক্ষে গৌরব জনক নয়। মনু বলেছেন —— '' নাস্তি স্ত্রীনাং ক্রিয়া মন্ত্রৈঃ'' —— অর্থাৎ নারীদের কোন সংস্কারই মন্ত্রের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। এরা মন্ত্রহীন তাই এরা অশুচি। কোন্ অপরাধে, সমাজের কোন্ ব্যবস্থা সুসম্পূর্ণ করতে গিয়ে যে নারীদের এই অধিকারে বঞ্চিত করা হলো তা দুর্বোধ্য। মনু যে ব্যবস্থা পত্র দিয়েছেন ——

নাস্তি স্ত্রীনাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্ম্মে ব্যবস্থিতিঃ।
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োহনৃতমিতি স্থিতিঃ।। (৯.১৮)

স্ত্রী জাতির কোন কর্মই শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী মন্ত্রের দবারা নিষ্পন্ন হয় না। ধর্মশাস্ত্রের এই বিধান, এরা স্মৃতি ও শ্রুতিহীন, তাই এরা ধর্ম্মজ্ঞ হতে পারে না। এরা মন্ত্রের স্পর্শহীন তাই পাপ করলেও মন্ত্রের সাহায্যে তাদের পাপের ক্ষালন হয় না। মনুর শেষ কথা নারী মিথ্যার মতই অশুভ - '' স্ত্রিয়োহনৃতমিতি ''।

প্রজানার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোহস্তি কশ্চন।। (৯.২৬)

এই শ্লোকে মনুর প্রশংসাপত্র — নারীগণ সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বিশেষ। অবশ্য এই সঙেগ তিনি উল্লেখ করেছেন তারা গৃহের দীপ্তি স্বরূপ অর্থাৎ পূজার যোগ্য। একটু আগেই মনু বলেছেন নারীরা স্বভাবতই

ব্যভিচারিণী তখন তাঁর মনে পড়েনি বিধির বিধানের দ্বারা জনন যন্ত্রের অধিকারিণী, মনে পড়াতেই এত স্তুতি এত উচ্ছ্বাস। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয় এ কোন সমাজ -- যে সমাজে নারীদের কোন সম্মান ছিল না -- কেবল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবেই হেয় জীবন যাপন করতে হতো? আমাদের বক্তব্য অবশ্য এই হিন্দুর কোন কালে কোন সমাজেই নারীদের এই হেয় অবস্থা ছিল। সুতরাং সমাজে নারীরা হেয় জীবন যাপন করতো বলেই সাহিত্যে তারা দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছেন এমন কথা অশ্রদ্ধেয়। বরং একটু ঘুরিয়ে বলা উচিত মনু, যাজ্ঞবল্ক্য পরাশর প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রকারেরাই এই জাতীয় বিধানের দ্বারা নারীদের সমাজ জীবনকে বিষময় করেছিলেন।

নশ্যতীষুর্যথা বিদধঃ খে বিদধমনুবিধ্যতঃ।
তথা নশ্যতি বৈ ক্ষিপ্রং বীজং পরপরিগ্রহে ।। (৪৩)[৯]

মনের আনন্দে মনু বিধানের পর বিধান রচনা করে সেই শরে নারীকে বিদধ করেছেন। আমাদের মনে হয় এই উপমাটি এখানে নিষ্ফল। বিবাহিতা স্ত্রীকে যেমন স্বামী নিজের বলে দাবী করবে, বনের মৃগকে তেমনি কোন শিকারী দাবী করতে পারে না। প্রথম শিকারীর শরে বিদধ হয়েও মৃগ যদি পলায়ন করে আত্মরক্ষা করতে পারে এবং পরে দ্বিতীয় শিকারী তাকে অনায়াসে শরবিদধ করতে পারে। তাই নিহত মৃগ নিশ্চয়ই দ্বিতীয় শিকারীর। বনের পশু শিকারী সাধারণের, কোন পশুসংহিতায় এমন কিছু লেখা নেই একজন শরবিদধ করলে সে যদি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়

তাহলে অন্যে তাকে শরবিদ্ধ করতে পারবে না ।

যা রোগিনী স্যাত্তু হিতা সম্পন্না চৈব শীলত: ।
সানুজ্ঞাপ্যাধিবেত্তব্যা নাবমান্যা চ কর্হিচিৎ ।। (৯.৮২)

এর বাঙলা অর্থ , স্ত্রী রুগ্না হয়েও যদি পতিব্রতা এবং শীলবতী হয় তবে তার অনুমতি নিয়ে স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারেন । কিন্তু প্রথমা স্ত্রীর অবমাননা করবেন না । আমাদের প্রশ্ন এই অনুমতি নেওয়ার কি সার্থকতা ? স্ত্রী পতিব্রতা ও শীলবতী — সে রুগ্না এই তার অপরাধ । এ অবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি চাওয়াই এক নিদারুণ অপমান । অনুমতি কে না দেয় ? মধ্যযুগের সাহিত্যে দেখতে পাই অনুমতি না নিয়েই একাধিক বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে । ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে ভবানন্দ মজুমদারের দ্বিতীয়বার বিবাহের কাহিনী স্মরণীয় । রাজা দশরথ চারবিবাহ করতে গিয়ে কারও অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন বলে জানা যায় না ।

প্রজানার্থং স্ত্রিয়ং সৃষ্টা: সন্তানার্থঞ্চ মানবা: ।
তস্মাৎ সাধারণো ধর্ম: শ্রুতৌ পত্ন্যা সহোদিত: ।। (৯.৯৬)

এই শ্লোকে তো নারী জাতির প্রতি চরম অসম্মান করেছেন মনু । স্ত্রীদের অস্তিত্ব কি শুধু সন্তান ধারনের জন্য ? তাহলে গর্ভাধানের জন্য কি পুরুষের সৃষ্টি ? মনুর সময় কেমন সমাজ ছিল জানিনা কিন্তু এই জাতীয় উক্তির বিরুদ্ধেই সর্বকালের নরনারীর একসাথে বিদ্রোহ করা উচিত।

॥ তিন ॥

স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসনের দবারা সাহিত্যিকেরা প্রভাবিত হবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এমন সাহিত্যিকও রয়েছেন যারা মধ্যযুগের সমাজ শাসনকে অতিক্রম করতে পেরেছেন। তারা স্মৃতিদুষ্ট দৃষ্টির দবারা নারী-দিগের প্রতি তাকাননি এবং তারা তাদের কল্পনার ও কবি প্রতিভার সদব্যব-হার করেছেন অন্যভাবে। তা নাহলে বেহুলার মত চরিত্র সৃষ্টি সম্ভব ছিল না। মধ্যযুগে যে নারী চরিত্রগুলি আমরা পেয়েছি তারা হেয় জীবন যাপন করেছেন হয় সমাজব্যবস্থার দোষে না হয় রাষ্ট্র শক্তির ব্যর্থতার ফলে। নইলে শিক্ষার অভাবে তাদের যে দুর্দশা ঘটেছে এমন কথা বলা যায় না। লোরচন্দ্রানীকাব্যের মালিনী চরিত্র একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর ও সার্থক কবি কল্পনা। প্রেমের ষড়যন্ত্রে এ নারীর ভূমিকাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই মালিনী কোন ন্যায়রত্নের টোলে শিক্ষা লাভ করেন নি। চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যের লহনা দুর্বলা দাসীর প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে তিল তিল করে খুল্লনার প্রতি নির্যাতন করেছেন, দুর্বলা দাসীকে ঔষধ করেও দিতে বলেছেন। এই দুর্বলা দাসী কোন শিক্ষায়তনে শিক্ষালাভ করে শক্তি সঞ্চয় করেন নি।

সমাজ ব্যবস্থাপনার কথাই বলি। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নীহার রঞ্জন রায় বলেছেন — ''নারীদের যৌনশুচিতা ও সতীত্বের আদর্শ স্মৃতিকারেরা যথেষ্ট জোরের সঙ্গেই প্রচার করিয়াছেন এবং সমাজের মোটামুটি আদর্শও তাহাই ছিল। তৎসত্ত্বেও বিত্তবান নাগর সমাজে তাহার ব্যতিক্রমও কম

ছিল না। আর পল্লীসমাজের যে স্তরে ব্রাহ্মণ্য আদর্শ পুরাপুরি স্বীকৃত ছিল না, আদিম কৌমগত সামাজিক আদর্শ ছিল বলবত্তর, সে স্তরে যৌন জীবনের আদর্শই অন্য যাগের, রীতিনীতিও ছিল অন্যতর। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সমাজাদর্শ দ্বারা তাহার বিচার চলিতে পারে না। ব্রাহ্মণ্য আদর্শ দ্বারা শাসিত সমাজেও অনিচ্ছায়, বলপূর্বক ধর্ষিতা নারী তখনকার দিনেও সমাজে পতিত বা সমাজচ্যুত বলিয়া গণ্য হইতেন না, বিধিবদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানেই তাঁহার শুদ্ধি হইয়া যাইত — এ সাক্ষ্য আমরা পাই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে।" (নীহার রঞ্জন রায় - বাঙালীর ইতিহাস - আদিপর্ব পৃ - ২৯৩)

রাষ্ট্রশক্তির ব্যর্থতার ফলে যে দুর্যোগ নেমে এসেছিল বাঙলার সমাজ জীবনে তার পরিচয় মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য বা মনসামঙ্গল কাব্য কোনটাতেই তেমন চোখে পড়ে না।

লোকসাহিত্যের অন্তর্গত মলুয়া পালাটিতে তৎকালীন মুসলমান শাসক কুলের ও তাদের কর্মচারীদের নারীদেহ লোলুপতা অপূর্বভাবে চিত্রিত হয়েছে।

ঘরের বৌ টাইন্যা লইব
দেখিলে সেয়ানা
দারুণ দেওয়ান কাজী
না মানিব মানা ।। (পৃ - ১০১)

"দারুণ দেওয়ান কাজীদের" ক্ষমতার কাছে পরাভূত হিন্দু কুলপতিরা দেওয়ান কাজীদের অসদাচরণের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিবাদ করার মত শক্তি বা সামর্থ রাখতেন না বলেই তাদের সমস্ত আক্রোশ সমাজের দুর্বল অংশের

উপর গিয়ে বর্তেছে ।

এ-ছাড়া লোকসাহিত্য সৃষ্টির বহু পূর্বে চন্ডীমঙ্গল কাব্যেও এই ধরণের অত্যাচারের বিবরণ পাই । কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম নিজের জীবনে সেই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন । ডিহিদার মামুদ সরিপের অত্যাচারে তাঁকে বাস্তুভিটা ত্যাগ করে নির্বাসন দন্ড গ্রহণ করতে হয়েছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই উৎপীড়নের দাহ স্পর্শ করেছিল তাঁদের গৃহ জীবনকে । তাঁরা স্বামী - স্ত্রী উভয়েই দুঃখ বরণ করেছিলেন । কিন্তু এমন কত অগণিত মুকুন্দরাম সেই আমলে পত্নীসহ , পরিবার পরিজন সহ পথে নেমে এসেছিলেন কে তার হিসাব রাখে ? এটিও মনে রাখা প্রয়োজন যে এই সামাজিক বিশৃঙ্খলা যার জন্য মুকুন্দরাম বাস্তুভিটা ত্যাগ করেছিলেন তার কারণ মোঘল পাঠান সংঘর্ষ নয়, তা আসলে হুসেনশাহী বংশের সঙ্গে সূরবংশের সংঘর্ষের সূচনা করেছে । কিন্তু একথা মেনে নেওয়াই ভালো যে সাধারণ ভাবে মধ্যযুগের কবি ও সাহিত্যিক এই রাষ্ট্র লাঞ্ছনা সম্পর্কে নীরব ।

তবু , এ কথা সত্যি যে সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এদেশের মানুষ দীর্ঘকাল উৎপীড়িত হয়েছিলেন । সমাজে যদি উৎপীড়ন থাকে তবে সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটবেই । মনু , যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর যারই কথা স্মরণ করি না কেন তারা সংহিতা রচনা করেছিলেন সমাজ সংগঠনের একটা বিশেষ আদর্শ নিয়ে , সুতরাং সমাজ যে ভাবে চললে সকলের মঙ্গল হয় তাই তাঁদের লক্ষ্য ছিল । সমাজে যা আছে তারই পুনরাবৃত্তি তাদের উদ্দেশ্য ছিল না । তাই যা হওয়া উচিত তারই অভিব্যক্তি এই স্মৃতি -

শাস্ত্রগুলো। মধ্যযুগে স্বাভাবিকভাবেই এবং সাধারণ কারনেই সমাজে আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না, সাধারণ নরনারীও নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করতে পারতো না, আমরা জানি রাজনৈতিক অস্থিরতাই এর মূল কারণ। তুর্কী আক্রমনের পর প্রায় দু'শ বছর যাবৎ অর্থাৎ ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতক এই অস্থিরতা বর্তমান ছিল, পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে (১৪৯৩) যখন হুসেন-শাহ্ বাঙলা দেশের শাসন ভার গ্রহণ করলেন তখন থেকেই সামাজিক জীবনের অস্থিরতা দূর হয়ে যায়। সর্বত্র শান্তি ও স্থিতির ভাব স্থায়ী হয়। তবুও সাধারণ ভাবেই একথা বলা চলে সমাজ জীবনে নৈতিক আদর্শ তেমন সবল ছিল না। বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সেই দুর্বলতার ভাবটি ধরা পড়েছে। জয়দেব যে সমাজের চিত্র এঁকেছিলেন তা দেখেও আমরা আশান্বিত হই না, সে যুগের সাহিত্যে এমন কি পদাবলী সাহিত্যেও তার নিদর্শন আছে।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণ নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন যে রাধাকে ভোগ করবার জন্যই তিনি অবতার হয়ে এসেছেন — রাধা তখন এগার বৎসরের বালিকা মাত্র। বড়ু চন্ডীদাস দেখিয়েছেন এই বালিকাকেই ভোগ করতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কত অনুরোধ, উপরোধ ও লাঞ্ছনা। কাব্যের দানখন্ডে যখন সেই সম্ভোগ বাসনা চরিতার্থ হলো সেই সম্ভোগের পর থেকেই রাধিকার মনেও পরিবর্তন ঘটেছে কবি এইভাবে দেখিয়েছেন। বাস্তব জীবনে একে ঠিক পেছনে লাগা বলে। কৃষ্ণ রাধিকার রোদে ছত্র ধারণ করেছেন, ভারখন্ডে তার দধির ভারও বহন করেছেন, শেষ পর্যন্ত এই সম্ভোগের মধ্য দিয়ে প্রেমের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে,

কাব্যের বংশীখণ্ডে ও বিরহ অংশে এই হাহাকারের চিত্র আমরা দেখতে পেয়েছি। এই দুই অংশে রাধার চিত্র প্রেমিকারই চিত্র। পদাবলীর রাধিকা এইখান থেকেই যাত্রা করেছে। সমাজে নরনারী কেহই প্রেমের ব্যাপারে সুস্থ আদর্শের অনুসারী ছিল না বলেই আমরা মঙ্গলকাব্যেও এর ছাপ দেখতে পেয়েছি। কবি নারায়ণ দেবের '' মনসা পুরাণে '' গোদা এবং ধনামনা প্রভৃতি চরিত্র নারীদেহ ভোগলোলুপতার এক সুন্দর ও সার্থক উদাহরণ। আসল-কথা সমাজে দুর্নীতি ছিল, পাপপঙ্কিল চিত্রও ছিল। কিন্তু সমগ্রভাবে তা সমাজের পরিচয় বহন করে না। যে সমাজে বেহুলা চরিত্র চিত্রণের যোগ্য কবিও ছিলেন, পুরুষকারের সার্থক দৃষ্টান্ত চাঁদ সদাগরও ছিলেন। আমরা যেন ভুলে না যাই যে বাস্তববাদিতা কবির গুণ নয়, কল্পনার বলে বাস্তব-কে অতিক্রম করাই স্বভাব।

স্মৃতিকারদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রী সংগ্রহ করার ব্যাপার নিয়ে একটু বেশী মেতে উঠেছেন। তার সংহিতায় ''স্ত্রী সংগ্রহ প্রকরণম্ '' নামে একটি বিশিষ্ট অধ্যায় যুক্ত হয়েছে। এই প্রকরণে কিভাবে নারীদের মন জয় করা যায় তার বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে -- পড়লে মনে হয় বাৎস্যায়ন রচিত ''কামসূত্র '' পড়ছি।

পুমান্ সংগ্রহণে গ্রাহ্যঃ কেশাকেশি পরস্ত্রিয়া।
সদ্যো বা কামজৈশ্চিহ্নৈঃ প্রতিপত্তৌ দ্বয়ো স্তথা।।

-- অর্থাৎ নারীদের মন জয় করতে হলে নানা প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে

হবে। প্রথমত: কেশে কেশে আকর্ষন করে খেলা, দ্বিতীয়ত: নারীদেহে কামজ চিহ্ন উৎপাদন করা। এই কামজ চিহ্ন অবশ্য অনুরাগ জনিত, নখক্ষত বা ব্রন ইত্যাদি উল্লেখ করা যেতে পারে।

নীবিস্তন প্রাবরণ সক্থিকেশাবমর্শননম্।
অদেশকাল সভাষং সহৈকাসনমেবচ।।

—অর্থাৎ নারীদের চিত্ত জয় করার পথ অনেক — কখনো বা নীবি (মেয়েদের কোমরের কাছে পরিধেয় বস্ত্রের গিঁঠ বা বাঁধন), কখনো স্তন, কখনো বা পরিধেয় বস্ত্র, হাঁটু স্পর্শ করা, নির্জনে আলাপ এবং একই আসনে বসা প্রভৃতি উপায়ে নারীর মন জয় করা যেতে পারে। এই উপায়গুলি অবশ্য বাস্তব। কিন্তু বাস্তব জীবনে এই সব পন্থার প্রয়োগে নারীচিত্ত জয়ের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। তবে যাজ্ঞবল্ক্য একদিকে প্রশংসার যোগ্য। কেননা দন্ডবিধানে মনু অপেক্ষাও কঠোর হতে পেরেছেন। তার বিহিত দন্ড এই — যদি পরদারাভিগমনে কেউ যদি অপরাধী হয় এবং সেই নারী যদি উৎকৃষ্ট বর্নজাতা হয় তবে সেই অপরাধীর লিঙগচ্ছেদন পূর্বক বধ করা উচিত। এই দন্ডবিধানের উপর আমরা মন্তব্য করতে চাইনা। তবে আমাদের মনে হয় এই কঠোর দন্ড বিধানের ভয়ে এবং কতকটা সংস্কারের ভয়ে স্মৃতিশাসিত সমাজের কারো স্বাধীন চিন্তা ছিল না। তারা নির্বিচারে ঐসব বিধান মেনে চলাকেই পরমার্থ মনে করতো। স্মৃতিবিহিত দন্ডের মার খেয়েছে মানুষ, এবং এই মানুষেরই ছায়া অবলম্বনে শিল্পী তার ভাবপ্রতিমা গঠন করেছেন, কখনো বা বাস্তবকে অতিক্রম করে

কল্পনায় নতুন সৃষ্টি করেছেন। সমাজ মুগ্ধ হয়ে সেই কবির সৃষ্টিকে গ্রহণ করেছেন। মঙ্গলকাব্য সাহিত্যে বেহুলা, সতীময়না প্রভৃতি সেই ধরনের চরিত্র।

হিন্দু সমাজ পরিচালিত হতো স্মৃতিশাস্ত্র অনুমোদিত ব্যবস্থা দিয়ে। এই আদর্শ সংরক্ষনে হিন্দুরা ছিল রক্ষনশীল। হিন্দু সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য এই যে ধর্মকে কেন্দ্র করেই এর সাহিত্য, সমাজ ও শিল্প গড়ে উঠেছে। এর অপর বৈশিষ্ট্য হল অতীতকে সরাসরি অস্বীকার না করা। অনেকটা রক্ষন - শীলতা হিন্দু সংস্কৃতির মূলে শেকড় গেড়ে বসে আছে। কিন্তু যুগে যুগে সমাজ জীবনে পরিবর্তন, কালের অমোঘগতির ফলে হতে বাধ্য। হিন্দুরা এই পরিবর্তনকে যথাসাধ্য অতীতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই মেনে নিয়েছে, অতীতকে নস্যাৎ করে নয়। কাব্যিক ভাষায় বলা চলে হিন্দু সংস্কৃতি যেন স্মৃতিবাহী চেতনার তরঙ্গ দোলনায় দুলে দুলে উত্থান - পতনের মধ্যদিয়ে এগিয়ে চলে। মধ্যযুগে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রামানিক স্মৃতিগ্রন্থের নতুন নতুন টীকা হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের স্মার্ত পণ্ডিতগণ প্রাচীনের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে নবীন জীবন বোধকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে - ছেন। বাঙলাদেশে এই কাজ করেছেন শূলপাণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত পণ্ডিতগণ। কাজেই মধ্যযুগে বাঙালীর ধর্ম ও সমাজ কি আদর্শে পরি - চালিত হয়েছিল তা এই সব সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে জানতে পারা যায়। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই বাঙলাদেশে এইসব স্মৃতিগ্রন্থ রচিত হয়েছিল।

বাঙালী হিন্দু সমাজে বহু সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, পাশুপত, পাঞ্চরাত্র, কাপালিক, কৌল, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায় ও মতের কমবেশি প্রভাব বাঙালী হিন্দুসমাজে স্পষ্টই ছিল। বহু দেবদেবীর বিভিন্ন মতে পূজা অর্চনা করা হত, নানা ব্রত পালন করা হত আর সেই সব দেবদেবীর উপর আরোপিত গুণাবলীর অনুসরণ করার প্রবণতা সমাজ জীবনে চালু ছিল।

বঙ্গীয়স্মৃতিকারগণ নরনারীর যৌন সম্পর্ক স্থাপন ও পালন সম্পর্কে খুব সতর্ক ও সচেতন ছিলেন। এ বিষয়ে তাদের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সতর্ক। এই সতর্কতা দৃষ্টে অনুমান করা কঠিন নয় যে যৌন জীবন খুব শিথিল ছিল। এত শিথিল ছিল যে স্মৃতিকারেরা সেই শৈথিল্যকে চেয়েছেন বল্গা লাগিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে। এরা মাতৃস্থানীয়া রূপে চিহ্নিত করেছেন মাতার সপত্নী, ভগ্নী, আচার্য্য-কন্যা, আচার্যানী এবং স্বীয় কন্যাকে। কোন অবস্থাতেই এই সব রমনীর সঙ্গে পুরুষের যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা বিধেয় নয় বলে বিধান দিয়েছেন বঙ্গীয় স্মৃতিকারেরা।

॥চার॥

যাজ্ঞবল্ক্য অবশ্য মনুর মত - ''ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'' - এ জাতীয় উদার ঘোষনা করেননি, তথাপি গৃহজীবনের প্রতি ধাপে অসংখ্য বিধানে নারী জীবনকে জর্জরিত করেছেন - প্রতিপদে অপরাধ এবং তার প্রায়শ্চিত্ত বিধান। উপবাস, পৃথিবীর সমস্ত সুখে বৈরাগ্য ও আত্মপীড়ন এই যেন এই সব স্মৃতিকারদের নিকট ধর্মের ব্যাখ্যা। গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত তৃষ্ণা-পীড়িত হয়ে যদি এক পাত্র বরফজল খেলাম তবে আমার ধর্ম নষ্ট হলো। জ্বরবিকারের রুগ্নশয্যায় কষ্টে প্রাণ যায় যায় হয়েছে, ডাক্তার আমার প্রাণরক্ষার জন্যই যদি ঔষধের সঙ্গে পাঁচফোঁটা ব্র্যান্ডি মিশিয়ে দিলেন তবে আমার ধর্ম গেল। ধর্মোপার্জনের জন্য শুধু পুরোহিত মহাশয়কে দাও, গুরুঠাকুরকে দাও, নিষ্কর্মা লোভী কুকর্মাসক্ত ব্রাহ্মণদের দাও, - তুমি প্রাণ দিয়েও যে অর্থোপার্জন করেছো সেই ধন অপাত্রে ন্যস্ত করো - এই পথে ধর্ম রক্ষিত হবে। আমরা বাল্যকাল থেকেই একই ধর্মকে চিনতে শিখেছি - বস্তুত: ধর্মশিক্ষকরূপী স্মৃতিকারগণ যেভাবে ধর্মের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন তার মূর্তি অত্যন্ত ভয়ানক। এই সব বিধানের কুহকে পুরুষগণ যেমন জর্জরিত হয়েছে - ততোধিক জর্জরিত হয়েছে স্ত্রীজাতি। কেননা এই নারী জাতির প্রতি ধর্মশিক্ষকগণ অত্যন্ত বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিলেন। মানুষ সুখী হওয়ার জন্যই সমাজবদ্ধ হয়ে থাকে। সুখের পরিমান বেশী হবে এই আশাতেই সকলে একসঙ্গে মিলেমিশে বাস করে। মানুষ যে সব দু:খ অনুভব করে তারমধ্যে কতকগুলি আছে সামাজিক দু:খ, যেমন দরিদ্র,

সামাজিক দু:খগুলি চেষ্টা ও নিষ্ঠা থাকলে নিবারণ অসম্ভব নয় । তবে অনিবার্য দু:খ মাত্রায় কমান যেতে পারে । যে রোগ সাংঘাতিক তারও চিকিৎসা আছে , তারও যন্ত্রণা কমান যেতে পারে । কিন্তু সমাজের এই অনিবার্য দু:খের কারণ কি ? কে মানুষের উপর অত্যাচার করে ? পরস্পরের স্বার্থ বিধানের জন্যই যারা সমাজবদ্ধ হয়েছে তারাই পরস্পরকে উৎপীড়ন করে । ঠিক তাই বটে , অথচ ঠিক তা নয় । মনে রাখতে হবে যে শক্তিরই অত্যাচার - যার হাতে সামাজিক শক্তি সেই অত্যাচার করে । সমাজের শক্তি প্রধান শক্তি কেন্দ্র নিহিত । সেই শক্তি শাসন শক্তি । সমাজের শাসনকেন্দ্রে রয়েছেন রাজা বা সামাজিক শাসনকর্তাগণ - এরা রাজপুরুষ , অত্যাচারের পাত্র সমাজ । প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণগণ রাজ - পুরুষ নন । অথচ তারাই সমাজের প্রধান শাসনকর্তা । তারা সমাজকে যেদিকে ফিরাতেন এবং ঘুরাতেন সমাজ সেই দিকেই ফিরতো এবং ঘুরতো । বাঙলার মধ্যযুগে সমাজের শাসক এই আর্যপুরোহিতগণতো ছিলেনই , তার সঙ্গে ছিলেন স্মৃতিকারগণ এবং রাজপুরুষ ।

আমাদের এইটুকু মনে রাখা দরকার তুর্কীশাসনের পর বাঙলাদেশ ছিল মোঘল ও পাঠান শক্তির অধীন । তারা কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী বাঙলাদেশ শাসন করতে পারতেন না, সুযোগ্য প্রতিনিধিকে পাঠাতেন শাসনকার্য নির্বাহ করার জন্য । এই প্রতিনিধিবর্গ মানুষ না হয়ে যদি অমানুষ হতেন তাহলে আর রক্ষা ছিল না । তারা এটুকু বুঝতেন বহু দূরবর্তী কেন্দ্রের রাজ - শক্তির নিকট তাদের কৈফিয়ত দেবার কিছুই নেই , কৈফিয়ত নেবারও কেউ

নেই। সুতরাং যা পার গুছিয়ে নাও। এই নীতির বশেই যারা স্বল্প-কালের জন্য রাজস্ব আদায়ের জন্য আসতেন তারা রাজস্ব আদায়ের ছলেই অগণিত কৃষককে ভূমিহীন করেছেন, অগণিত দরিদ্রকে বাস্তুহীন করেছেন। নিজের পকেট বোঝাই করাই তাদের একমাত্র পরমার্থ। আমাদের মঙ্গলকাব্য গুলিতে এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই, বস্তুত: এদের অত্যাচারেই সমাজে দু:খের উৎপত্তি। মুষ্টিমেয় লোক কেবলমাত্র মুনাফার লোভে সমাজের অধিকাংশ লোকের উপরে অত্যাচার করে গেছে - সমাজের এই নজিরও মিলবে। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সুবিচারের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে—

হীনজাতিং পরিক্ষীণম্ ঋণার্থং কর্মকারয়েৎ।
ব্রাহ্মণস্তু পরিক্ষীণ: শনৈর্দাপ্যো যথোদয়ম্।।

(ঋণদান প্রকরণম — তৃতীয় অধ্যায়)

— অর্থাৎ ঋণগ্রহণকারী যদি হীন জাতি হয় তবে ঋণ শোধের জন্য তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে, অবশ্য ব্রাহ্মণ যদি ঋণী হন তিনি তার অর্থসঞ্চয় অনুযায়ী ধীরে ধীরে ঋণশোধ করতে পারবেন।

রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বিন্নাং পতিপুত্রাস্তু বার্দ্ধকে।
অভাবে জ্ঞাতয়স্তেষাং ন স্বাতন্ত্র্যং ক্বচিৎ স্ত্রিয়া:।।

(বিবাহ প্রকরণে — শ্লোক নং ৬৪)

— বাল্যে কন্যাকে পিতাই দেখবেন, আর বার্দ্ধক্যে দেখবেন পতি এবং পুত্রগণ। এর অভাবে জ্ঞাতিগণ দেখবেন, মোটকথা স্ত্রীজাতি কোন অবস্থাতেই স্বাধীনভাবে চলতে পারবে না।

মনু অবশ্য প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন — ''ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি''। যাজ্ঞবল্ক্য অন্যকথা প্রসঙ্গে বলে ফেললেন একই কথা। মনুসংহিতায় আমরা পেয়েছি স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হল তার কারণ তারা স্বভাবতই ব্যভিচারিনী।

পরাশরও মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতই ব্রাহ্মণের প্রশংসায় মুখর —

যুগে যুগে চ যে ধর্মাস্তত্র তত্র চ যে দ্বিজাঃ।
তেষাং নিন্দা ন কর্তব্যা যুগরূপা হিতে দ্বিজাঃ।।

— অর্থাৎ যুগে যুগে ধর্ম পরিবর্তিত হতে পারে, ব্রাহ্মণ ও স্বতন্ত্র হতে পারেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের নিন্দা কখনো করবে না, কেননা তারা সমাজের স্তম্ভ স্বরূপ।

পরাশরের এই ব্রাহ্মণ ভক্তির আর একটি উদাহরণ —

পরাশরমতং পুণ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্।
চিন্তিতং ব্রাহ্মণার্থায় ধর্মসংস্থাপনায় চ।। (৩৬)

এই অভিমত পুণ্য, পবিত্র এবং পাপ - বিমোচনকারী। পরাশর চিন্তা করেছেন ব্রাহ্মণদের জন্য এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য। সমস্ত পরাশর সংহিতা একমাত্র ব্রাহ্মণদের জন্য এই মত কেউ না মানতেও পারেন। এই ব্রাহ্মণের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, মনুসংহিতায় এবং যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় অজস্র। তবে পরাশর নারীদের সম্পর্কে একটি বিধান দিয়েছেন তা

উল্লেখযোগ্য —

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ: ।

পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরণ্যে বিধীয়তে ।।

— স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন , স্বামীর মৃত্যু হয়েছে , স্বামী সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেছেন , স্বামী ক্লীব , স্বামী ধর্মে পতিত হয়েছেন — স্ত্রীর এই পাঁচপ্রকার সংকটে অন্যপতির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শোনা যায় , এই শ্লোকটি থেকে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের প্রবর্তনের প্রেরণা পেয়েছিলেন । কিন্তু পরাশর অনেক পরবর্তী কালের লেখক । তাই তাঁকে নিয়ে কোন আলোচনা এই নিবন্ধে প্রাসঙ্গিক হবে না ।

।। পাঁচ ।।

আসলকথাটা সামন্ততন্ত্রবাদ নিয়ে । তার আলোচনা প্রয়োজন ।

বাঙলাদেশ মোঘলের অধীনে আসে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে । মোঘল সম্রাট আকবর সে কাজটি সমাধা করেন । কিন্তু বহুদূরবর্তী বাঙলাদেশের রক্ষণাবেক্ষণ দিল্লীবাসী সম্রাটের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল বলেই তারা বাঙলা শাসনের জন্য প্রতিনিধি পাঠাতেন । এই প্রতিনিধিদের পক্ষে স্বেচ্ছাচারী হওয়ার প্রবল সুযোগ ছিল । তাঁরা রাজস্ব আদায়ের ছলে

প্রজাদের উপর এবং জনসাধারণর উপর অত্যাচার চালাতেন । ''বঙ্গদেশের কৃষক '' নামক প্রবন্ধে বঙ্কিম চন্দ্র এই সামন্ততন্ত্র কিভাবে বাংলাদেশকে গ্রাস করেছিল সে সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা সুরুতেই উদধৃত হয়েছে ।

এ যেন অনেকটা দিল্লী সুলতান বা সম্রাট প্রেরিত শাসক প্রতিনিধির চিত্র । সম্রাট আকবর পাঠিয়েছিলেন তার সেনাপতি রাজা মানসিংহকে । কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই যে এরা রাজা হবেন তার কোন অর্থ নেই , দিল্লী প্রেরিত রাজকর্মচারীকেই রাজ্যশাসনের সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে পাঠানো হতো। তারা রাজ্যশাসন করতেন না , স্বার্থের বশে অত্যাচারী হয়ে উঠতেন । সামন্তনৃপতিদের দিয়ে রাজ্যশাসনের নীতিকেই ইতিহাসে সামন্ততন্ত্র বলা হয়েছে । এই তন্ত্র শাসিত নীতি রাজ্যের পক্ষে বিভীষিকা মাত্র । সকল-ক্ষেত্রেই যে এই কর সংগ্রাহকগণ অত্যাচারী হতেন তার কোন যুক্তি নেই। তবে বাস্তব জীবন থেকে এই রীতি প্রজাপীড়নের একটা কৌশলমাত্র ।

রবীন্দ্রনাথ কোন এক প্রসঙ্গে বলেছেন -- ''আরম্ভের ও আরম্ভ আছে । যেমন সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জ্বালাবার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানো ।'' পরবর্তীকালে মোঘল সম্রাট আকবর রাজা মানসিংহের সাহায্যে অশান্ত বাংলাদেশকে শান্ত করবার জন্য এবং শাসনকার্যে শৃংখলা স্হাপনের জন্য যে ভূস্বামী প্রথা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তারও আগে শেরশাহ এই দেশে এই প্রথার সূচনা করে গিয়েছিলেন । বাংলাদেশকে

বলা হতো ''বিদ্রোহনগরী'' । এই নগরীকে শান্ত করতে গিয়ে তিনি দেশকে অনেকগুলি জায়গীরে ভাগ করে, প্রত্যেক ভাগের কর্তৃত্ব অর্পন করেছিলেন আফ - গান দলপতিদের উপর । এইভাবে বাঙ্‌লাদেশে জায়গীর প্রথার পত্তন হয়েছিল, এইভাবেই আমাদের দেশে ভুঁইয়াদের উৎপত্তি হয়েছিল । পানিপথের যুদ্ধে হিমুকে নিহত করে আকবর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করলেন, তখন বাঙলার পাঠান শাসন ভেঙেগ পড়ছিল । হুসেনশাহী আমাল থেকে সুবাদার মান - সিংহের সময় পর্যন্ত বাঙ্‌লাদেশের সমাজ জীবনের কথা আলোচনা করলে কতকগুলি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা হবে । পাঠান যুগে হুসেনশাহ হাবসী কুশাসন থেকে যখন বাঙলাকে রক্ষা করলেন তখন আপনার অজ্ঞাতসারে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সমাধা করেছিলেন । হুসেনশাহ সর্বপ্রথম ক্ষমতাচ্যুত ভূমিহীন ওমরাহ ও হিন্দু অভিজাত সমাজকে পুনরায় স্বস্হানে প্রতিষ্ঠিত করলেন । পরে অবশ্য মুঘল আক্রমনের পর এই আভিজাত্য ভাঙতে আরম্ভ করে । মুঘল শক্তির কাছে বাঙ্‌লার ভুঁইয়াগণ একে একে পরাজিত হলেন তাঁদের জমিদারী ও বিপুল ঐশ্বর্য মোঘল সেনাপতিদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো ।

সাধারণ মানুষ নিয়েই সমাজ, তারাই ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রধান উপাদান । তারা শুধু যুদ্ধ বিগ্রহে কামানের খাদ্যই হয়নি । — দেশ, জাতি, সমাজ ও সংস্কৃতিকে নানা দিক দিয়ে পুষ্ট করেছে । শেরশাহ পরবর্তীকালে এই প্রথাকেই পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন । এরা মোঘল শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সঙেগ সঙেগ সুবাদার মানসিংহ তাদের দমন করেছিলেন।

এই ভূস্বামীরা যাদের সাহায্যে কর আদায় করতেন তারা প্রায়ই উৎপীড়ক এবং স্বেচ্ছাচারী হতো। মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গলকাব্যে আমরা তার সামান্য পরিচয় পেয়েছি মাত্র। মনে রাখতে হবে, মোঘল আমলেই বাঙলাদেশে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথম বৈশিষ্ট্য, দিল্লীর সঙ্গে বাঙলার যোগাযোগ স্থাপন, বাঙলা যে সর্বভারতীয় ঐক্যের অন্যতম অংশ তা মোঘল আমলেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। পাঠান আমলে মোঘল সুবাদারগণ কেউ বাঙলাদেশকে প্রীতির চোখে দেখতেন না, অনেকটা ইংরেজ রাজকর্মচারীর মতই এদেশে কিছুদিন চাকুরী করে প্রচুর ধনসম্পত্তি সহ দিল্লী আগ্রায় ফিরে গিয়ে ওমরাহ বনে যেতেন। বাঙলার সঙ্গে শাসন ছাড়া অন্য কোন মানসিক বা সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল না। তবে মনে রাখতে হবে পাঠান আমলেই চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাঙলা সাহিত্য বিচিত্রভাবে বিকশিত হয়েছিল। বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, মুকুন্দরাম এঁরা পাঠান আমলের প্রভাবেই বর্দ্ধিত হয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র এই পাঠান আমলের ইতিহাসকে বাঙলাদেশের ইতিহাস বলেই স্বীকার করেননি এই মন্তব্যের উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করা বোধ হয় সঙ্গত হবে না। ১৫৯৪ থেকে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় বার বৎসর একাধিক বার বাঙলায় সুবেদারী করে মানসিংহ দেশে মুঘলরাজশক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তার শক্তি ও বুদ্ধি বলে বিদ্রোহী ভুঁইয়ারা হতবল হয়েছিলেন, কেউ বা নিহত হয়েছিলেন, এইভাবে মানসিংহের বিচক্ষণতায় বাঙলায় মুঘল শক্তির বিপদ কেটে গেল। অর্থাৎ মানসিংহ বাঙলাদেশকে মুঘলশক্তির ছায়াতলে আনতে সাহায্য করে এদেশে একটা

দীর্ঘস্থায়ী শাসনব্যবস্থার পথ প্রশস্ত করেছিলেন। অবশ্য, শেরশাহের আমলেই বাওলা কতকগুলি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত হয়েছিল এবং প্রতি - খণ্ডে একজন ক'রে আমীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন।

আগেই বলেছি, প্রাক্মোঘল যুগের পাঠান শাসকদের ইতিহাসকে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলার প্রকৃত ইতিহাস বলে স্বীকার করেন নি। ষোড়শ শতকে মোঘল শাসন স্থাপিত হয়েছিল - এর পূর্ববর্তী পাঠান শাসন সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি যুক্তিহীন নয়। এই যুগ সম্পর্কে মুসলমান ঐতিহাসিক-গণ অর্থাৎ তবাকৎ - ই - নাসিরী, রিয়াজ - উস - সালা - তিন, আইন-ই-আকবরী, তারিখ-ই-ফিরিস্তার লেখকগণ যে বৃত্তান্ত রেখে গেছেন তা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'অপদার্থ' পাঠান শাসকগণের 'খিচুরি - ভোজনের' ইতিহাস মাত্র। বর্বর শক্তির নির্মম আঘাতে বাঙালীর তখন চৈতন্য ছিল না। পাঠান, খিলজী, বলবন্, মামলুক ও হাবসী সুল - তানদের চণ্ডনীতি ও রক্তাক্ত সংঘর্ষে বাঙালী কোন রকমে আত্মরক্ষা করতেই ব্যস্ত ছিল। তার সামাজিক দেহটাতেই ইসলামের প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল এর ফলে ১৩শ- ১৫শ শতকে বাঙালীর সাহিত্যিক প্রতিভা কিছু পরিমানে ক্ষুন্ন হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই - তবে কিছু স্মৃতিশাস্ত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সব স্মৃতিকারের মধ্যে শূলপানি (পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগ) শ্রীকর আচার্য্য (পঞ্চদশ শতকের চতুর্থ দশক) আচার্য) চূড়ামণী (পঞ্চদশ শতকের শেষদশক) উল্লেখযোগ্য। এঁরা নিয়মের বাঁধ দিয়ে বিধ্বস্ত প্রায় হিন্দুসমাজকে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। কবির ভাষায় —

এ কেবল দিনে রাত্রে জল ঢেলে ফুটাপাত্রে
বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে।

তৃষ্ণা মিটেছিল কিনা জানিনা — তবে একদিকে ব্রাহ্মণের নির্ভেজাল স্তুতি, অন্যদিকে নারী বিদ্বেষ ও শূদ্রনিন্দার অপপ্রচেষ্টার কামনা যে তৃপ্ত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

হাবসী শাসন (১৪৮৭ — ১৪৯৩ খ্রী: অ:)

এই হাবসী খোজার দল প্রায় ছয় বছর ধরে বাঙলাদেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়েছিল। এদের রাজত্ব শুধু রক্তপাত ও হত্যার ইতিহাস। হাবসী শাসনের স্বল্পকালের ইতিহাসের শেষভাগে বাঙলার সুলতান ছিলেন মুজাফ্ফর শাহ্, এর মত নীচ চরিত্র, রক্ত পিপাসু নরপিশাচ সুলতান বাঙলার ইতিহাসে দুর্লভ।

এর আগে আমরা পাঠান শাসনের কালকে (১২০৬ — ১৪৯৩ খ্রী:অ:) কয়েকটি ভাগে ভাগ ক'রে প্রথম ভাগের নাম দিয়েছিলাম আমীর ওমরাহের অধীনে বাঙলা (১২০৬ — ১২২৭ খ্রী: অ:) — এরপর অবশ্য বাঙলা চলে গিয়েছিল দিল্লীর সুলতানের অধীনে। এই আমীর ওমরাহরাই সামন্ত - তান্ত্রিক শাসনযন্ত্র অধিকার ক'রে ইচ্ছেমত আমীর ওমরাহকে গৌড়ের সিংহাসনে বসিয়েছেন এবং নামিয়েছেন।

মুজাফ্ফর সুলতান হয়েই ওমরাহ সম্প্রদায়কে বিনষ্ট করলেন, অভিজাত বংশীয়দের নির্বিচারে হত্যা করতে লাগলেন , তিনি চড়াহারে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করলেন, সেনাবাহিনীর বেতন কমিয়ে দিলেন । পরে তার মন্ত্রী সৈয়দহুসেন পাইকদের সাহায্যে তাকে হত্যা করিয়ে হাবসী শাসনের দুর্ভাগ্য থেকে দেশকে রক্ষা করেন ।

হুসেনশাহ্ সুলতান হয়ে দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতিকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন ।

দীর্ঘ আলোচনার মধ্যদিয়ে এই তথ্যটুকু অন্তত: স্বচ্ছ হবার কথা যে দেশে সুদৃঢ় এবং সর্বগ্রাসী কেন্দ্রীয় শক্তির পরিবর্তে স্বয়ং সম্পূর্ণ সামন্তশ্রেনীর উদ্ভব হয়েছিল । এরা সরকারকে কোন রাজস্ব দিতেন না, সুলতানের প্রয়োজন হলে এরা বাধ্য থাকতেন শুধু সেনাসাহায্য করতে ।

ফলে এরা যাদের সাহায্যে কর সংগ্রহ করতেন — তারা মাঝে মাঝে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতেন । এই কর সংগ্রাহকগণ শুধু রাজস্ব সংগ্রহ করতেন না — নারী সংগ্রহ ছিল তাদের অন্যতম লক্ষ্য , তাছাড়া ধর্ষন , লুন্ঠন , প্রহার এসবতো ছিলই ।

ধর্ষনের পর লুন্ঠিত নারীদলকে পণ্যের মত বিক্রী ক'রে অন্যদেশে চালান দিতো - এটা তাদের ব্যক্তিগত মুনাফা ।

এই নারী ধর্ষনের কি শাস্তি বা কি প্রায়শ্চিত্ত কোন স্মৃতির বিধানেই তা লেখা নেই। তবু সমাজ কর্তাদের বিধান — 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' স্ত্রী জাতি স্বাধীনতার যোগ্য নয় — আর সেই সঙ্গেই নারীস্তুতি - 'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতা:' — 'যেখানে নারীগণ পূজিত হন সেইখানেই দেবতার অধিষ্ঠান'। ভাবের ঘরে চুরি তো একেই বলে।

এই সামাজিক পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্যের যে গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছিল তাতে স্বাভাবিভাবেই তৎকালীন সমাজে গার্হস্থ্য দাম্পত্য ও নর - নারীর ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়েই সে সাহিত্য সীমিত ছিল। রাজন্যবর্গ ও শাসককুলের অত্যাচার ও নিপীড়ন সম্পর্কে পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল কবিগণ কোথাও কোথাও ব্যাজস্তুতির মধ্যে দিয়ে তাদের চরিত্র প্রস্ফুটিত করার চেষ্টা করলেও তা ছিল অত্যন্ত সীমিত। তাছাড়াও এই ধরণের সাহিত্যে কেবল দরবারী জীবনই অঙ্কিত হয়নি সাধারণ নরনারীর চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে। নারী সে সমাজে ভোগের সামগ্রী, ব্যবসায়ের পণ্য, উচ্চাকাঙ্খা পূরণের উপঢৌকন, বিজেতার প্রণয়ী ও গৃহের মর্যাদাহীন দেহ - সর্বস্বা দাসী।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্য সমগ্র মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছে। চন্ডীপূজার প্রচারই এই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য — এই কাব্যে নারীর অমর্যাদাসূচক একটি উক্তি আছে — ''স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি''। এই একটি উক্তি

সমগ্রকাব্যে নারীর স্থান নির্দেশ করছে । এই একটি মন্তব্যেই রয়েছে মধ্য - যুগের সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার প্রতিফলন ।

সমাজ ব্যবস্থা এই । পতিকে ছেড়ে একদিন অন্যত্র বসবাস করলে নারীর যে পাপ হয় তার শাস্তি অমানুষিক -- তার জন্য তাকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয় । কিন্তু একটি পুরুষ তার সতীসাধ্বী সমর্পিত প্রাণা স্ত্রীর চোখের জল ও সহস্র অনুরোধ উপেক্ষা করে অন্যনারীর প্রতি যদি আসক্ত হয় তারজন্য পুরুষের কোন প্রায়শ্চিত্তের বিধান নেই ।

মঙ্গলকাব্যসমূহে সুন্দর পুরুষকে দেখামাত্র একদল নারী স্ব স্ব স্বামীর রকমারি দোষের পাঁচালী গাইবে এবং নিজপতি নিন্দা করে কল্পনায় সেই সুন্দর পুরুষটিকে পতিরূপে পেতে চাইবে এমন বর্ণনা দেখা যায় । যেন নারীর একমাত্র চাহিদা , পুরুষ তাকে উপভোগ করুক ।

আখ্যানকাব্য ----- নরনারীর প্রণয়কে উপলক্ষ্য করে মধ্যযুগে কয়েকটি আখ্যানকাব্যও গড়ে উঠেছিল । সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী এই ধারারই একটি বিখ্যাত কাব্য । কবি দৌলতকাজী ছিলেন মধ্যযুগীয় এবং একাব্যের পৃষ্টপোষকতা করতেন রাজা বাদশারা । পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ময়না-মতীর মত আর্তদীর্ঘশ্বাসে মধ্যযুগের আকাশ বাতাস ব্যথাতুর হয়ে আছে । কাব্যটি দৌলতকাজীর রচনা ।

তখন বল্লালসেনের কৌলীন্যপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে -- তাই মধ্যযুগের সাহিত্যে দেখতে পাই বহুনায়ক একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। প্রথমা স্ত্রীর অনুভূতিকে দলিত ক'রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দ্বিতীয় বিবাহের ব্যবস্থা। লোরচন্দ্রানী বা সতীময়না কাব্যে নায়ক লোর তার স্ত্রী ময়নাকে নিষ্ঠুরভাবে ত্যাগ ক'রে রূপবতী চন্দ্রানীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। অবতাররূপে মানুষ হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নেবার পর অনেক দেবতাও পার্থিব বিচারে কুলীন না হয়েও একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে-ছিলেন। ফলে পার্থিব নায়িকারাই দুঃখভোগ করেছিলেন।

ভোগ্যপণ্য দ্রব্যবিশেষের মত অপছন্দ নারীকে ত্যাগ করে একজন শক্তিমান পুরুষ পছন্দমত অন্য এক নারীর স্বামীকে হত্যা করে তাকে নিজের ভোগের জন্য নিয়ে গেছেন এবং আনন্দে দিনযাপন করছেন। এই চিত্রে স্বৈরাচারী শক্তির স্বেচ্ছাচারিতা প্রকটিত হয়েছে। মধ্য-যুগের সামন্তচক্র এবং তাদের লোভ লালসার কথা মনে রাখলে এ কাব্যের নায়ক সম্পর্কে আর কোন মোহ থাকে না।

ময়মনসিংহ গীতিকার 'জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতী' পালায় আমরা অনু-রূপ চিত্রের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। বিরহজ্বালা সইতে না পেরে চন্দ্রা-বতী মন্দিরে দেব-আরাধনার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। পিতা পুনরায় বিবাহের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন কিন্তু কন্যা পিতাকে বলে-ছিল --''বিয়ে থাক্, আমার জন্য একটা মন্দির করে দাও, মন্দিরে

দেবতার আরাধনায় আমার জীবন কেটে যাবে''। গতানুগতিক চরিত্র হলেও দুই চরিত্রের পৃথক পরিণতি।

সামন্ত শাসিত সমাজে নারীজাতির যথার্থ রূপটি কি ? সহজ কথায় নারীদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না, তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার ও কোন পৃথক মূল্য ছিল না — পুরুষদের খেয়ালের উপরই তাদের জীবন নির্ভর করতো। নারীর মানবিক সত্তাকে সমাজ যেমন মেনে নিতে পারেনি — কবিগণও তা দিতে পারেনি।

তখন নারীজাতির যেমন মূল্য ছিল না, দ্রব্যাদিরও মূল্য ছিল না —অর্থাৎ দ্রব্যাদি খুব সস্তা ছিল। তা হলেও সাধারণ কৃষক ও প্রজাদের দুর্দশার সীমা ছিল না। তার প্রধান কারণ — রাজকর্মচারীদের অযথা অত্যাচার ও উৎপীড়ন। চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী দামুন্যায় ছয় সাত পুরুষ যাবৎ অধিবাসী — তার জীবিকার অবলম্বন ছিল কৃষি। ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে যখন তিনি পৈতৃক ভিটা ছেড়ে অন্যত্র যেতে বাধ্য হলেন তখন তিনদিন ভিক্ষান্নে জীবন ধারণের পর এমন অবস্থা হল যে —

তৈল বিনা কৈল স্নান   করিলুঁ উদক পান
শিশু কাঁদে ওদনের ত'রে।

কবিকঙ্কনের চণ্ডীতে সতীনের কোপে খুল্লনার কষ্ট ও ফুল্লরার বার মাসের দুঃখের বর্ণনায় এই দারিদ্র দুঃখ প্রতিফলিত হয়েছে।

শাসনকর্তার অত্যাচারে স্বচ্ছল গৃহস্থের কিরূপ দুর্দশা হতো , তার বর্ণনা পাই মানিকচন্দ্র রাজার গানে --

ভাটি হইতে আইল বাঙাল লম্বা লম্বা দাড়ি ।
সেই বাঙাল আসিয়া মুল্লকৎ কৈল বাড়ি ।।
আছিল দেড়বুড়ি খাজনা, লইল পনেরো গণ্ডা ।
লাঙল বেচায়, জোয়াল বেচায়, আরো বেচায় কাস ।।
খাজনার ওপেতে বেচায় দুধের ছাওয়াল ।
রাটী কাঙাল দু:খীর বড় দু:খ হইল ।
খানে খানে তালুক সব ছত্র হইয়া গেল ।।

বিদেশী পর্যটক মানরিক লিখেছেন --''খাজনার টাকা না দিতে পারলে হিন্দুদের স্ত্রী ও সন্তানদের নিলামে বিক্রয় করা হতো । কর্মচারীরা কৃষকদের নারীধর্ষণ করতো এবং পিয়াদারা নানা প্রকার উৎপীড়ন করতো -- এর কোন প্রতিকার ছিল না । সাধারণ লোকের দুর্দশার আর একটি কারণ যুদ্ধের সময় সৈন্যদের লুটপাট । যুদ্ধের বিরতির পরেও বিজয়ী সৈন্যেরা লুটপাট করতো । দুই পক্ষের সৈন্যেরাই লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ প্রভৃতিতে এত অভ্যস্ত ছিল যে সৈন্যেরা আগমন বার্তা শুনলেই রাস্তায় দুই পাশের গ্রাম ছেড়ে লোকে দূরে পালিয়ে যেত'' ।

ইতিহাস বলে , সামন্ততন্ত্রের শাসনে নারী মুসলমান কর্মচারী ও পাইকের দবারা ধর্ষিতা হয়েছিল । ইতিহাস মিথ্যে বলে না ।

কিন্তু কোন্ উচ্চতর আদালতের রায় শুনে সমাজের শিল্পী ও কবিরা সিদ্ধান্ত করলেন নারীজাতি আসলে ''পুংশ্চলী'', পুরুষ দেখলেই তাদের চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে ?

নসিয্ নাকে নিয়ে স্মৃতিকারগণ সমর্থন জানালেন ঠিক কথা, 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'। ওদের একটু সতর্ক প্রহরার মধ্যে রাখতে হবে। ধর্ষিতা নারীদের দেখে স্মৃতিকারদের এই সাধারণ উক্তি অযৌক্তিক। সমাজে এই ধরণের নারী ছিল বলেই কবি তার কাব্যে অনুরূপ চরিত্র অঙ্কিত করে-ছেন আর স্মৃতিকার ঐ সতর্কবানী শুনিয়েছেন — একথা ভিত্তিহীন। মধ্য-যুগের সাহিত্য থাক - আমাদের দুই মহাকাব্য রামায়ণ, মহাভারতেও আমরা নারীর এই লাঞ্ছিত রূপ দেখতে পাই। সীতা উদ্ধারের পর রামচন্দ্র দীর্ঘকাল সীতার লঙ্কাবাসহেতু লোকাপবাদের কথা তুলে সীতাকে ত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেছেন। এর আগেই দু:খিনী সীতার অগ্নি পরীক্ষা হয়ে গেছে — স্মৃতিকার তুচ্ছ, স্বয়ং অগ্নিদেব সীতাকে রাম-চন্দ্রের হাতে তুলে দিয়ে বলেছেন, সীতা নিষ্পাপ। তবু সীতা বিসর্জিতা হলেন -- তিনি তখন আসন্ন প্রসবা। অশ্রু, যুক্তি সব কিছুই ভেসে গেল প্রজারঞ্জনের দাবীতে। পরে অবশ্য এই সীতাকেই তিনি সাধারণ মানুষের অপবাদকে বড় মনে করে নিয়ে পাতাল প্রবেশে বাধ্য করেছিলেন — যে সীতা তাঁরই ঔরসজাত সন্তান লবকুশের জননী — যে সীতার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন স্বয়ং ঋষিকবি বাল্মীকি। এ তো নিরাপরাধা নারীর লাঞ্ছনা। এই নারী বিদ্বেষের বীজ পুরুষ চরিত্রের

মধ্যেই ।

মহাভারতেও এই জাতীয় নিগৃহীতার অনুরূপ চরিত্র মিলবে । দুষ্মন্ত মৃগয়া করতে গিয়ে আশ্রম বালিকা শকুন্তলাকে দেখে মুগ্ধ হলেন -- দুজনের মধ্যে গান্ধর্ব বিবাহ হয়ে গেল -- পরে গর্ভবতী শকুন্তলা রাজসভায় এসে লাঞ্ছিতা হলেন , প্রত্যাখ্যাতা হলেন , দুষ্মন্ত তাকে চিনতেই পারলেন না । শুধু তাই নয় , এই অসহায়া রমনীকে অত্যন্ত অশালীন ভাষায় তির - স্কার করলেন --

বেশ্যাগর্ভে জন্ম তোর বেশ্যার প্রকৃতি
এই পুত্র সেই মত সহে মোর মতি ।

মহাভারতে দ্রৌপদীর কথাও তোলা যেতে পারে । নিজেকে পণ রেখে যুধিষ্ঠির পাশাখেলায় হেরে গেলেন তারপর তিনি হেরে গেলেন দ্রৌপদীকে পণ রেখে । নারী যেন একটা প্রাণহীন সম্পত্তিমাত্র । তাকে বাজি ধরে পাশা খেলা যায় । এক মুহূর্তে দ্রৌপদী হয়ে গেলেন কৌরব-দের ভোগ্যা -- তাকে নিয়ে আসা হল সভাকক্ষে -- কামলোলুপ কৌরব - দের আকর্ষণে দ্রৌপদী, তখন প্রায় বিবস্ত্রা সেই দৃশ্য সভ্যজনের অদর্শনীয় , আমরাও সরে এলাম । এলাম সেই মধ্যযুগের সামন্তশাসিত সমাজ ব্যবস্থায়।

আগেই বলেছি , রাজস্ব আদায়কারীরা লুন্ঠন ও নারী ধর্ষণের কাজে বেশ পারদর্শী ছিল । জনৈক বিজয়ী মুঘল সেনানায়কের বিবৃতি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি --'' এরা নগর ও জনপদ লুটপাট করতো , আগুন লাগিয়ে

ধ্বংস করতো , স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার করতো এবং শিশু, যুবক, বৃদ্ধ ও বহু নরনারীকে হরণ করে পশুর মত নৌকার খোলে বোঝাই করে নিয়ে দাসরূপে বিক্রয় করতো । মোটের উপর মধ্যযুগে সাধারণ লোকের অবস্থা খুব ভালো ছিল এরূপ মনে করবার কোন কারণ নেই''।

হিন্দু সংস্কৃতির দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । প্রথমত: এই সংস্কৃতি ধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে , দ্বিতীয়ত: প্রাচীন যুগের সঙ্গে এই সংস্কৃতি যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে , ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন,— ''মধ্যযুগের স্মৃতি নিবন্ধাদিতে (মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি) যে সকল বিধি - নিষেধ আছে উহাদের কতটুকু প্রাচীনতর শাস্ত্রের প্রতিধ্বনি মাত্র এবং কতটুকু তদানীন্তন সমাজের প্রতিচ্ছবি তাহা নির্ণয় করা দুরূহ এবং প্রায় অসম্ভব''। তা যদি সত্য হয় , তবে স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে যে সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে তাকে তৎকালীন ছবি বলে ভুল করা চলবে না । স্মৃতিকারেরা বিধান নির্দেশ ব্যাপারে মোটামুটি গতানুগতিক ধারাকেই অনুসরণ করে চলেছেন — এবং যা আছে তা না বলে প্রধানত: যা হওয়া উচিত তারই নির্দেশ দিয়েছেন। মধ্যযুগের অধিকাংশ স্মৃতিকার বল্লালসেনের (দ্বাদশ শতক) পরবর্তী । বল্লালসেনের প্রবর্তিত কৌলিন্য প্রথা তখন সমাজে দৃঢ়মূল । কুলীন ব্রাহ্মণ চরিত্রগত মারাত্মক অপদার্থ বিবেচিত হলেও শুধু কৌলিন্যের গুণেই তার বহুবিবাহের অধিকার ।

।। ছয় ।।

মনু আটপ্রকার বিবাহের কথা বলেছেন — ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ । পৈশাচ বিবাহ মনুর মতে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট । পৈশাচ বিবাহ হচ্ছে :-

সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি ।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোহধম: ।।(৬.৩৪)

নিদ্রিতা সুরাপানে বিহ্বলা বা উন্মত্তা নারীর সঙ্গে নির্জনে সঙ্গত হওয়ার নাম পৈশাচ বিবাহ । স্মৃতিকারের ঘোষণা, আটপ্রকার বিবাহের মধ্যে এই বিবাহ অত্যন্ত পাপজনক এবং অধম । এই কারণেই মনু শুধু পৈশাচ বিবাহ নয় — তার সঙ্গে আসুর গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস বিবাহ বর্জন করতে বলেছেন । যুক্তি দিয়েছেন, এ জাতীয় বিবাহের ফলে যে সন্তান জন্ম-গ্রহণ করে তারা ক্রূরকর্মা, মিথ্যাবাদী, ধর্ম্ম ও বেদ বিদ্বেষী হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

কিন্তু পুরাণ একথা সমর্থন করে না । দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহে গ্রহণ করেছিলেন — তাদের পুত্র ভরত, অর্জুন চিত্রাঙ্গদার বিবাহকেও গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলা যেতে পারে তাদের পুত্র বীরবভ্রূবাহন, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিনীকে বলপূর্বক হরণ করে নিয়ে বিবাহ করেছিলেন — তাদের প্রথম সন্তানের নাম প্রদ্যুম্ন, এই বিবাহ 'আসুর বিবাহ' ছাড়া আর কি? মনু অসবর্ণে বিবাহও সমর্থন করেছেন —

২. পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাসূপদিশ্যতে ।

অসবর্ণাস্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্ম্মণি ।। (৩.৪৩)

শাস্ত্রে সবর্ণা স্ত্রীরই পাণিগ্রহণ উপদিষ্ট হয়েছে । স্ত্রী যদি অসবর্ণা হয় তবে পাণিগ্রহণের পরিবর্তে নিম্নলিখিত বিধি পালনীয় —

এই বলেই মনু পালনীয় বিধির নির্দেশ দিয়েছেন —

৩. শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া ।

বসনস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্টবেদনে ।। (৩.৪৪)

যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করবেন তখন ক্ষত্রিয়া কন্যা ব্রাহ্মণের পাণিগ্রহণ না করে হস্তধৃত শর গ্রহণ করবে । ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্যা কন্যাকে বিবাহ করলে বৈশ্যা বরহস্তধৃত দণ্ড (অশ্বাদি তাড়াবার দণ্ড-প্রতোদ) , ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূদ্রাকন্যাকে বিবাহ করলে শূদ্রা কন্যা বরের পরিহিত বস্ত্রের প্রান্তভাগ (দশা) গ্রহণ করবে ।

মনুর বিধান এই শ্লোকটিতে দেওয়া হয়েছে । কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে মনে হয় । স্মৃতিকার অনায়াসে বলতে পারতেন — সবর্ণা স্ত্রীরই পাণিগ্রহণ শাস্ত্রসম্মত । আলোচ্য শ্লোকে মনুর বক্তব্য — অসবর্ণা কন্যাকে বিবাহ করতে পারে, তবে তাকে পাণিগ্রহণ বলা যাবে না — কোথাও আঁচলের খুঁট , কোথাও দণ্ড , কোথাও বা বসনের প্রান্তভাগ— এসব গ্রহণ করলেই চলবে । অথচ অসবর্ণ বিবাহ মনু সমর্থন করেছেন । আঁটুনি এত বজ্রকঠিন করতে গিয়েই গেঁরোটা হাল্কা হয়ে গিয়েছে ।

কিন্তু প্রশ্ন এই, অসবর্ণ বিবাহে কি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হয় না ? মনুতো দ্বিতীয় সর্গস্থ পূর্ববর্তী শ্লোকে (দ্রষ্টব্য ৬৭ নং শ্লোক) স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন — জাতকর্ম প্রভৃতি অনুষ্ঠান স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রেও অবশ্য করণীয় - তবে সেই অনুষ্ঠানগুলি হবে 'অমন্ত্রক ' অর্থাৎ বৈদিক মন্ত্র সেই সব অনুষ্ঠানে উচ্চারিত হবে না । কিন্তু স্ত্রীলোকের বিবাহে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত বৈবাহিকো বিধি: স্ত্রীনাং সংস্কারো বৈদিকো স্মৃত: ।

শ্রী জীব ন্যায়তীর্থ সম্পাদিত মনুসংহিতা গ্রন্থে সম্পাদক লিখেছেন — "নারীর পক্ষে পুরুষের সমান দাবীর কথাটা যুক্তিহীন — আধুনিক নরনারীর সাম্যবাদ স্বাভাবিক নহে (!) — ইহা একটা অভিমানিক কৃত্রিম মতবিন্যাস-মাত্র ।'' ন্যায়তীর্থ পন্ডিতের বিধান। নিশ্চয়ই এতে অন্যায় কিছু থাকতে পারে না ।

মনুর নারীবিদ্বেষ কিরূপ উৎকট ছিল — মনুসংহিতা থেকে যদৃচ্ছাক্রমে কয়েকটি শ্লোক উদধৃত ক'রে তার প্রমাণ দিচ্ছি ।

১. দূরস্থো নার্চয়েদেনং ন ক্রুদ্ধো নান্তিকে স্ত্রিয়া: ।।
যানাসনস্থশ্চৈবৈনমবরুহ্যাভিবাদয়েৎ ।। (২.২০২)

শিষ্য নিজে যেতে অসমর্থ হলে অন্যকারও হাতে মাল্যচন্দন পাঠিয়ে গুরুর অর্চনা করবেন , স্ত্রীলোকের নিকটে গুরু অবস্থিত থাকলে তাঁর অর্চনা

করবে না । শিষ্য যানে বা আসনে উপবিষ্ট থাকলে যান থেকে অবতরণ করে বা আসন থেকে উঠে গুরুকে অভিবাদন জানাবে ।

স্ত্রীলোকের নিকটে গুরু অবস্থিত থাকলে - কথাটা লক্ষ্যনীয় ।

২. যদি হি স্ত্রী ন রোচেত পুমাং সং ন প্রমোদয়েৎ ।
অপ্রমোদাৎ পুন: পুংস: প্রজনং ন প্রবর্ত্ততে ।। (৩.৬১)

বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত না থাকলে স্ত্রী স্বামীর প্রীতি জন্মাতে পারেন না , আবার স্ত্রী স্বামীর প্রীতি জন্মাতে না পারলেও সন্তানোৎপাদন হয় না ।

মনুর উক্তি হলেও সংশয়াতীত নয় । বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিত ক'রে স্ত্রীকে সম্মান করা — সে তো স্বামীর কর্তব্য । তার সঙ্গে সন্তানোৎপাদনের কি সম্পর্ক বোঝা গেল না । দেখা গেছে বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিত না হয়েও স্ত্রী স্বামীর প্রীতিভাজন হয়ে থাকেন , (কেননা, স্বামীর প্রীতি কেবলমাত্র বস্ত্র ও অলঙ্কারের উপর নির্ভর করে না ।) তাছাড়া, স্ত্রী স্বামীর প্রীতিভাজন না হয়েও বছরের পর বছর সন্তানের জন্ম হয়ে যাচ্ছে - কোন বাধাই হচ্ছে না ।

৩. স্বাভাব এব নারীণাং নরাণামিহ দূষণম্ ।
অতোহর্থান্ন প্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিত: ।। (২.২১৩)

ইহলোকে পুরুষদের দূষিত করাই নারীদের স্বভাব। সুতরাং পণ্ডিত-গণ নারী সম্পর্কে কখনও অসতর্ক হন না। খুবই চিন্তার কথা। কিন্তু এ জাতীয় পণ্ডিতের সংখ্যা কত? বহু পণ্ডিত বিবাহ করেছেন এবং তাদের বিবাহিত জীবনও সুখের।

৪• নাশ্নীয়াদ্ভার্য্যয়া সার্দ্ধং নৈনামীক্ষেত চাশ্নতীম্।
ক্ষুবতীং জৃম্ভমাণাং বা ন চাসীনাং যথাসুখম্॥ (৪•৪৩)

৪১ নং শ্লোকে মনু রজস্বলা স্ত্রী সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ করে-ছেন। মনুর মতে ঋতুমতী হওয়া কি অপরাধ? আলোচ্য শ্লোকে বলা হয়েছে, ঋতুমতী ভার্য্যার সঙ্গে স্বামী একসঙ্গে ভোজন করবেন না। অথবা ভার্য্যার ভোজন সময়ে তাকে দেখবেন না। ভার্য্যার হাঁচবার সময়, হাইতোলার সময় কিংবা সে যখন ইচ্ছামত অসংযতভাবে সুখে অবস্থান করবে তখনও তাকে দেখবেন না।

ক্ষতি কি? দ্রষ্টা তো স্বামী, দৃষ্টা বিবাহিতা স্ত্রী— দেখলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। তাছাড়া স্ত্রী কখন হাঁচবেন বা হাই তুলবেন স্বামী কি ভাবে তা জানবেন? এখানে স্বামীকে না বলে স্ত্রীকে বলা-ই সঙ্গত — গুরুজনের সামনে হাঁচবেন না বা হাই তুলবেন না। আমাদের মেয়েরা মনু না পড়েই এই নিয়ম পালন ক'রে থাকে। তারা হাঁচে না, উচ্চকণ্ঠে কথা বলে না, শব্দ ক'রে হাসে না — এমনি অনেক কিছুই করে না যা অসৌজন্যের পরিচায়ক।

৫• পিত্রা ভর্ত্রা সুতৈর্বাপি নেচ্ছেদ্ বিরহমাত্মন: ।

এষাং হি বিরহেণ স্ত্রী গর্হ্যে কুর্য্যাদুভে কুলে ।। (৫•১৪৯)

পিতা, স্বামী, বা পুত্রের সঙ্গে নারী কখনও বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকতে ইচ্ছে করবেন না , কারণ এদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকলে তিনি পিতৃকুল ও পতিকুল , উভয় কুলই কলঙ্কিত করবেন ।

মনুর মতে নারীকে কোন অবস্থাতেই স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নয় । এইজন্য তিনি তার চিরজীবনের অভিভাবক স্থির করে' দিয়েছেন ।

টীকাকার কুল্লকভট্ট জানাচ্ছেন —'' ভর্তরি মৃতে পুত্রানাং, তদভাবে তৎ সপিণ্ডেষু , তেষু চ অসৎসু পিতৃপক্ষ: স্ত্রিয়: , পক্ষদ্বয়াবসানে রাজা ভর্তা প্রিয়: স্মৃত:''— শেষ পর্যন্ত রাজার জিম্মায় রাখা হবে নারীকে। ব্যবস্থার কোন ত্রুটিই নেই ।

আর উদধৃতির প্রয়োজন নেই । এতেই নারী সম্পর্কে মনুর মনোভাব সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়বে । এই বিদ্বেষের হেতু কি তা জানবার অবকাশ আমাদের নেই , প্রয়োজনও নেই , কিন্তু এর ফলে প্রায়শ্চিত্ত বিধানে, কি দণ্ড বিধানে সর্বত্র সুবিচার হয়নি — দেখা যাচ্ছে, নারী প্রসঙ্গ এলেই মনু বিষোদ্গার করেছেন ।

যাজ্ঞবল্ক্যের নারী স্তুতিও একই সুরে সাধা । দ' একটি উদাহরণ

পরীক্ষা করা যেতে পারে —

১- সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্য প্রিয়ংবদা ।
স্ত্রী প্রসূত্যধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিনী তথা ।।

(বিবাহ প্রকরণম্ ৩.৭২)

যে কন্যা সুরাপান করে না, (পতত্যর্দ্ধং শরীরস্য যস্য ভার্য্যা সুরাং- পিবেৎ ইতি সামান্যেন নিষেধাৎ) যে কন্যা দীর্ঘরোগগ্রস্হা , নিষ্ফলা , ধূর্তা , নিষ্ঠুরবাদিনী নয় — এমন কন্যাকেই পুরুষ স্ত্রীরূপে নির্বাচিত করবেন । কিন্তু কোন কন্যা সুরাপান করে কিনা , দীর্ঘরোগগ্রস্ত কিনা , ধূর্তা, বন্ধ্যা বা অপ্রিয়ভাষিনী কিনা — এই সব তথ্য বিবাহের পূর্বে জানা যাবে কি উপায়ে ? সবই তো ক্রমশ: জ্ঞাতব্য । এত বিস্তৃত ব্যক্তিগত তথ্য বিবাহের পূর্বে জানা কি সম্ভব ?

২. বিদ্যাতপোভ্যাংহীনেন ন তু গ্রাহ্য: প্রতিগ্রহঃ
গৃহ্ণনং প্রদাতারসধো নয়ত্যাত্মানমেবচ ।।

যে কন্যা বিদ্যা ও তপস্যায় হীনা তাকে বিবাহ করার অবকাশ কোথায় । এই অনির্বাচিত কন্যাপক্ষের কাছ থেকে অলঙকারাদি নেবার প্রসঙ্গই বা কোথায় ?

৩. অনিযুক্তা ভ্রাতৃজায়াং গচ্ছংশ্চান্দ্রায়নং চরেৎ
ত্রিরাত্রান্তে ঘৃতং প্রাশ্য গত্বোদক্যাং বিশুধ্যতি ** ।।

নিযুক্ত না হয়ে যে তার ভ্রাতার স্ত্রীর (জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ট) সঙ্গে সঙ্গত হয়, কিংবা যে নিজের ঋতুমতী স্ত্রীর (উদক্যাং) সঙ্গে রমন করে তার প্রায়শ্চিত্ত এই যে — তাকে তিনরাত্রি উপবাসের পর ঘৃত খেয়ে শুদ্ধ হতে হবে।

এই ধরণের অদ্ভূত প্রায়শ্চিত্তের বিধান মনুও অনেক ক'রে গেছেন। নিয়োগ প্রথা নিয়ে কিছু না বলাই ভাল — এই কলঙ্কিত প্রথা বহুকাল আগে লুপ্ত হয়ে গেছে। এখানে প্রায়শ্চিত্ত বিধানের কথাটা বড় নয়।

আসল কথাটা হচ্ছে পুরুষ ও নারী সম্পর্কে স্মৃতিকারের মনোভাব। যাজ্ঞবল্ক্য আদিম সমাজের উন্নয়নে তৎপর হয়েই এই বিধান করেছেন কিনা বলা মুস্কিল।

নিয়োগ প্রথার কথা মনে করিয়ে দেয় যে নারী কেবল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র ছিল। মহাভারতের ঐ মহৎ দৃষ্টান্ত কোনক্রমেই অনুসরণীয় নয়। অম্বিকা ও অম্বালিকা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে স্বেচ্ছায় দেহদান করেন নি, করেছেন বা করতে বাধ্য হয়েছেন শশ্রুমাতার আদেশে। তাই তৃতীয়বার ওরা নিজেরা গেলেন না - পাঠালেন শূদ্রাদাসীকে। প্রতিবাদের সামাজিক সাহস নেই, তাই অরুচিকর দেহদানের অমর্যাদার কাছ থেকে আত্মরক্ষার নীরব দুর্বলতা।

একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে দ্রৌপদীকে পঞ্চস্বামী

গ্রহন করতে হয়েছিল। কিন্তু তার জন্য যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার বিধান অনু-যায়ী দ্রৌপদীকে একাধিক স্বামী গ্রহণ করার জন্য পাঁচ রাত্রি উপবাস করে, বুক জলে ডুবে থেকে প্রাণায়াম করতে হয়নি।

॥সাত॥

খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম দিকেই যাজ্ঞবল্ক্যের আবির্ভাব। ইনি মনুকেই অনুসরণ করেছেন, কিন্তু মনুর তুলনায় অনেক বেশী উদার। তিনি ব্রাহ্মণদের প্রতি অযথা পক্ষপাতিত্ব দেখাননি কৌটিল্য (খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ - খ্রীষ্টীয় ১০০) উদারতার আদর্শ। তিনি বাল্যবিধবাদের বিবাহ অনু-মোদন করেছেন, তিনি অবিবাহিত কুমারীদের কথাও বলেছেন। কৌটিল্য আত্মহত্যার নিন্দা করেছেন। সতীদাহও নিষিদ্ধ করেছেন।

যাক আমাদের বিবেচ্য শুধু মনু, যাজ্ঞবল্ক্যও পরাশর —'আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে পরাশরের আবির্ভাব। তিনটি স্মৃতিকারের নাম করলাম বটে — কিন্তু এরা একসঙেগই দীর্ঘকাল ভারতীয় সমাজ পরিচালনা ক'রে এসেছেন। এই সকল ধর্মশাস্ত্রের ধর্মসূত্রগুলি সকলকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে।

আমরা লক্ষ্য করেছি , এদের মধ্যে মতবিরোধ আছে । তবু সাধারণভাবে এই কথা বলা চলে — আমরা মনুর শাসনই মেনে চলি । যেখানে মানা অসুবিধে সেখানে যাজ্ঞবল্ক্যের শরণ নেই । আবার কোথাও বা পরাশরের নির্দেশই মেনে থাকি । যে জীবন আমরা যাপন করি — সেখানকার সংস্কারকর্মে মনুই আমাদের সম্বল । এযুগে আমরা কোন পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করি না । বলতে সঙ্কোচ নেই আমরা সকল ক্ষেত্রেই এখন বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করি । এই বিচার বুদ্ধি আমরা পেয়েছি ঊনবিংশ শতকের জাতীয় নব-জাগরণের ফলে । এই স্বাধীন বিচার বোধের নিরিখে আমরা সকলকেই বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে চাই — কাউকে অপরাধী ক'রে লাভ নেই — এটি সভ্যতার দান ।

"The Smritis, their out look & ideals " প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত Venkatrama Sastri লিখেছেন -- "To woman is assigned the care of the home. Family being her creation, her association with man in every sphere is stressed . Her unassociated individuality is ignored and she is advised to turn her back on it even to the total suppression of what may be her individual spiritual need. "

গৃহজীবনের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বভার নারীকেই দেওয়া হয়েছে , পরিবার তারই সৃষ্টি — এবং প্রতিপদে পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্পর্কের উপর জোর দেওয়া হয়েছে । জীবনের যে অংশের সঙ্গে পুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই তাকেই তুচ্ছ করা হয়েছে এবং উপদেশ দেওয়া হয়েছে — তার ব্যক্তিগত আত্মিক সত্তা যেখানে উপেক্ষিত সেই অংশে সে অনায়াসে সেখানেই সে বিদ্রোহ করতে পারে ।

মনু যাজ্ঞবল্ক্য পড়লে মনে হয় না — নারীকে এই বিদ্রোহের অধিকার দেওয়া হয়েছে । এটি লেখকের স্তোকবাক্য মাত্র — সম্পূর্ণভাবে স্বকল্পিত । প্রকৃতপক্ষে একটি গৃহে অন্যান্য পরিজনের সঙ্গে সে বাস করতে পারে বটে , কিন্তু গৃহের সর্বময় কর্তৃত্ব তার নেই — সেখানে সে দাসীমাত্র।

বৈদিক সভ্যতা থেকেই স্বাভাবিক পথে ভারতীয় সভ্যতার সৃষ্টি । বেদে আছে কতকগুলি প্রাকৃতিক শক্তির অনুরাগ রঞ্জিত বন্দনা । এই প্রাকৃতিক শক্তিগুলির মধ্যে আছেন সূর্য্য , চন্দ্র , পবন, রাত্রি , ঊষা প্রভৃতি — বৈদিক মানুষ এদের দেখেছে উপকারী মিত্র হিসেবে — তাই অকুন্ঠভাবে এদের প্রসন্ন করার চেষ্টা এবং প্রসাদ ভিক্ষার আয়োজন । বৈদিক স্তব মালায় এদের কোমল , মধুর স্নিগ্ধ রূপও যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমনি অঙ্কিত হয়েছে প্রলয়ঙ্কর রূপও ।

আর্যগণ যখন ভারতে এসেছিলেন তখন তাদের বিরোধী ছিল এক

অনার্য জাতি এবং দক্ষিণের আর একটি জাতি, এদের সভ্যতা ছিল সকল দিক থেকেই পৃথক। আর্যগণ এদের মধ্যেই নিজেদের সামাজিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে মিশে গিয়েছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, বেদ কতকগুলি স্তব মালার সঙ্কলন তাছাড়া এদের ধর্মীয় কিছু অনুষ্ঠানও ছিল। একটা ধর্মীয় পরিবেশ অনুক্ষণ তাদের সকল চিন্তা ও ভাবনাকে ঘিরে ছিল।

এই ধর্মীয় চেতনা থেকে পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্য কোন কালেই মুক্ত হতে পারে নি। আর একটি কথাও এইখানেই বলে নেওয়া দরকার। দেবতার বন্দনাগীতি রচনার সময় রচয়িতার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি যেমন সজাগ ছিল — অন্যদিকে তেমনি পার্থিব পথে অর্থাৎ স্বাভাবিক ধারায় এরা এদের ভাবনাকে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন। বিভিন্ন দেবতাকে উদ্দেশ্য করে বন্দনাগীতি রচনা করতে গিয়ে তাদের প্রশ্ন জেগেছে — এত বহু দেবতা — আমি কাকে হবি দেব ? '' কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ?'' প্রশ্নের সমাধানও তারা পেয়েছেন — ' নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' — বিশ্বে 'নানা' নেই, একজনই, অন্যান্য দেবতা তারই বিভূতি। সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিল বেদের বহুদেবতাবাদ থেকে (Hedonism) উপনিষদের একেশ্বরবাদ (Monism).

একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে বেদে উষা দেবতার একটি স্তুতিবন্দনা আছে। তাতে উষার বর্ণনায় ঋষি

বলেছেন — উষা যেন একটি নর্ত্তকী বালিকা । সুন্দর পরিচ্ছদে ইনি দেহ আবৃত করেছেন — কিন্তু তার বক্ষ দুটি মুক্ত রেখেছেন — মুক্ত রাখার উদ্দেশ্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা । মৌর্য্য যুগে এক নর্ত্তকী বালিকার অনুরূপ terracotta মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে । কিন্তু বৈদিকযুগে এই জাতীয় মূর্ত্তি নৃত্য, অভিনয়ও সঙ্গীতের এক সম্মিলিত রূপ ।

ভরত বলেছিলেন নাট্য পরিকল্পনার লক্ষ্য ধর্ম্ম ও যশের বৃদ্ধি । এর লক্ষ্য মানবীয় ঘটনা ও চরিত্রের অনুকরণ ।

কালিদাসের কাব্যে বা নাটকে প্রেম তার আবেগ বিহ্বল মুহূর্ত্তেও ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করেনি । এই সংযম ধর্ম্মীয় মনোভাবেরই একটি অঙ্গ — এবং এই ধর্মীয় মনোভাব উত্তরাধিকার সূত্রেই বৈদিক সাহিত্য থেকে classical সাহিত্যে এসেছে । রসশাস্ত্রে এই মূর্ত্তি আর্টের এক অনবদ্য প্রকাশ হিসেবেই গৃহীত হয়েছে । এই ধর্ম্মীয় মনোভাবই কবি ও শিল্পীদের প্রেরণা দিয়েছে তাদের কাব্য বা নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে । কালি - দাস তাঁর বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণ থেকে। তিনি কুমারসম্ভব কাব্যে উমার দৈহিক সৌন্দর্য্য সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন কিন্ত সেখানেও দেখতে পাই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের এক আশ্চর্য সমন্বয় — বলা যেতে পারে ত্রিবর্গ সাধনই যেন কবি ও শিল্পীদের আদর্শ। ভবভূতির মালতীমাধবে বা শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকে ধর্ম্ম অর্থ ও কামের মধ্যে প্রত্যক্ষ সমন্বয় কিছু হয়নি তবু চরিত্রগুলি উন্নতস্তরের । দ্বাদশ থেকে অষ্টা - দশ শতক পর্যন্ত সমস্ত নাটকই হয় কৃষ্ণ কাহিনী নয়তো রামকাহিনীকে

ভিত্তি করে রচিত। চরিত- নাটক বা চরিত - কাব্যগুলি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। হিন্দুর চরিত্রে এই আদর্শনিষ্টা দৃঢ়মূল হয়েই ছিল।

আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রগুলি একবার সযত্নে অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে দশম শতকের পর সমাজস্থ বিভিন্ন বর্ণের মানুষের কর্মকে একই নিয়মে বাঁধ - বার একটা চেষ্টা হয়েছিল। এই চেষ্টার ফলে মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতা এবং মনের সহজ বিকাশ যে বিশেষ পরিমাণে ক্ষুন্ন হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। মানুষের মনের উপর এই অত্যধিক চাপের ফলে মানুষ মনে করতো নিয়মের পূজাই জীবনের পরম সার্থকতা — জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তারা একটা প্যাটার্নের পূজা করতো। পরবর্তী স্মৃতিকারেরাও যেন এই একই কথাই বলতেন — অতীতের নিয়ম-নিষ্ঠাকেই মেনে চলা, তাতেই জীবনের চরিতার্থতা। স্মৃতির খাঁচায় এইভাবেই অতীতের স্বাধীন ও মুক্ত জীবন বন্দী হয়ে গেল। কালিদাসের মত কবিও এই প্যাটার্নের পূজাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। রঘুবংশে আদর্শ রাজা দীলিপের বর্ণনায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অতীতের প্রতি নিষ্ঠা খুবই প্রশংসার বস্তু কিন্তু স্বাধীন চিন্তাকে বিসর্জন দিয়ে নয়। এই কারণেই রামায়ণ, মহাভারত, শূদ্রক ও ভাসের রচনাবলী তুলনায় অনেক বেশী মানবীয় — পরবর্তী কবিদের রচনা থেকে। সামাজিক জীবনের নিশ্চলতাই এর কারণ। কালিদাস খুবই সতর্ক কবি ছিলেন — তার সময়ে গান্ধর্ব্ব হয়তো অচল হয়ে এসেছিল। — এই জন্যই তার নাটকে (শকুন্তলা) পরে তিনি দৈববানীর সাহায্য নিয়েছিলেন — তাতে বলা হয়েছে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বিবাহ করে কিছু -

মাত্র অন্যায় করেন নি — আসলে শকুন্তলা ক্ষত্রিয়েরই কন্যা — সুতরাং নায়কের বিবাহ যোগ্যা। বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতি আনুগত্য এই সংস্কার স্মৃতিকারদেরও রচনা প্রভাবিত করেছিল, তাই তাঁরা তাদের বিধানকে শিথিল করতে পারেন নি। মনু যে সদাচার বিধির কথা বলেছেন তা কঠিনতর করার অবশ্যই প্রয়োজন।

আর একটি প্রয়োজনও ছিল। প্রাচীন সভ্যতা ছিল পল্লী কেন্দ্রিক পরে এই সভ্যতা নগর কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে — ধীরে ধীরে স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ ও মুক্ত জীবনের স্বপ্ন লুপ্ত হয়ে যায়। মুক্ত ও বিহ্বল প্রেম যৌন পিপাসাকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে। এই পিপাসা ব্যক্ত হয়েছে বিভিন্ন কবির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি কবিতায় (Love Lyrics) অমর শতকের বা ভর্তৃহরির খন্ড কবিতা আমরা স্মরণ করতে পারি। জাতির অবদমিত কামনাই সে সব কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। দ্বাদশ শতকের পর সমাজ চিত্র ছিল পৃথক তখন তপোবন জীবনের সঙ্গে নাগরিক জীবনের পার্থক্য দূরীভূত হয়ে গেছে। এই পার্থক্য কালিদাসের আমলে ছিল — ''অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'' নাটকের চতুর্থ, পঞ্চম অঙ্কে দুষ্মন্তের রাজদরবারে শার্ঙ্গরব ও শারদ্বতের উক্তি থেকে তা বোঝা যায়। যে সময়ের কথা বলতে যাচ্ছি সামাজিক মানুষের অবদমিত যৌন পিপাসার নিবৃত্তি হত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি কবিতায়। কিন্তু সেই পথ রুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ।

অথচ সব রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই শৃঙ্গাররস, কাব্যে ও নাটকে এর

গুরুত্ব অসীম । পরবর্তী কালের সাহিত্যে প্রেম ত্রিবর্গের অন্যতম সাধন হিসেবেই স্হান পেয়েছে । অর্থাৎ প্রেমের দৈহিক দিকটা তুচ্ছ না হলেও মনে করানো হতো তা ধর্মের অঙ্গ । ধর্মের বিধিকে লঙ্ঘন না করলে দেহলিপ্সায় কোন বাধা নেই । সংস্কৃত শতক কাব্যগুলি এই ধরণের শৃঙ্গার রসের প্রকৃষ্ট উদা-হরণ । স্মৃতিশাস্ত্রগুলি অথবা আমাদের নৈতিক সাহিত্য সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের জন্য জীবনের প্রতি স্তরে পালনীয় বিধানের নির্দেশ দিয়েছে — এসব বিধান প্রত্যেকটি বর্ণেরই পালনীয় লক্ষ্য , প্রত্যেক মানুষেরই অবশ্য করণীয় । এই বিধানগুলি শতকের পর শতক ক্রমেই কঠোরতর হয়েছে — সামাজিক শিথিলতাই এর কারণ । উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের চরকসংহিতায় চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধীয় যে খাদ্য ও পানীয়ের নির্দেশ ছিল পরবর্তীকালে তা সম্পূর্ণ রূপে অগ্রাহ্য হয়েছে । রাজাদের নিয়মগুলি মেনে চলতে হত — কেননা নিয়ম পালনে বিশেষ শ্রেণী বলে কিছু ছিল না ।

এই সর্বজনীন ধর্মনীতির শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ায় কোন রাজার পক্ষে অত্যা-চারী হয়ে ওঠা কঠিন , এতই কঠিন ছিল ধর্মনীতি ও আইন । সাধারণ ভাবে বলা চলে যে সেই আইন ছিল রাজাদের পালনীয় ।

মৌর্য্যদের শাসনেই কতকগুলি আইন করা হল , আইনগুলি রাজার পক্ষে সুবিধাজনক , প্রজার পক্ষে নয় । মৌর্য্যেরা শূদ্র । সুতরাং শাসনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল । 'ধর্মীয় রাজা ভবতি' — ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্যই

রাজার অস্তিত্ব আত্মস্বার্থপূরণের জন্য নয় ।

আমরা আগেই বলেছি ধর্মসূত্রের শাসন শতকের পর শতক কঠোরতর হয়ে চলেছে । এই সম্পর্কে বিখ্যাত মনীষী ডক্টর সুশীল কুমার দে লিখেছেন --- '' The stringent grip of the smritris became more and more tightened with the advance of centuries . Res - trictions of food and drink and various kinds of conduct and practice became more and mofe stringent signifying there by a slackening tendency in society ."

অর্থাৎ শতাব্দীর পর শতাব্দী অগ্রসর হয়েছে — সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি - শাস্ত্রের নিয়মের কঠোরতাও বেড়েছে । লেখক বলেছেন —
"A slackening tendency in society ;", অর্থাৎ সমাজ জীবনের শিথিলতাই এর কারণ ।

কিন্তু এর দ্বারা স্মৃতিশাস্ত্রের অন্তর্গত নারীবিদ্বেষ বা শূদ্রবিদ্বেষ ব্যাখ্যাত হয় না । গীতায় ভগবান বলেছেন —''চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশ: '', সামাজিক মানুষদের গুণ ও কর্মানুসারেই জাতিকে

চারিটি বর্ণে বিভক্ত করা হয়েছে — এখানে বিভাগের মূল সূত্র — গুণ ও কর্ম। কিন্তু দেখা গেছে চন্ডালের বৃত্তি নিয়েও ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ বলে পূজিত হয়েছে। বেদেও নারী বিদ্বেষ নেই — গুণের গুণে নারীগণ সেখানে সম্মানিত হয়েছে। কিন্তু ঋতুমতী ব্রাহ্মণ কন্যাকে স্পর্শ করলে ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। এই বিধানের বিশ্লেষণের অবকাশ এখানে নেই। সেই ভার ভবিষ্যৎ গবেষকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা আমাদের আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি।

।। আট ।।

এটি বেশ কৌতুকজনক বলেই মনে হতে পারে যে আধুনিক দৃষ্টিতে বিগর্হিত কতকগুলি ব্যাপার স্মৃতিকারগণের সমর্থন লাভ করেছিল।

ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে বাঙলার স্মৃতিকারগণের মধ্যে অধিকাংশই আবির্ভূত হয়েছিলেন দ্বাদশ শতকের পরে। বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলিন্য প্রথার ফলে সমাজের কুশীলবগণ যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এর ফলে একজন কুলীন নন্দন অপদার্থ হলেও একাধিক স্ত্রী নিয়ে সুখে ঘর-সংসার করতেন। বহু বিবাহ এমন ব্যাপক হয়ে পড়েছিল যে স্ত্রীর ভরণ পোষণ বিষয়ে স্বামীর কোন দায়দায়িত্ব ছিল না।

স্মৃতিশাস্ত্রগুলির একটা বৈশিষ্ট্য ছিল — এতে পত্নীর কোন পৃথক সত্তা স্বীকৃত হয়নি। উত্তরাধিকার সূত্রে পতির সম্পত্তিতে পত্নীর অধিকার কেবল ভোগের — বিক্রয় বা দান করার কোন অধিকার স্বীকৃত হয়নি, শুধু সেবার মহত্ত্ব ও মাধুর্য্য নিয়ে বড় বড় বক্তৃতা আছে।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে স্মৃতিকারগণের বিধান যা ছিল সেকথা ভাবাই যায় না আজকের দিনে। স্বামীর কাছ থেকে আলাদা থাকা, অন্যের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো অন্যের গৃহে বাস স্ত্রীলোকের পক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিল। স্বামী বিদেশে থাকলে তার প্রসাধন করা চলবে না তবে একেবারে বিধবার মত প্রসাধন বর্জিত থাকাও চলবে না। স্মৃতির বিধান অনুযায়ী যৌনাচার জনিত অপরাধে ব্যভিচারিনী স্ত্রীকে স্বামী ত্যাগ করতে পারেন বধও করতে পারেন। কিন্তু ব্যভিচারি স্বামীকে স্ত্রী অনুরূপ ভাবে ত্যাগ বা বধ করতে পারবেন কিনা এ সম্বন্ধে শাস্ত্রকার নীরব। একই অপরাধে দন্ড গ্রহণ করে, স্ত্রী ইহলোক ত্যাগ করলেন, অপর জন মনোমত আর একটি স্ত্রী গ্রহণ করে সুখে গৃহজীবন যাপন করলেন। স্ত্রী মৃত্যুর পর সন্তানের কাছে কোন পিন্ড পাবে না — কেবল তার মৃত্যুর তিথি পালনীয়। পতিই পরম গতি নারীর জীবনে — এই ছিল স্মৃতিনিবন্ধকারদের বিধান।

বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে সোজাসুজি বলেছেন — ''অবতার কৈল আহ্মে তোর রতি আশে'' — অর্থাৎ তোমার

দেহ সম্ভোগ করার জন্যই অবতার রূপে আমার আবির্ভাব।

ষোড়শ শতকে শ্রী চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেও বাঙলাদেশে বৈষ্ণব ভাবধারা প্রচলিত ছিল। এই সময়ে তান্ত্রিকেরাও ছিলেন। তান্ত্রিকদের মধ্যে 'কৌলাচারী' —রাই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই কৌলাচারী তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের রীতিনীতি সম্পর্কে রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'বাঙলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে (৩য় সংস্করণ ২৬৬ পৃ:) বর্ণনা করেছেন —'' কেহ এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে এই সম্প্রদায়ভুক্ত একজনের নিকট দীক্ষা নিতে হয় এবং ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাহার বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এবং দিবাভাগে বহুবিধ অনুষ্ঠানের পর ঘোষণা করিতে হয়, সে পূর্বেকার ধর্মসংস্কার সমস্ত ত্যাগ করিল এবং ইহার প্রমাণ স্বরূপ এবং রাত্রিকালে গুরু ও শিষ্য বামাচারী আইন অনুযায়ী আটটি তান্ত্রিক পুরুষ এবং আটটি স্ত্রীলোক (নর্তকী ও তাতির কন্যা, নাপিতের স্ত্রী বা কন্যা, ব্রাহ্মণীর কন্যা, একজন ভূস্বামীর কন্যা ও গোয়ালিনী সহ) একটি অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করে এবং প্রতি পুরুষের পাশে একটি স্ত্রীলোক বসে। গুরু তখন শিষ্যকে নিম্নলিখিত রূপ উপদেশ দেন —' আজি হইতে লজ্জা ঘৃণা শুচি, অশুচি জ্ঞান জাতিভেদ প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ করিবে মদ্য, মাংস, স্ত্রীসম্ভোগ প্রভৃতি দ্বারা ইন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থ করিবে কিন্তু সর্বদা ইষ্টদেবতা শিবকে স্মরণ করিবে এবং মদ্যমাংস প্রভৃতি প্রভুপদে লীন হইবার উপাদান স্বরূপ মনে করিবে।'

বৈষ্ণব সহজিয়ারা এই তান্ত্রিক দর্শনের ভিত্তিতেই পরকীয়া প্রেমের প্রতিষ্ঠা করে। প্রেমের দ্বারা ভগবানকে লাভ করাই তাদের চরম লক্ষ্য। সহজিয়া বৈষ্ণব মতে এই পরকীয়া দেহভোগ থেকেই ভগবানের প্রতি প্রেম জাগ্রত হয়। এই ধরণের সহজিয়া সাহিত্যতত্ত্বের প্রচার সমাজের সর্বস্তরে এমনভাবে শিকড় গেড়ে বসে যে পুরুষ নারীকে ধর্মসাধনের যন্ত্রহিসেবে এবং ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করার জন্য নারীদেহভোগ্য-কাঙ্ক্ষাকে বাড়িয়ে চলতো। ফলে স্ত্রীলোকের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় এবং তাকে পুরুষ সমাজের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগীয় বিকৃত ধর্ম্ম এইভাবেই নারীর ব্যক্তিগত সত্তাকে অস্বীকার করেছে।

অপর এক সম্প্রদায় ধর্মঠাকুরের পূজা করতো। ''শূণ্যপুরাণ ও ধর্মপূজা বিধান'' নামক দু'খানি গ্রন্থে এই সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। নারী সমাজ ছিল এদেরও রিরংসার বলি।

যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে (অন্য সময়ে তো বটেই) সবদেশে সব কালেই সৈন্যদের দ্বারা নারীজাতির অপমানের সীমা থাকে না। 'মহারিস্তান-ই-গ্রায়েরি' নামক সমসাময়িক এক গ্রন্থে মুঘল সৈন্য কর্তৃক প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থকার নিজেই ছিলেন সেনা-নায়ক — তিনি বর্ণনা লিখেছেন —'' যে তার সৈন্যরা চারহাজার স্ত্রী-লোক বন্দী করে এনে সবাইকে বিবস্ত্র ক'রে রেখেছিল। সেনাপতি সংবাদ পেয়ে যখন তাদের মুক্তি দেবার আদেশ দিলেন তখনও কারুর

বস্ত্র ছিল না। পাজামা, বিছানার চাদর আলোয়ান প্রভৃতি দ্বারা কোন-মতে লজ্জা নিবারণ করে তাদের ঘরে পাঠানো হল।''

সতীদাহ প্রথা মধ্যযুগীয় নারী নির্যাতনের এক অন্যতম জঘন্য ঐতিহাসিক প্রমাণ — এর মূলে আছে হিন্দু সমাজের কুসংস্কার। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে সকল সংস্কার বদধা রমনী স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতেন — তাদের কথা পৃথক কিন্তু অনিচ্ছুক রমণী-দের সহস্র কাকুতি মিনতি ভয়ার্ত ক্রন্দন প্রভৃতি তুচ্ছ করে মৃতের আত্মীয় স্বজনেরা জোর করেই পুড়িয়ে মারতেন।

আচার্য্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর ''বৃহৎবঙগ'' নামক গ্রন্থে (পৃ: ৬৫৩) লিখেছেন — '' মুসলমান ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সিন্ধুকী (গুপ্তচর) লাগাইয়া ক্রমাগত হিন্দুললনাগণকে অপহরণ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে মৈমনসিংহের মণ্ডলবাড়ীর দেওয়ানগণ এবং শ্রীহট্টের বানিয়াচকের দেও-য়ানেরা এইরূপ যে কত হিন্দুললনাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়াছেন তাহার অবধি নাই।'' পঞ্চদশ শতকের সাহিত্যেও এমন বহু বর্ণনা আছে।

মধ্যযুগের রাজানুকুল্যে রচিত সাহিত্যে যে সমাজের নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করতে পারবেন না এটিই স্বাভাবিক। আসলে দেশ যখন আক্রান্ত হত তখন লুণ্ঠিত রমণীদের বিবস্ত্রা ক'রে তাদের উপর নৃশংস অত্যাচারীর দলে শুধু মোঘলপাঠান, তাতার, তুর্কী, মগ, পর্তুগীজ ইংরেজ দিনেমার

প্রভৃতি দস্যুরাই ছিলেন তা নয়, এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন এদেশের ভাগ্য-লিপ্সু পরপদলেহী অজস্র পুরুষও।

একশ্রেণীর তথাকথিত দার্শনিক ও সমাজসচেতন পন্ডিতেরা শাস্ত্রচর্চা ও তত্ত্বব্যাখ্যা নিয়ে যতখানি মত্ত ছিলেন সমাজজীবনের মূল নির্ণয়ের দিকে ততখানি আগ্রহী ছিলেন বলে মনে হয়না। এই উচ্চ শ্রেণীর পুরুষ সমাজই মধ্যযুগীয় সমাজজীবনের শাসন ও নিয়ন্ত্রন করতেন। শিক্ষাদীক্ষা ও সাধন ভজনের দ্বারা আত্মিক উন্নয়নের যে প্রচেষ্টা ছিল তাতে একমাত্র পুরুষেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল —— সমাজের অপর অর্দ্ধাংশের তথা নারীজাতির জীবনে শিক্ষা ও সাধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়নি — তাই তারা গৃহান্তরালবর্তিনী হয়েই জীবন যাপন করতে বাধ্য ছিল। যে দু - একটি বিরল উদাহরণ তুলে ধ'রে ঐতিহাসিক বা সমালোচক মধ্যযুগের নারী-শিক্ষার সমর্থনে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন তাদের আমরা সমর্থন করিনা, সমাজের বৃহত্তর অংশে নারীরা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিতাই ছিল। শাস্ত্রীয় যে সব বিধান নারীকে স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন দিয়ে পুণ্য অর্জন করার বা সতী বলে ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তি রক্ষার অবাস্তব প্রলোভনে প্রলুব্ধ করেছিল সেই প্রগতিশীল সমাজ সংস্কারকগণ এ বিধানের মূল্যহীনতা যুক্তি দিয়ে খন্ডন করেছিলেন। এই সব বিধানকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ রূপে পরি-গণিত করে আইন করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। জীবন্ত নারীকে তার স্বামীর চিতায় নির্মমভাবে দগ্ধ করা যে কত বড় পৈশাচিক অপরাধ তা ব্যাখ্যা করা যায় না।

মোটামুটি এইগুলিকেই মধ্যযুগের নারীজাতির লাঞ্ছনার মূলীভূত কারণ রূপে নির্দেশ করা যেতে পারে — মুসলমান রাজগণের ভোগলিপ্সা, বিজয়ী সৈন্যদের রমণী লুণ্ঠন, নাথধর্ম তান্ত্রিক আচার ও ইন্দ্রিয়াসক্তি এবং জাতির মজ্জাগত কয়েকটি কুসংস্কার। সবার উপরে সামন্ত শ্রেণীর অত্যাচার তো ছিলই।

মধ্যযুগের রাজনৈতিক ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপটে রাজকীয় আনুকূল্যে যে সব সাহিত্য রচিত হয়েছিল তার মধ্যে কিছু ইসলামী রোমান্স রাজসভার আনুকূল্যে বাঙলা সাহিত্যে স্হান পেয়েছে। এই যুগের রাজানুকূল্যে প্রকাশিত সাহিত্যসমূহ স্বাভাবিক কারণেই সমাজের নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করতে পারেনি। রাজা ও শাসনকর্তাদের অথবা শাসনকার্য্যের সঙ্গে নিযুক্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গের অসামাজিক আচরণ আচরণ তথা নারীদেহ লোলুপতার কথা সঙ্গত কারণেই অনুগৃহীত কবিগণ চিত্রিত করতে পারেন নি।

কিন্তু কোন কোন সাহিত্যিক স্বাধীনভাবে সমাজচিত্র এঁকেছেন। কবি বৃন্দাবন দাস সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁর 'চৈতন্যভাগবতে' কাজীর আদেশের বিরুদ্ধে চৈতন্যমহাপ্রভুর কণ্ঠে অত্যাচারী কাজীর গৃহ ও গৃহসংলগ্ন বাগান ধ্বংস করার আদেশ ধ্বনিত হয়েছে —

ক্রোধে বলে প্রভু - 'আরে কাজী গেল কোথা'।
ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেল মাথা ।।

প্রাণ লঞা কোথা কাজী গেল দিয়া দ্বার ।
ঘর ভাঙগ ভাঙগ প্রভু বলে বার বার ।।

(চৈতন্যভাগবত মধ্যখন্ড)

কিন্তু কৃষ্ণদাসের''চৈতন্যচরিতামৃত '' গ্রন্থে এই চিত্র অঙ্কিত হয়নি। কবি ছিলেন গৃহী — সমাজ ও শাসনব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল । তাছাড়া অতিবৃদ্ধকালে তিনি তার গ্রন্থ সমাপ্ত করেছিলেন ।

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে , উচ্চ শ্রেণীর গোষ্ঠীই মধ্যযুগীয় সমাজ জীবনকে শাসন ও নিয়ন্ত্রন করেছেন । যতটুকু শিক্ষাদীক্ষা ও সাধন-ভজনের দ্বারা আত্মিক উন্নয়নের প্রচলন ছিল তাতে একমাত্র পুরুষেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল । এরফলে সমাজের অপর অর্দ্ধাংশ তথা নারীর জীবনে নেমে এসেছে সামগ্রিক বঞ্চনা । নারীকে গৃহান্তরালবর্ত্তিনী হয়েই জীবন যাপন করতে হয়েছে । যে দু'একটি বিরল উদাহরণ তুলে ধরে ঐতিহাসিক বা সমালোচকগণ উল্লসিত হয়ে ওঠেন তাদের উল্লাসে বাধা দেবার কিছু নেই । কিন্তু যে দু'চার জন নারী বেদের সূক্ত রচনা করে বা শাস্ত্রগ্রন্থা-দির অনুবাদ ক'রে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন , বৃহত্তর অর্দ্ধাংশের তুলনায় তারা অতি তুচ্ছ । বিদ্যা চিঠি লিখেছিলেন সুন্দরকে — এ সংবাদ আমরা ভারত-চন্দ্রের কাব্য পড়ে জেনেছি । কিন্তু আমরা সে চিঠির মধ্যে পুরুষের ভোগের জন্য নিজ দেহকে উপঢৌকন দেবার আবেদন ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাইনা । সরল সত্য এই , নারীর জীবনবৃত্ত কেবলমাত্র অন্তঃপুরের সাজসজ্জা, রন্ধনাদি প্রকরণ ও পুরুষের ভোগের জন্য নিজদেহের সৌন্দর্য্যচর্চার মধ্যেই ,

সীমিত ছিল । যে পারিবারিক চিত্র সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে চিত্রিত হয়েছে সেখানে একটা গতানুগতিক বংশবৃদিধ ও অর্থোপার্জনের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না ।

বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথা নারী নির্যাতনের অপর নিদর্শন । বাল্যকালে বৃদধ স্বামীর সঙেগ বিবাহ দিয়ে কন্যার পিতা কন্যাদায় থেকে মুক্ত হতেন । সে স্বামীর যদি আরও বহু স্ত্রী থাকে তাতে কিছু যায় আসেনা । সেই বৃদধ স্বামী স্বলপকাল পরে পরলোক গমন করলে সেই বাল্যবিধবাকে সারাটা জীবন এক অপ্রাকৃত আচরণের ভিতর দিয়ে কাটাতে হতো । আসল কথা নারীকে একটা সামাজিক কুপ্রথার বলি হতে হত । এই সব বিধবা মহিলারা কোন সামাজিক মাঙগলিক অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারেনা । সমগ্র সমাজের একটা তাচ্ছিল্য বা অহেতুক করুণার পাত্রী হয়ে এদের বেঁচে থাকতে হতো যার ব্যতিক্রম এখনও তেমন দেখা যায় না ।

।। নয় ।।

ঐহিকবাদী রাষ্ট্রনৈতিক জীবনবাদ ও পারত্রিকবাদী অধ্যাত্মজীবনবাদের দ্বন্দ্বে আবর্তিত মধ্যযুগীয় সমাজজীবন মানবজীবনের সামগ্রিক বিকাশের কোন উচ্চতর চিন্তাধারার ফসল তুলতে পারেনি । যে পারিবারিক জীবন সাহিত্যে

চিত্রিত হয়েছে সেখানে কোন প্রগতির স্পর্শ নেই, কোন প্রাণের স্পন্দন নেই।

মধ্যযুগের শেষভাগে যখন পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহ জ্ঞানে বিজ্ঞানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতিতে উন্নয়নশীলতার দিকে পদক্ষেপ করেছিল তখন এদেশে ষড়-যন্ত্র, ব্যভিচার, দুর্নীতি, শোষনের উন্মত্ততা মানুষের মনকে অত্যন্ত সঙ্কুচিত করে রেখেছিল। বহু শতাব্দীর আক্রমণ, নির্যাতন ও অধিকার স্থাপনের ইতিহাসের ধারা বেয়ে যখন পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল জাতিগুলি এদেশের যুদ্ধ-বাদী শক্তি-সমূহকে নির্ম্মূল ক'রে আপন অধিকার স্থাপনে প্রয়াসী হল তখন সেই স্রোতের সঙ্গে ভেসে আসা উদার মানসিকতা সম্পন্ন কিছু মানবতাবাদী মনীষীর স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো বাঙালী। বাঙালীর ন্যুব্জ পৃষ্ঠ মানসিকতা যেন নতুন ভাবে অঙ্কুরিত হবার সুযোগ পেল। আমরা উনবিংশ শতকের জাতীয় জীবনে নবজাগরণের প্লাবনের কথা মনে করেই একথা বলছি।

এটিই প্রকৃতির নিয়ম - ঢেউ এর পরে ঢেউ। সমুদ্রের ঢেউ থেমে থাকে না - সেই স্তিমিত বেগ সঞ্চারিত হয় পরবর্তী তরঙ্গে। তার রূপ আমরা দেখেছি উনবিংশ শতকে — দর্শনে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্প-কলায়, সংস্কৃতির সমস্ত বিভাগেই সে কি উচ্ছ্বাসে, সে কি প্লাবনের বেগ, সে কি জাগরণের কোলাহল। মধ্যযুগে ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের প্রভাবে জাতীয় জীবনে একবার জোয়ার জেগেছিল। বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী ভিত্তিভূমি রচনা ক'রে দিলেন — গড়ে উঠলো বৈষ্ণব দর্শনে। এছাড়া চরিতসাহিত্যে, রসতত্ত্বে, নাটকে, কাব্যে, অলঙ্কারশাস্ত্রে জাতীয়

ভাবনার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কি উন্মাদনা , কি বিপুল উচ্ছ্বাস । সভ্যতা ও সংস্কৃতির এইটুকুই পার্থক্য । সভ্যতা সিঁড়ির পর সিঁড়ি অতিক্রম ক'রে ক্রমশ: অগ্রগতির পথে চলে — পূর্ববর্ত্তী অভিজ্ঞতা তার পরবর্তী পদক্ষেপের পাথেয় । কিন্তু সংস্কৃতির তরঙ্গ কখন আসে কেউ বলতে পারে না । বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক কারণে বা প্রভাবে এই পরিবর্ত্তন আসে জাতীর জীবনে। এই জোয়ার এসেছিল ইটালীতে চতুর্দশ শতকে — তার জের পঞ্চদশ শতক এমনকি ষোড়শ শতক পর্যন্ত চলেছিল । আমাদের দেশে ষোড়শ শতকের পর দুশো বছর বিরাম দিয়ে আবার এসেছিল ঊনবিংশ শতকে — '' সহসা স্তিমিত জলে আবেগ সঞ্চার ।'' এই জাগরণের ফলে কি ফসল ফলবে তা ভবিষ্যৎই জানে ।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে যে নব জাগরণের সূচনা হয় তার কালসীমা ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক । এই যুগ প্রভাব সমগ্র ষোড়শ শতক ধরেই বিস্তৃত ছিল।

বাঙালীর সমাজজীবনে এদেশের আর্য্যপূর্ব সংস্কৃতিকে বিপর্যস্ত ক'রে আর্যসংস্কৃতির প্রভাব প্রাচীন যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । এদেশে পাল ও সেনবংশের শাসনকালে প্রায় চারশো বছর ধরে (৮ম - ১২ শতাব্দী) উত্তর ভারতীয় পৌরাণিক সংস্কৃতি সমাজের উচ্চতর মহলে শেকড় গেড়ে বসেছিল । সংস্কৃত শাস্ত্র ও পুরাণাদির অনুশাসন বাঙালী সমাজ ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমর্থক সেন রাজাদের রাজত্বকালে আত্মস্থ করেছিল । বাঙালীর কাব্যে ও

সাহিত্যে সংস্কৃত পুরানাদির এই প্রভাব রাজনৈতিক অস্থিরতার আড়ালেও বিস্তার লাভ ক'রে বাঙালীর মানসিকতা পূর্ণরূপে আস্বীকৃত হয়েছিল।

পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। সে সময়ে প্রজাদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধ ছিলেন। সেনরাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মানুষেরা সমাজের নিম্নস্তরে পড়ে যায়। ব্রাহ্মণদের অত্যাচার এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে সমাজের এই সব নিম্নস্তরের মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। এইভাবে প্রাথমিক স্তরে ধর্মান্তরিত ও পাঠান সৈন্যদের নিয়ে গঠিত হয় বাঙলার মুসলমান সমাজ। পরে চেঙিগস খাঁ যখন ত্রয়োদশ শতকে এশিয়ার তুর্কী মুসলমানদের রাজ্য এবং বোখরা, সমরখন্দ প্রভৃতি ইসলাম সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করেন তখন ঐ অঞ্চলের গৃহহীন পলাতক মানুষেরা দলে দলে এসে ভারতের তুর্কী মুসলমানদের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইভাবে পরবর্তী কালে দিল্লীতে তুর্কী রাজবংশের পতনের ফলে বিতাড়িত অনেক সম্ভ্রান্ত তুর্কী এবং মোঘল রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে সম্ভ্রান্ত মুসলমান বাঙলাদেশে এসে বাস করতে শুরু করেন। বাঙলায় ইসলাম সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা এইভাবে ক্রমশ: দৃঢ় হতে থাকে এবং বিস্তার লাভ করে। এই সভ্যতা কোনদিনই হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এক হয়ে মিশে যায় নি।

মধ্যযুগের আলোক স্তম্ভ ষোড়শ শতক। জয়দেব থেকে শুরু করে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব পর্যন্ত প্রায় তিনশত বৎসর ধ'রে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের

ছদ্মনামে কামের নগ্নরূপ ও পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্য বৈষ্ণব মতের মাধ্যমে সমাজজীবনে প্রচলিত ছিল । সাহিত্য সেই সমাজ জীবনকেই প্রতিফলিত করেছে । বলা বাহুল্য , জনমানসের যথেষ্ট উন্নয়ণ না ঘটলে কামগন্ধহীন পরকীয়া প্রেমের অনুশীলন বিপজ্জনক । সাধারণ মানুষ 'নিকষিত হেমের' অর্থ বোঝে না , বুঝতে চায়ও না । সুতরাং ধর্মের নামে নারীদেহ ভোগের উৎসব শুরু হল । শ্রীচৈতন্য এর প্রতিবাদ করলেন । তাঁর আদেশে বৈষ্ণব ভক্তগনের নারীর সঙ্গে কথাবার্তা নিষিদ্ধ হয়েছিল । প্রভুর ভোজনের জন্য হরিদাস একজন বর্ষিয়সী ভক্তিমতি মহিলার কাছ থেকে কিছু উৎকৃষ্ট চাল চেয়ে এনে ছিলেন — চৈতন্যদেব বলেছিলেন —

হরিদাস কৈল প্রকৃতি সম্ভাষণ
হেরিতে না পারি মুই তাহার বদন ।

অপরপক্ষে তিনশত বৎসর ধ'রে মুসলমানের দেবমূর্তি ধ্বংসের ও বিবিধ প্রকার নির্যাতনের যে তান্ডবলীলা বাঙলার বুকের উপর দিয়ে বয়ে গেছে তার কোন প্রতিবাদ না করে নীরবে সহ্য করেছে বাঙালী । বৈষ্ণবের দাস্য ও মাধুর্য্য ভাবের প্রভাব বাঙলার সমাজে এত বেশী ছিল যে তার প্রভাবে বাঙালীর পৌরুষ ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল । বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের ২৩ অধ্যায়ে কাজীর কীর্তন বন্ধের আদেশের বিরুদ্ধে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক অসাধারণ পৌরুষ দেখিয়ে তার ভক্তগণকে সংগঠিত ক'রে কাজীর গৃহ আক্রমণের চিত্র চিত্রিত হয়েছে । সে সময়

অ-বৈষ্ণব নবদ্বীপবাসী কাপুরুষের মত ভেবেছিলেন যে বেদের আজ্ঞালঙ্ঘনকারী নিমাই পণ্ডিতের দর্পচূর্ণ হবে। কিন্তু তা হয়নি। আবার সেই কাপুরুষতা ধর্ম্মের মুখোস নিয়ে বাঙালীর চিত্তকে গ্রাস করেছে। তাই শতবর্ষ পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্য চরিতামৃত' রচনা করে চৈতন্যের সাম্যশান্ত প্রেমের সমাহিত জীবন চিত্র এঁকেছেন। যে দৃঢ় বলিষ্ঠ চরিত্র ভক্তের জীবনে নীতি ভ্রষ্টতাকে ক্ষমা করেনি, যিনি অত্যাচারী যবনকে শাস্তি দেবার জন্য সদলবলে এগিয়ে গিয়ে বলেছিলেন — 'নির্যবন করোঁ আজি সকল ভুবন' — বাঙালী সেই বলিষ্ঠ পৌরুষের অনুশীলন করেনি।

মধ্যযুগের মানুষ দৈবনির্ভর ছিলেন। পারিবারিক জীবনের নিয়ন্তা কোন অর্থনীতি নয়, ব্যক্তিগত মানসিক সম্পর্ক নয় — নিয়ন্তা কতকগুলি নীতিবাদী সিদ্ধান্ত। তাই পুরুষের জীবনে কোথাও হয়তো তার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ দেখা যায়, নারীর ক্ষেত্রে সেটি প্রায় দুর্লক্ষ্য। পুরুষের দেওয়া জীবন বৃত্তের মধ্যেই নারী জীবনের সার্থকতা ও সমাজ জীবনের শৃঙ্খলা নির্ভরশীল — এটাই লক্ষ্য করা যায় মধ্যযুগের সাহিত্যের পাতায় পাতায়। সমাজে নারীর কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল একথা বলা কঠিন।

এই সময়ে বাঙলাদেশের ইতিহাস অত্যাচার, অরাজকতা, রিক্ততা, হাহাকার ও বীভৎসতার ইতিহাস। বাঙলার শাসনভার ছিল মুসলমানের হাতে, শাসনের নামে চলছিল একটানা শোষণ। আর একটা কথাও

মনে রাখতে হবে , মুসলমান আক্রমনকারীরা তাদের সঙ্গে কৃষক নিয়ে আসেন-নি — তাদের পক্ষে চাষবাস করা সম্ভবত ছিল না । চাষ করার, ফসল তোলার ভার ছিল হিন্দু জমিদার ও হিন্দুচাষীদের উপরে । কিন্তু চাষীদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না । জমি সংক্রান্ত আইন প্রায় আগের মতই ছিল — তাই চাষীদের অত্যন্ত দু:স্থ জীবন যাপন করতে হত ।

এই সময়ের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সমালোচক শঙ্করী প্রসাদ বসুর একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য — '' একদিকে নবাবী আমলের সন্ধ্যা আসন্ন আর একদিকে কুশলী ইংরেজ বণিকের কৌশল বিস্তার''। বাৎস্যায়ন মধ্য - যুগের সতীসাধ্বী স্ত্রীর একটি চিত্র এঁকেছেন যেটি এখানে উল্লেখযোগ্য ।

সতী স্ত্রী বলতে আমরা তাকেই বুঝি যিনি স্মৃতিশাস্ত্রের অনুমোদিত গুণ সমূহের পূর্নমূর্ত্তি এবং তিনি বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি । তিনি হবেন নানা বিষয়ে পুরুষের সঙ্গী এবং মন্ত্রনাদাত্রী । প্রকৃতপক্ষে তিনি গৃহের আত্মস্বরূপ — এক কথায় পুরুষের জীবনেরই প্রতিরূপ । খাবার টেবিলের ভোজ্যসমূহের তিনিই তদারক করবেন , ধর্মীয় যজ্ঞসমূহের তিনিই হবেন সঙ্গিনী — অবশ্য প্রতিটি ব্যাপারেই তাকে পতির অনুমতি নিতে হবে । পতির অনুমতি নিয়ে তিনি বিভিন্ন ক্রীড়াতেও যোগদান করতে পারেন । অসতী রমণীদের সঙ্গে বার্তালাপ করবেন না । তিনি সমৃদ্ধিতে উদ্ধত হবেন না । কাউকে কিছু দান করতে হলেও তাকে স্বামীর অনুমতি নিতে হবে । তিনি উচ্চকণ্ঠে হাসবেন না ।

স্বামী যখন বিদেশে থাকবেন তখন তাকে তপস্বিনীর সংযত জীবন যাপন করতে হবে । এবং তাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে সময় কাটাতে হবে । উৎসব বা বিপদের মুহূর্ত ছাড়া তিনি বাইরে কারো সঙ্গে দেখা করবেন না । এই সময়ে তার অঙ্গে থাকবে ভাবগম্ভীর পরিচ্ছদ ।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়ে বাৎসায়ন অনেক কথাই বলেছেন — উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই । কিন্তু তার কামশাস্ত্রে যে কয় শ্রেণীর রমণীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে — তারা তো পুরুষের রমণের সঙ্গিনী । এই যজ্ঞপরায়না সতী স্ত্রীর চিত্র বাৎসায়ন পেলেন কোথায় বোঝা গেল না । স্মৃতিশাস্ত্রের সঙ্গে-ও তো মেলে না । স্মৃতিশাস্ত্রে তো নারীর পৃথক কোন সত্তা স্বীকৃত হয়নি — সে শুধু পতির ভোগের পাত্রী ।

॥ দশ ॥

আসলে পাঠান আমলে সামন্ততান্ত্রিক শাসনের ফলে কৃষিজীবীগণ যে অশেষ দুঃখ ভোগ করেছিলেন তার মূল কারণ তাদের দারিদ্র, মূর্খতা ও দাসত্ব, এই সবই অবশ্য অর্থনৈতিক বিন্যাসের ফল । আমাদের ধর্ম - শাস্ত্রগুলিকেও এইজন্য দায়ী করতে হয় । সবচেয়ে বড় কথা সঙ্ঘবদ্ধ অভ্যুত্থানের কথা বলা সে যুগে সম্ভব ছিল না । তবে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর

প্রবন্ধে একটি তাৎপর্য্যময় ইঙিগত করেছেন। তিনি বলেছেন — '' বিরোধে উভয় পক্ষেরই উন্নতি'', এই বিরোধ সমাজ ও অর্থনৈতিক বিন্যাসের পরি - বর্তন ঘটায়। এখানে লেখক সেই শ্রেণী সংঘাতেরই ইঙিগত করেছেন।

প্রজা বলশালী হলে তারা অকর্মন্য রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। এতে যে শুধু শাসন ব্যবস্থা ভাল হয় তা নয়, মানসিক গুনরাজিরও বিকাশ ঘটে। তুলনা স্বরূপ রোমের প্লিবিয়াণগণ ও ইংলন্ডের কমন্সগণের কথা উল্লেখ করা যায়।

বঙিকমচন্দ্র শ্রেণী সংঘাতের ইঙিগত করেছেন মাত্র — কিন্তু তখন পর্যন্ত এই তত্ত্ব প্রচারের অনুকূল সময় আসেনি সুতরাং যারা দুঃখী তারা সারাজীবন শুধু দুঃখই ভোগ করে গেছে।

বঙিকমচন্দ্র কৃষকদের যে দুরবস্থার বর্ণনা করেছেন, আধুনিক জীব-নের মানসিকতায় আমরা তার সমাধান খুঁজে পেয়েছি। এখন সে জমিদারের দিনও নেই, কৃষকদেরও সেই দুরবস্হা অনেক দূরীভূত হয়েছে। যারা কুলীন তাদের জন্য বঙিকমচন্দ্র অনেক সান্ত্বনার বানী উচ্চারণ করেছেন। ''ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী হইলে, সদ্যই অধিবেদন করিবে। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ যে, যাঁহার ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের গৌরববর্দ্ধনার্থ, সদ্যই পুনর্বার বিবাহ করুণ। স্ত্রীলোক স্বভাবত: মুখরা, দ্বিতীয়া ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী হইলে হইতে পারে,-

- তাহা হইলে আবার তৃতীয় বিবাহ করিবে, তৃতীয়াও যদি অপ্রিয়বাদিনী হয় (বাঙালীর মেয়ের মুখ ভালো নহে), তবে আবার বিবাহ করিবে — এরূপ লোকহিতৈষী নিরীহ শাস্ত্রকারদিগের অনুকম্পায় আপনারা অনন্ত গৃহিনী শ্রেণীতে পুরী শোভিতা করিতে পারিবেন। এমন বাঙালীই নাই, যাহাকে একদিন না একদিন স্ত্রীর কাছে 'মুখ ঝামটা' খাইতে না হয়। অতএব আমাদিগের ধর্মশাস্ত্রের অনন্ত মহিমার গুণে সকলেই অনন্ত সংখ্যক গৃহিনীকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।''

এই সমস্ত উক্তি অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের পরিহাসের উক্তি। কিন্তু যে বঙ্কিমচন্দ্র কুলীন পুরুষের সম্পর্কে এই বহু বিবাহের আশ্বাস বাণী শোনাতে পেরেছেন তিনিও নিগৃহীতা নারীজাতীর প্রতি কোন আশ্বাস - বাণী শোনাতে পারেন নি। তবে তাঁর এই বিদ্রুপাত্মক কটাক্ষ শিক্ষিত সমাজে কৌলীন্য প্রথার নবমূল্যায়নের চিন্তার বীজ বপন করেছিল এ কথা স্বীকার করতে হয়।

।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ও আখ্যানকাব্যের ধারায় নারীর রূপায়ণ

(ক) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : (চতুর্দশ শতক) --- বড়ু চণ্ডীদাস

বাঙালী সমাজ জীবনে আর্যসংস্কৃতির প্রভাব প্রাচীন যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদেশের পাল ও সেনবংশের শাসনকালে প্রায় চার'শো (অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক) বছর ধরে উত্তর ভারতীয় পৌরাণিক সংস্কৃতি সমাজের উচ্চতর মহলে ছিল দৃঢ়মূল। বাঙালীর কাব্যে ও সাহিত্যে ~~সমসজ~~ সংস্কৃত শাস্ত্র ও পুরাণাদির প্রভাব সেই যুগের রাজনৈতিক অস্থিরতার আড়ালেও বিস্তারলাভ করে বাঙালী মানসিকতাকে অনেকটা স্থির রাখতে পেরেছিল। সমাজের অবজ্ঞাত নিম্নস্তরের মানুষ আক্রমণকারী মুসলমানদের ত্রাণকর্তা - রূপে ভাবতে শুরু করে, এবং ইসলামধর্মে দীক্ষা নিয়ে ধর্মান্তরিত হয়। পরে চেঙিগসখাঁ যখন ত্রয়োদশ শতকে এশিয়ার তুর্কী মুসলমানদের রাজ্য এবং বোখরা, সমরখন্দ প্রভৃতি ইসলাম সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করেন তখন ঐ অঞ্চলের গৃহহীন পলাতক মানুষেরা দলে দলে ভারতে তুর্কী মুসলমান-দের রাজ্যে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইতিহাসে আছে বাঙলার মুসলমান সুলতানেরা জ্ঞানী ও গুণী মুসলমানদের অর্থ, সম্মান ও সম্পত্তি দিয়ে বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এইভাবে পরবর্তীকালে দিল্লীতে তুর্কী রাজবংশের পতনের ফলে বিতাড়িত অনেক সম্ভ্রান্ত তুর্কী এবং মোঘল রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে অনেক সম্ভ্রান্ত মোঘল বাঙলাদেশে এসে বাস করতে শুরু করেন। এই সভ্যতা কখনো হিন্দু-সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এক হয়ে মিশে যায়নি।

এই প্রসঙ্গে স্মৃতিশাস্ত্রকারদের কথা কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। এই স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিগর্হিত কতকগুলি ব্যাপার সমর্থন করেছিলেন, সে যুগে দাসী ও অবিবাহিতা নারীর সঙ্গে যৌণ সংযোগে জাত শূদ্রপুত্রের জীবন অবৈধ ছিল না। স্মৃতিকার জীমূতবাহন তার 'দায়ভাগে' শূদ্রের ঔরসে জাত বা অবিবাহিত নারীর গর্ভজাত জারজসন্তানকে সমাজে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। এর ফলে যে একশ্রেণীর মানুষের যৌণ শৈথিল্য প্রশ্রয় পেয়েছে এবিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রাচীন স্মৃতির অনুসরণে বাঙলার স্মৃতিকারগণ বিবাহ বন্ধন অত্যন্ত সুদৃঢ় বলেই বিবেচনা করেছেন, আর সেইজন্য পুরুষদের বিবাহের অধিকার সম্পর্কে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন।

হিন্দুসমাজ চারিটি বর্ণে বিভক্ত— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। অবশ্য স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে ব্রাহ্মণ বর্ণেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্মৃতির বিধানে শূদ্রের স্হান অতি নীচে ছিল। বেদপাঠে তার কোন অধিকার ছিল না। ঋতুমতী কন্যাকে বিয়ে করলে তার পতি শূদ্র বলে পরিগণিত হতেন, এমনকি তার সঙ্গে কথোপকথনও নিষিদ্ধ ছিল। এই হিন্দুশাস্ত্রের বিধিপ্রধান সমাজে নারী তার স্বাভাবিক অধিকার থেকে অংশত বিচ্যুত হয়ে বৈদিকমন্ত্রহীন জীবন যাপন করতো, তাদের উপনয়ন প্রভৃতি কোন সংস্কারও হতো না এবং কোন সংস্কারেই বৈদিক মন্ত্রপাঠ হতো না। ঐতিহাসিক স্বীকার করবেন নারীজাতির প্রতি এই অবিচারের মূলে আমাদের স্মৃতিশাস্ত্র। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে একমাত্র পতি -

সেবাই নারীর পরমধর্ম। পতির সেবা ভিন্ন নারীর কোন পৃথকসত্তা মনুতে স্বীকৃত হয়নি। কোন যাগযজ্ঞ করার বা কোন ব্রত পালন করার অধিকারও তারা পাননি। ডা: রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে অধিকাংশ বঙ্গীয় স্মৃতিকারগণ দ্বাদশ শতকের পরবর্ত্তী। বল্লালসেন প্রবর্তিত কৌলীন্য প্রথা প্রতিষ্ঠার ফলে সমাজে কুলীনগণ যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তার ফলে সেই কুলীননন্দন অপদার্থ হলেও বহু স্ত্রী বিবাহ করতে পারতেন। বহু বিবাহ এত ব্যাপক হয়ে গিয়েছিল যে স্ত্রীর ভরণ পোষণ ব্যাপারে স্বামী এক-প্রকার নিরাসক্ত ও দায়িত্ব মুক্ত জীবন যাপন করতেন।

সমকালীন সাহিত্যে এই সমাজের চিত্র কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার বিচার করা যাক। বড়ু চণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে চিত্রিত হয়েছে — দুটি নারী চরিত্র — রাধা ও বড়াই। রাধা গৃহবধূ - বড়াই তারপরিচারিকা, শ্রীকৃষ্ণ অবতার কল্প পুরুষ। তাম্বুলখণ্ডে সখীদের সঙ্গে রাধা পসরা নিয়ে যাচ্ছে। বড়াই পিছনে পড়ে অন্যপথে গিয়ে রাধাকে হারিয়ে ফেলেছে। শ্রীকৃষ্ণকে বড়াই অনুরোধ জানালো রাধাকে খুঁজে বের করতে। শ্রীকৃষ্ণ রাধার পরিচয় ও রূপের বর্ণনা জানতে চাই-লেন। কবি বড়াইর মুখে নবযৌবনবতী রাধার যে বর্ণনা দিয়েছেন সেই ভাষা প্রশংসনীয় হলেও শ্রীকৃষ্ণ তার উত্তরে যা বলেছেন তা ইন্দ্রিয়পরায়ণ অতি সাধারণ লোকের কথা।

তোর মুখে রাধিকার রূপকথা শুনি
ধরিবাক না পারোঁ পরাণী ।। বড়ায়িল ।।

* * * * *

অতিশয় বাঢ়ে মোর মদন বিকার ।

তাত কর মোর উপকার ।।

দানখণ্ডে দেখা গেল গ্রামের একটি পাষণ্ড শক্তিশালী ছেলে রাধার সমস্ত ঘৃতদধি খেয়ে বললো —

কোন বিধাতাএ মোক গড়িলেক

কতলিখি দুখ ভারে।

সুখ ভুঞ্জিতে মো কেহেঁ না পাইলোঁ

দুখে গেল সব কালে।। (পৃ - ১৫)

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নারীদেহ সম্ভোগের তীব্র বাসনার চরিতার্থ করতে রাধার অনিচ্ছা ও সতীত্ব রক্ষার চেষ্টা তৎকালীন সমাজে মূল্যহীন । তাই দেখি দানখণ্ডে ও নৌকাখণ্ডে এই সহায়হীনা বালিকা এক বলিষ্ঠ যুবকের হাতে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়েছে । এ স্বেচ্ছাকৃত আত্মদান নয় । দেহদানে বাধ্য হবার পূর্বমুহূর্তে পারাপারের সর্ত হিসেবে কাণ্ডারী যে কুৎসিৎ প্রস্তাব করেছে তাতেই রাধাকে সম্মতি প্রদান করতে হয়েছে । রাধা শুধু বলেছে —

মতি খাআঁ মোরে তোএঁ করসী ধামালী ।

বাপে মাএঁ দিবোঁ তোরে গালী ।।

অদভূত এই চরিত্র চিত্রণ। সতীত্বরক্ষার উপযুক্ত পথ যেন রাধা খুঁজে পাচ্ছে না। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিগণ নিছক সারস্বত প্রেরণার বশেই কাব্য রচনা করতেন না। ধর্মীয় সামাজিক চেতনা তাদের কাব্য রচনার মূল উৎস ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কবি রাধা চরিত্রাঙ্কনে সুস্থ রুচিবোধের পরিচয় দিতে পারেন নি। এমনকি আধুনিক রুচিতে গ্রহনীয় নয় এমন সব বর্ণনা এ কাব্যে রয়েছে।

> তড়ে হাথ যোড় করী বুঝিল চন্দ্রাবলী।
> হার বসন দেহ দেব বনমালী।।
> রাধার চরিত্র দেখি দেব দামোদর।
> নেত বসন দিল রাধার উপর।।

এই ধরণের রুচিবিকারের বর্ণনা আধুনিক রুচি সমর্থিত নয়। কিন্তু এ জাতীয় রুচিবিকারের চিত্র মধ্যযুগের সাহিত্যে সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। রাধা যেন শ্রীকৃষ্ণের খেলার পুতুল। খেলনা দিয়ে যেমন শিশুদের ভোলানো যায় তেমনি শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে ভোলাচ্ছেন —

> মাথাত গুলাল ফুলে
> তোর নহে সে লাখের মূলে।। (পৃ:- ১০৮)

অর্থাৎ তোমার মাথার ফুল কি সুন্দর — লাখ টাকা দিলেও এ ফুল মেলে না।

রাধার আত্ম সচেতনার প্রকাশ এ কাব্যে রয়েছে বটে, কিন্তু পুরুষ-শাসিত সমাজে এর কতটুকু মূল্য ?

অবশ্য বংশীখণ্ডে আমরা অন্য রাধার চিত্র পাই। এখানে কাম পরিণত হয়েছে প্রেমে, ধরার ধূলিতে নির্মিত হয়েছে স্বর্গের অমরাবতী। প্রেমদীক্ষিতা রাধার চিত্র এইরূপ —

কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইল রান্ধন।।
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী।।

কুম্ভকারের জলন্ত উনুনের মতই আমার হৃদয় কৃষ্ণবিরহের তাপে জ্বলছে। রাধা চরিত্রের ক্রমবিকাশের রহস্য কবির এক অপরূপ সৃষ্টি। বংশীখণ্ডের এই হাহাকারের পূর্বানুবৃত্তি বিরহ অংশে আছে। বস্তুত বেদনায় এই কাব্য শেষ হয়েছে। সমালোচকের অভিমত এই, বড়ু-চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার যাত্রা যেখানে শেষ হয়েছে, পদাবলীর রাধার যাত্রা শুরু সেখান থেকেই।

বিরহ অংশে প্রেমের জগতে জাগ্রত রাধার চিত্র। এ তার নতুন জন্ম — তার উপলব্দির পরিচয়।

দারুনী বড়ায়ি গো —

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ অসার ।

ছিণ্ডিয়া পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার ।।

মুছিআঁ পেলাইবোঁ মো সিসের সিন্দুর ।

বাহুর বলয় মোর করিব শঙখচুর ।।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বিহনে আমার ধন যৌবন সকলই ব্যর্থ , সেই সঙেগ এই জীবন ও ব্যর্থ । তাই সাজসজ্জার সকল উপকরণই আমি ত্যাগ করবো। আমার গজমুকুতার হার আমি ছিঁড়ে ফেলবো । মাথার সিন্দুর মুছে ফেলবো , বাহুর বলয় ভেঙেগ শাঁখের গুড়ার মত চূর্ণ করবো (শঙখচুর)।

এই বেদনা বিলাপ অনেকাংশে বৈষ্ণব পদাবলীর সমগোত্রীয় । এই সুর যেন ব্যক্তিকে অতিক্রম ক'রে সর্বকালের ও সর্বদেশের বিরহ বেদনার সুরের সঙেগ মিলিত হয়েছে ।

কিন্তু এতো রাধার পরবর্তী জীবনের উপলব্দির কথা । কবি এখানে যে রাধার কথা বলছেন তার তো প্রেমের জগতে নতুন জন্ম । বড়ু চন্ডীদাস একথা বারবার তার কাব্যে স্বীকার করেছেন রাধার দেহ-লিপ্সাই শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব গ্রহণের কারণ । বংশীখন্ডের অনুরাগিনী রাধার সঙেগ তাম্বুলখন্ডের উদধত বালিকার সঙেগ কোন মিলই নেই । এই উদধতা বালিকাই যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছেন তখনই

একাধিক বার কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়েছে তিনি স্বয়ং ভগবান। এবং রাধার রতি তৃষ্ণাতেই তার অবতারত্ব গ্রহণ। শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলেছেন — 'অবতার কৈলো' যোঁ তোর রতি আশেঁ'। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন——

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

সেই কৃষ্ণ এখানে কবুল করছেন — তিনি এগার বছরের একটি অনিচ্ছুক নাবালিকা কন্যাকে ধর্ষণ করবার জন্য (এগার বরিষে') অতি কষ্ট ক'রে পৃথিবীতে অবতার হয়ে এসেছেন —''এ শৃঙগার রস" বা "শৃঙগার রসাভাস" নয়। বরং বলা চলে তৎকালীন সমাজে যে'মাৎস্য ন্যায়' চলছিল তাতে পুরুষ তার ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করার আকাঙ্খাকে দৈব-দত্ত অধিকারের মতই সমাজের কাছ থেকেও পেয়েছিল। তার কাছে নারী হলেই হল — সে তো শুধু ভোগ্য দ্রব্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

মূলকথা এই যে, মধ্যযুগীয় সাহিত্যে যতটা দেব-দেবী মাহাত্ম্য প্রচারের দিকে কবির মন নিবিষ্ট ছিল ততটা সমাজজীবনের প্রতিফলনের দিকে ছিল না। এই একমুখী জীবন চেতনার মধ্যে তাই নরনারীর সম্পর্কটা তেমনসুন্দর ও স্বাভাবিকভাবে চিত্রিত হতে পারেনি। এসব সাহিত্যে যত নর নারীর চিত্র চিত্রিত হয়েছে সবাই একটা বিশেষ আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। পুরুষের আনন্দ বিধান ও সেবা যে নারী জাতির আদর্শ, সেই নারীর যথার্থ মূল্যায়ন সেই সাহিত্যে প্রত্যাশা করা যায় না।

বঙ্গীয় স্মৃতিশাস্ত্রেও পত্নীর কোন পৃথক সত্তা নেই। উত্তরাধিকার সূত্রে পতির সম্পত্তিতে পত্নীর অধিকার কেবল ভোগের। মনু বলেছেন — 'জ্যেষ্ঠতা নাস্তি হি স্ত্রিয়ঃ' — জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতৃধনের অধিকারী হয় — কিন্তু স্ত্রীজাতির কোন জ্যেষ্ঠত্ব নেই। আগে জন্মালেও নেই। একেই বলে খোদার উপর খোদকারি। স্ত্রীজাতির প্রতি মনুর কোন সহানুভূতিয়ে ছিল না নিম্নোদ্ধৃত অংশে তা প্রমাণিত হয়।

''প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ সন্তানার্থঞ্চ মানবাঃ।(নবম সর্গ) শ্লোক নং ৯৬.

অর্থাৎ 'বিধাতা গর্ভ গ্রহণের জন্য সৃষ্টি করেছেন নারীকে - আর গর্ভাধানের জন্যই সৃষ্টি করেছেন পুরুষকে।' নারী জাতির সৃষ্টিই হয়েছে শুধু গর্ভধারণের জন্য। এই বিধান মধ্যযুগের নারীকে মুখ বুজে মেনে চলতে হয়েছিল।

স্ত্রী ধর্ম সম্পর্কে মনু আরও বলেছেন —

ক্ষেত্রভূতা স্মৃতা নারী বীজভূতঃ স্মৃতঃ পুমান্।
ক্ষেত্রবীজসমাযোগাৎ সম্ভবঃ সর্ব্বদেহিনাম্।। (৯.৩৩)

অত্রগাথা বায়ুগীতাঃ কীর্ত্তয়ন্তি পুরাবিদঃ।
যথা বীজং ন বপ্তব্যং পুংসা পরপরিগ্রহে।। (৯.৪২)

নারীজাতি ক্ষেত্র স্বরূপ এবং পুরুষ বীজ স্বরূপ, ক্ষেত্র ও বীজের সংযোগেই

সমস্ত প্রাণীর উদ্ভব হয়ে থাকে । এ বিষয়ে পুরাবিৎ পণ্ডিতেরা বায়ু রচিত একগাথা কীর্তন করেন তার মর্ম এই, পুরুষ কখনও পরস্ত্রীতে বীজ বপন করবেন না । কিন্তু বায়ু নিশ্চয়ই প্রাচীন যুগের কোন বিদগ্ধ গ্রন্থকার । এ সম্পর্কে টীকাকার নীরব । গাথা বহুবচনে আছে । সুতরাং সম্ভবত: গাথাও সংখ্যায় একাধিক ।

চণ্ডালশ্চ বরাহশ্চ কুক্কুট: শ্বা তথৈব চ ।
রজস্বলা চ ষণ্ডশ্চ নেক্ষেরন্নশ্নতো দ্বিজান্ ।।(৩.২৩৯)

এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ব্রাহ্মণগণ ভোজন করছেন এমন সময় চণ্ডাল, শ্বা, শূকর, কুক্কুট, ঋতুমতী নারী এবং ক্লীব তাদের দেখতে না পায় । লক্ষ্য করতে হবে মনু ঋতুমতী নারীকে ক্লীব এবং চণ্ডালের সম - পর্য্যায় ভুক্ত করেছেন । নারীদের পক্ষে তা নিশ্চয়ই গৌরবের কথা নয়। আমরা কিন্তু চণ্ডাল, শূকর ও মোরগ প্রভৃতির সঙ্গে নারীকে (সে নারী ঋতুমতী হলেও) এক পঙক্তিতে দেখতে প্রস্তুত নই । দ্বিতীয় অধ্যায়ে মনু বলেছেন নারীর সংস্কার অমন্ত্রক , বেদের মন্ত্র সেখানে পাঠ করা নিষিদ্ধ। অথচ এই মনুরই সিদ্ধান্ত — 'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা:'। (৩.৫৫) এই নারী পূজা আর পূর্ব উদ্ধৃতিতে নারী সম্পর্কে বক্তব্য এতই বিপরীত যে অবাক হতে হয় ।

স্মৃতিকার যাজ্ঞবল্ক্য অবশ্য ঋতুমতী নারীর পরিবর্তে নারীর একটি কঠিন এবং অপ্রচলিত অভিধার সৃষ্টি করেছেন — অভিধাটি হলো

'পুংশ্চলী'। পুংশ্চলী হচ্ছে সেই নারী, পুরুষ দেখলেই যার চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। মনুর অনুরূপ শ্লোকটি এই —

পুংশ্চলী বানরখরৈর্দৃষ্টশ্চোষ্ট্রাদি বায়সৈঃ।
প্রাণায়ামং জলে কৃত্বা ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি।।

(যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি - ২৭৭)

পুরুষের দর্শনমাত্র যে নারী আসঙ্গকামা, বানর, গর্দভ, উষ্ট্র এবং ~~মনে~~ কাক যাতে ভোজনকালে না দেখতে পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে, যদি দেখে ফেলে তবে দুষ্ট পুরুষকে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। প্রায়শ্চিত্তের বিধান প্রথমত জলে প্রাণায়াম, তারপর ঘৃত সেবন। (প্রাণায়াম —শ্বাসগ্রহণ এবং শ্বাসত্যাগ — এই প্রক্রিয়ার শাস্ত্রীয় নাম। ইহা যোগসাধনার অঙ্গ - বিশেষ)।

যাজ্ঞবল্ক্যও পুংশ্চলী নারীকে বানর, গর্দভ, উট, কাকের সমপর্যায়ভুক্ত করেছেন। তিনি 'আদি' বলেই ছেড়ে দিয়েছেন। তালিকায় হয়তো শৃগাল প্রভৃতি অন্য প্রাণীও ছিল, নারীর প্রতি ইনিও শ্রদ্ধাবান নন। যাজ্ঞবল্ক্যের আরও কয়েকটি বিধান পরীক্ষা করা যেতে পারে।

সকামাস্বনুলোমাসু ন দোষস্ত্বন্যথা দমঃ
দূষণে তু করচ্ছেদঃ উত্তমায়াং বধস্তথা।

(যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা - ২৮৮)

অর্থাৎ যদি কামনাহীন কন্যাকে শক্তি প্রয়োগে ধর্ষণ করা হয় তবে

এই দূষণের অপরাধে অপরাধীর করচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য । কিন্তু কন্যা যদি অনুরাগবর্ত্তী হয়ে থাকে তবে এই ধর্ষণের অপরাধে কোন দণ্ড দেওয়া হবে না ।

২. পতিতানামেষ এব বিধিঃ স্ত্রীনাং প্রকীর্ত্তিতঃ ।
বাসো গৃহান্তিকে দেয়মন্নং বাসঃ সংরক্ষণম্ ।।
(যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা - ২৯৬)

নারীজাতির প্রতি অপরিসীম করুণা যাজ্ঞবল্ক্যেরও ছিল । পতিত নারীদের প্রায়শ্চিত্ত বিধানের পর তিনি বলছেন এই পতিত নারীদের গৃহ-সমীপে বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে , মাত্র প্রাণ ধারণের জন্য হীন অন্ন পরিবেশন করতে হবে , বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে হবে ততটুকুই যাতে লজ্জা নিবারণ হয় । এই বস্ত্র যেন মলিন হয় ।

৩. পতিলোকং ন সা যাতি ব্রাহ্মণী যা সুরাং পিবেৎ ।
ইহৈব সা শুনী গৃধ্রী শূকরী চোপ জায়তি ।।
(যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা - ২৫৬)

ব্রাহ্মণের সুরাপান নিষিদ্ধ । কিন্তু ব্রাহ্মণের স্ত্রী যদি সুরা - পান করেন তার শাস্তি বিধান এই শ্লোকেই করা হয়েছে । তিনি পতিলোকে যেতে পারবেন না । কেবলমাত্র তাই নয় , তিনি এই জগতে কুক্কুরী, শকুনী অথবা শূকরী হয়ে জন্ম গ্রহণ করবেন । অবশ্য এই শ্লোকে ব্রাহ্মণ বলতে আমরা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতিকেও বুঝবো । এদের স্ত্রীদের পক্ষেও সুরাপান নিষিদ্ধ ।

কুতার্কিক তর্ক তুলতে পারেন — এই সুরাপানের ব্যবস্থা যদি ঔষধ হিসাবে করা হয় তাহলে কী দণ্ডের ব্যবস্থা হবে তা অবশ্য যাজ্ঞবল্ক্য করেন নি। আমরা সংস্কৃত ব্যাকরণকে বলে থাকি ''ত্রিমুনি ব্যাকরণম'' অর্থাৎ পানিনি ব্যাকরণের তিনমুনি — পানিনি স্বয়ং, ভাষ্যকার পতঞ্জলি এবং বৃত্তিকার কাত্যায়ন। অনুরূপভাবে আমরা কি একথা বলতে পারি না যে 'ত্রিমুনি স্মৃতিশাস্ত্রম' — মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর? প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি স্মৃতিশাস্ত্রই বাঙালী সমাজকে ধারণ করে আছে। তিনটি স্মৃতি-শাস্ত্রেরই একসুর। ব্রাহ্মণভক্তি, স্ত্রীজাতি বিদ্বেষ এবং শূদ্র নিন্দা। এদের টীকাকারেরা মূলকে অতিক্রম করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে পরাশরের টীকাকার মাধবাচার্যের কথা। তিনি বলেছেন — ''একস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি, নৈকস্যা বহবঃ সহ পতয়ঃ'' — অর্থাৎ একজন পুরুষের অনেক স্ত্রী থাকতে পারে, কিন্তু একজন স্ত্রীর একাধিক পতি থাকবে না। মাধাবাচার্য্য বলেছেন — বেদে নাকি এরকম উক্তি আছে ''বেদেহপ্যেবং শ্রূয়তে''। বেদে আছে কিনা জানি না। কিন্তু বেদে আছে এইরূপ উক্তি সমস্ত প্রতিবাদের ঝটিকা নিবারণের অস্ত্র স্বরূপ মাত্র। পরাশরের কয়েকটি উক্তি আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

নরনারীর প্রণয়কে উপলক্ষ্য করে মধ্যযুগে যে আখ্যায়িকাকাব্য গড়ে উঠেছিল ''সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী'' এই ধারারই শ্রেষ্ঠকাব্য। এ কাব্যে চরিত্রাঙ্কণ করা হয়েছে প্রথাসিদ্ধ উপায়ে। দৌলতকাজী ছিলেন মধ্যযুগের কবি। এ যুগের কাব্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন রাজা-বাদশারা। একটা কথা আমাদের গোড়াতেই মনে রাখতে হবে যে

একাব্যে সাধারণ মানুষের চরিত্র অনুপস্থিত। কারণ কাব্যটি রোমান্স - কাব্য সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে। দৈবনির্ভর সেই ব্যবস্থায় মানুষরা সাধারণত: ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে অভ্যস্ত ছিল। আর এই অনুশাসন দিয়েই নারীর জীবনবৃত্ত রচিত হয়েছিল মধ্যযুগের সাহিত্যে। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ময়নাবতীর মত নারীর দীর্ঘশ্বাসে মধ্যযুগের আকাশ বাতাস ব্যথা বেদনায় ম্লান হয়ে আছে। প্রিয়বাদী পতিব্রতা ময়নাবতীর প্রেমের চিত্রই রয়েছে।

সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী কাব্যখানি দৌলতকাজীর রচনা। আরা - কান রাজসভার সভাকবি ছিলেন কবি। এই গ্রন্থ রচনার পৃষ্ঠপোষকতা করেন ঐ রাজার সমর সচীব আশরফ খাঁ। কাজেই এই কাব্যে আমরা এক সম্পূর্ণ ভিন্ন রুচির সাথে পরিচিত হই। লোর তার নিজপত্নী ময়নাকে পরিত্যাগ করে বিবাহ করে চন্দ্রানী সুন্দরীকে। চন্দ্রানী ছিল বামন নপুংসকের স্ত্রী। লোর তাকে হত্যা করে চন্দ্রানীকে বিবাহ করে।

অত:পর কাব্যখানি একদিকে ময়নার একানুরক্তি, সেই অনুরাগের কেন্দ্রমণি তার স্বামী লোরের বিরহ যন্ত্রনা কাতরতা আর একদিকে অতৃপ্ত যৌবনা চন্দ্রানীর যৌন তৃপ্তি জনিত সুখের সাথে হিন্দু আদর্শ নারীর দ্বিচারিনীত্বের দ্বন্দ্ব অপূর্বভাবে চিত্রিত হয়েছে।

এই কাব্যের নায়িকা সতীময়না চরিত্র মহিমায় উজ্জ্বল। কিন্তু তার

স্বামী লোরচন্দ্রানীর রূপের বৈভবে মুগ্ধ হয়ে তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছেন। মনে হয় স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান কবি ও শিল্পীকেও প্রভাবান্বিত করেছিল। সংস্কৃতে বলে 'মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি' —। সংস্কৃত সাহিত্যের যুগে কালিদাসের শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের কাহিনী, পুরুরবা ও উর্বশীর কাহিনী তার প্রমান বহন করে। বড়ু চন্ডীদাও বলেন রাধাকৃষ্ণের দেহ সম্ভোগের কথা, দৌলতকাজী বলেছিলেন লোরচন্দ্রানীর বিকৃতরুচির কথা, ভারতচন্দ্র বলেন বিদ্যা ও সুন্দরের গুপ্তপ্রণয়ের কথা — সব কিছুতেই যৌন সম্ভোগেরই প্রাধান্য। এখানে সতীনারী পরিত্যাক্তা চন্দ্রানী তার খর্বকায় বামন স্বামীর অক্ষমতায় অতৃপ্ত, তাই সে লোরের প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করেনি।—

''সভায় দেখিলুঁ এক যুবক সুন্দর।
রূপে পঞ্চশর কিবা হর বিদ্যাধর।।
সে অবধি মোর প্রাণ নাহি মোর অঙ্গে।
মোর মন জ্ঞান গেল সে পুরুষ সঙ্গে।।
সেইরূপ স্মরি মোর সন্তাপিত মন।
নিশ্চয় কহিনু ধাই মর্মের বেদন।।

— এখানেও নায়ক লোর ভোগ্যপন্য দ্রব্যের মত একনারীকে ত্যাগ করে তার পছন্দমত অন্য একনারীকে নিজের ভোগের জন্য নিয়ে গিয়ে অনায়াসে দিনযাপন করেছেন। অসহায়া স্বামী পরিত্যাক্তা নারীর করুণ আর্তনাদে সমস্ত কাব্যখানি ভরে গেছে। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ জাতির নিষ্ঠুর ব্যবহারের কোন প্রতিবাদ সতীনারী করতে পারেনি।

নিজের পতি প্রমোদ ভ্রমণে রত, তার সাধ্বী স্ত্রী আকুল ক্রন্দনে রত। এই ধরণের ঘটনা যে সমাজে সম্ভব তা নিতান্তই স্মৃতি শাস্ত্রের অনুশাসনে শাসিত ও প্রথাসিদ্ধ।

প্রাণের বল্লভ মনের মনোভব
পতি সে কামসিন্দূর।
অঙ্গের চন্দন নয়ন অঞ্জন
কণ্ঠ মণিহার মোর।।
কোথাতে যাইমু কাহাকে কহিমু
কে মোর জানিব বেদন।
* * * *
কৈ গেল শশিকলা কোথা সুমণ্ডল।
ধিক দেয় বৈরী মোরে।
মর্মে পাইলুম ঘাও মুখেতে না আইসে রাও
প্রেমানলে তনু পোড়ে।। (পৃ:- ৫৭)

আগে বলেছি, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের বংশীখণ্ডে ও বিরহ অংশে আমরা অন্য রাধার চিত্র পাই। কিন্তু সেখানে রাধার মানবী চরিত্র অঙ্কিত হয়নি -- এ রাধা কবির কল্পিতা, প্রেমদীক্ষিতা অন্য এক নারী -- সুতরাং তা আমাদের বিচার্য্য নয়।

(খ) মনসামঙ্গল : (পঞ্চদশ শতক) --- বিজয়গুপ্ত (১৪৯৪)

বিজয়গুপ্ত রচিত মনসামঙ্গলের নাম 'পদ্মাপুরাণ'-- এঁর আবির্ভাব কাল পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে, তাঁর কাব্য খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। কবি বরিশাল জেলার (অধুনা বাংলা দেশের অন্তবর্তী) 'ফুল্লশ্রী' নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, বিজয়গুপ্ত হুসেনশাহের সমকালীন কবি।

মধ্যযুগীয় সমাজে নারীদের কোন মর্যাদাই ছিল না, সেই মর্যাদা-হীন রূপ বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে বেশ চমৎকার ফুটে উঠেছে। মনসার স্বামী জরৎকারু বিয়ের রাত্রিতেই তিল তুলসী কুশ সংগ্রহ করে দিতে বলায় মনসা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন, মনসার মানসিক চাহিদার কোন মূল্য না দিয়ে মুনি তাকে নির্মম ভাষায় তিরস্কার করেছিলেন --

ব্রাহ্মণের নারী হইয়া নাহি ধর্মজ্ঞান
ভাণ্ডার বিনা তুই কিসে অপমান ? (পৃ:- ৮৫)

স্বামীত্বের অধিকারেই অবশ্য এই অপমান সূচক তিরস্কার। জরৎকারুর দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে মনসা তাকে অচৈতন্য করে দিয়েছিলেন। কিন্তু পিতা শিবের অনুরোধে চৈতন্য ফিরিয়ে দিলে যখন জরৎকারু মনসাকে ত্যাগ করে যাওয়ার উপক্রম করলেন তখন মনসার উক্তি :-

মুনির চরণে ধরি' করিল প্রণতি
অপরাধ ক্ষমা কর রাখ রাঙা পায়ে
স্ত্রীলোকের অপরাধ ক্ষমিতে উচিত হবে। (পৃ:-৯১)

মনসার এই পরিবর্তন ও আত্মসমর্থনের ব্যাকুলতাই প্রমাণ করে — সামাজিক বিধান যতই পক্ষপাতদুষ্ট হোক তার প্রতিবাদ করা অরণ্যে রোদন-মাত্র। শংকার অত্যন্ত অশালীন আচরণ করা সত্ত্বেও মনসা তার পায়ে ধরে' ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছেন এই কারণেই।

চাঁদ সদাগর শিবের উপাসক, রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে ছয় পুত্রকে নিয়ে তিনি দেশে ফিরছেন — ডিঙ্গা বরণ ক'রে নেবার জন্য স্ত্রী সনকাকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু সনকা মনসার পূজায় বসেছেন সংবাদ পেয়ে তিনি দ্রুতগতিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে পূজারতা সনকার সামনে পূজার মঙ্গল ঘট ও সরা পদাঘাতে ভাঙ্গলেন। সনকার আরাধ্যা দেবী মনসা — দেবদেবীর আরাধনায় প্রত্যেকেরই স্বাধিকার অক্ষুন্ন রাখার প্রয়োজনীয়তা চাঁদ উপলব্ধি করলেন না। সনকা তখন —

ভাঙ্গাঘট মরা সোনাই নেতে জড়াইয়া।
কান্দে সোনেকা রাণী বিপদ ভাবিয়া।।
ভাঙ্গিলা মনসার ঘট করি' অবহেলা।
ছয় পুত্র নিতে মোর দিয়া একছলা।। (পৃ:-১৪৯)

সনকা কাঁদছে আর মনে মনে ভাবছে যে মনসা এবার তার ছয়

পুত্রকে কোল থেকে ছিনিয়ে নেবে। চাঁদ সদাগরের ব্যবহারে সে শুধুমাত্র কাঁদছে -- তার কণ্ঠে কোন প্রতিবাদের সুর নেই, অন্যদিকে দেবী মনসা তার পুত্রদের প্রাণহরণ করবেন ভেবে আকুল হয়ে হা-হুতাশ করছে। সোনেকার অস্থিরতা, অসহায়তা এবং দৈবনির্ভরশীলতা এতে প্রকাশিত, শুধুমাত্র ঘট ভেঙেই চাঁদ তৃপ্ত হলেন না -- উপরন্তু --

'সোনেকারে চান্দ তবে করিল অপমান।'

এই অপমানের ভাষা কবি বলেন নি -- কিন্তু আমরা অনুমান করে নিতে পারি, পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীর প্রতি পুরুষের এই জাতীয় যুক্তি-হীন ব্যবহার মধ্যযুগের সাহিত্যের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে।

মহেশ্বর অকারণেই বাণের কুমারী কন্যা ঊষাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। দেবী পদ্মাবতীর বিষদৃষ্টির ফলে একবার ঊষার নৃত্যে তালভঙ্গ হয়েছিল--

অনিরুদ্ধ মোর পতি বাণ দেবের নাতি
কামদেব আমার শ্বশুর
বুঝিয়া গৌরব তার না রাখিলা একবার
তুমি শিব নিদয় নিঠুর।

শিবপুরীতে তার থাকার ইচ্ছে পূর্ণ হল না। কাব্যটির 'অনিরুদ্ধ, ঊষাহরণ ও যমযুদ্ধ' অংশে দূতের মুখে ঊষার করুণ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

আরও একটি কথা — সোনেকা ছয় পুত্রের জননী — সমাজে প্রতিষ্ঠিত চাঁদসদাগরের স্ত্রী। চাঁদসদাগরের ব্যক্তিত্বও বিরাট, এমন এক ব্যক্তির পরিচিতা স্ত্রী হয়েও তার মনে স্বামীর বিদেশযাত্রার পূর্বে স্বামীর কাছ থেকে 'গর্ভপত্র' লিখে নেবার প্রয়োজন অনুভূত হল। স্বামী প্রবাসে থাকলে নারীর চরিত্র নিয়ে মানুষের কথা বলার যে অধিকার তার কথা ভেবেই সোনেকা গর্ভপত্র দাবী করেছিল। আর তার এই দাবীতেই বোঝা যায় সমাজে নারীর আসন কোথায় ছিল। ছয় পুত্রের সাধ্বী জননীরও যে সমাজে কোন মর্যাদাই ছিল না তা ভাবতেই বিস্ময় জাগে। সমস্ত সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার দায় অবলা নারীর স্কন্ধে চাপিয়েই কবিগণ তাদের কাব্য - দেহে ভাষার যাদুদণ্ড বুলিয়ে গেছেন — তা অবশ্যই সামাজিক ও শাস্ত্রীয় প্রভাবের ফলে।

কাব্যকাহিনীর পরিণতি বিশ্লেষণে দেখা যায়, দৈবের হাতে শেষ পর্যন্ত মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পরাজয় ঘটেছে। মনে হয়, তখনকার দিনে সাধারণ মানুষ এতেই প্রীতিলাভ করতো।

সোনেকার গর্ভে লখিন্দরের জন্ম হলো। 'বিহার রাত্রে' দেবী লখিন্দরের প্রাণ হরণ করাবেন — বলা সত্ত্বেও সোনেকা নিয়তি তাড়িতা নারী হিসেবেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি বললেন —

পাইছি বরের লখাই না করার বিয়া।
বিবাহের দিনে নাগে দংশিবে লখাই।।

এহি কথা কহিয়াছে জগৎ গৌরী আই ।

কিন্তু সদাগরের আশ্বাসবাণীতে আস্হা স্হাপন ক'রে সোনেকা আত্ম-সমর্পন করলেন । এ ছাড়া অন্য উপায়ই নেই ।

লোহার বাসরে সর্পদংশনে লখিন্দরের মৃত্যু হলো । শুভদৃষ্টির সঙেগ সঙেগ বেহুলার জীবনে এই অশুভ যোগের সূচনা । বেহুলার দু:খলাঘবের জন্য সান্ত্বনা দেবার মত দরদী মন তখনকার সমাজে ছিল না ।

এর পরবর্তী দৃশ্য অত্যন্ত করুণ । বেহুলা মৃত স্বামীর দেহ ভেলায় নিয়ে ভেসে চলেছে উদ্দেশ্য সাধনের পথে । কিন্তু একাকিনী বেহুলা সাগর বক্ষে দিনরাত্রি কাটানোয় তার সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠলো । রামা-য়ণের সীতা অগ্নি পরীক্ষা দিয়েছিলেন -- বেহুলা এখানে ইতিহাসের পাতায় নতুন উদাহরণ সৃষ্টি করলো -- সে পরীক্ষায় সম্মত হলো না ।

মর্ত্যের শোক দু:খের জীবন্ত মূর্তি বেহুলা সতী , উজানি নগরের উৎসব মুখরিত হাজার আলোকে উদভাসিত বিবাহ সভায় বধূ বেশিনী সুন্দরী বেহুলার সঙেগ আমাদের যে পরিচয় হয়েছিল ছায়ামন্ডপের তলে বরকনের শুভদৃষ্টির সঙেগ সঙেগই তার জীবনে অশুভের সূচনা । কিন্তু স্বল্প কালের জন্য হলেও বেহুলার সঙেগ এ পরিচয় আমাদের স্মৃতিতে অক্ষয় । সতীত্বের দুর্লভবর্মে সে সুরক্ষিতা -- রামায়ণে রামচন্দ্রের কথায় সীতা অগ্নি পরীক্ষা দিয়েছিলেন , সীতা অগ্নিকুন্ডে প্রবেশ করলেন স্বয়ং অগ্নিদেব

সীতাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন — বললেন সীতা নিষ্পাপ । তুমি একে গ্রহণ করো । কিন্তু অযোধ্যায় ফিরে এসে প্রজাদের নিন্দায় আবার সীতার পরীক্ষার প্রস্তাব করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র — এবার সতীত্বের সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন স্বয়ং বাল্মীকি মুনি । তবুও পরীক্ষা চাই । এইজন্য রাম - চন্দ্রকে আমরা ক্ষমা করি না । রামায়ণ আমাদের কাছে মহাকাব্য — না পড়েও এই মহাকাব্যের কাহিনী সবারই জানা ।

বিজয়িনী বেহুলা সর্বতোভাবে এক মহাকাব্যের চরিত্র। বেহুলার সমাজ বেহুলাকে ক্ষমা করেনি । কিন্তু পুরুষ শাসিত সে সমাজ আর নেই, সাধ্বী বেহুলা শোক সিন্ধু অতিক্রম করে' সদ্যঃজীবিত ছয় ভাসুর ও স্বামীকে নিয়ে গৌরবোজ্জ্বল মূর্তিতে আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে — সমাজে স্ত্রী পুরুষের আপেক্ষিক প্রাধান্য আমরা স্বীকার করি না । কবি বিজয় - গুপ্ত একটু দ্বিধান্বিত ছিলেন হয়তো — তার দ্বিধা থাক — আমরা একটু এগিয়ে গিয়ে এই বরণীয় দেবীকে অভ্যর্থনা ক'রে নিলাম — সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলে 'প্রত্যুদগমন '।

মধ্যযুগের সাহিত্যে চিত্রিত নারী চরিত্রগুলির মধ্যে বেহুলা চরিত্র অবশ্যই পুরুষ কবির দ্বারা চিত্রিত এক 'মূর্ত প্রতিবাদ '।

(গ) রামায়ণ — অনুবাদকাব্য, কৃত্তিবাস (পঞ্চদশ শতক)।

বাঙালী সমাজ জীবনে এদেশের আর্যপূর্ব সংস্কৃতিকে বিপর্যস্ত ক'রে আর্য সংস্কৃতির প্রচার ও প্রভাব প্রাচীন যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদেশের পাল ও সেন বংশের শাসনকালে প্রায় চারশো বছর (অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক) কাল উত্তর পৌরাণিক সংস্কৃতি সমাজের উচ্চতর মহলে শেকড় গেড়ে বসেছিল। সংস্কৃত শাস্ত্র পুরাণাদির অনুশাসন বাঙালী সমাজ ব্রাহ্মণ্য - ধর্মের সমর্থক সেন রাজাদের রাজত্বকালে আত্মস্থ করেছিল। বাঙালীর কাব্যে, সাহিত্যে সংস্কৃত পুরাণাদির এই প্রভাবে রাজনৈতিক অস্থিরতার আড়ালেও বিস্তার লাভ করে বাঙালী মানসিকতার পূর্ণ আর্যীকরণ সম্ভব করেছিল। সংস্কৃত রামায়ণের জীবন রসায়ন ~~বনস্পলী~~ বাঙালী মানস সরোবরে বয়ে আনার আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক ভাবেই কবি মনে প্রেরণা যোগায়।

অতি অল্পকালের জন্যই গণেশ (১৪১৪ - ১৪১৮) বাঙলার সুলতানী মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, মহাকবি কৃত্তিবাস রাজা গণেশের রাজসভায় গিয়েছিলেন এবং তাঁর নির্দেশেই রামায়ণ রচনা করেছিলেন। কৃত্তিবাস তাঁর আত্মপরিচয়ে বলেছেন, তিনি এক গৌড়ে - শ্বরের সভায় গিয়েছিলেন — কিন্তু তিনি কোন গৌড়েশ্বরের নাম উল্লেখ করেন নি। এই গৌড়েশ্বর রাজা গণেশ কিনা তাই নিয়ে বিতর্ক আছে।

যতদূর জানা যায় কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণের মূলভাবকে অবলম্বন করেই নিজস্ব মৌলিকতা দিয়ে অনেক উপকাহিনীর সংযোজন করে তার শ্রীরাম পাঁচালী রচনা করেছেন। মধ্যযুগীয় মানসিকতা ধরা পড়েছে এক - মাত্র সীতা চরিত্রে — সে আলোচনা আমরা আগেই করেছি। এখানে বিপ্রদাসের মনসা মঙ্গল থেকেই একটি কৌতুক জনক ঘটনার উল্লেখ করছি —

প্রভাতে গেলেন সতী   সন্ধ্যা হৈল রূপবতী
আজি তোর মতি হৈল ভিন্ন
শুনিয়া চম্পলা লোকে   কি বলিবে তোকে মোকে
বালা হৈল স্ত্রীর অধীন।   (পৃ:- ৩৪৫)

দেবলোকে লখাই শুনে এসেছেন, তার স্ত্রী ছয়মাস কাল মৃতদেহ নিয়ে ভেসে ~~এসেছেন~~ ভেসে এসেছেন — সমস্ত বিপদ অতিক্রম ক'রে। এ সত্ত্বেও একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একা ছিল বলে এই অশোভন কটূক্তি। দীর্ঘ ছয় মাসের একা মৃতপতির দেহ নিয়ে যাত্রাকালের কথা জানা সত্ত্বেও লখাইয়ের এই কটূক্তি মধ্যযুগীয় মানসিকতারই প্রতিধ্বনিমাত্র।

রামায়ণে পরিবেশ ভিন্ন। এখানে কবি প্রাচীন পৌরাণিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন। সীতার কথা বলেছি, সমাজে নিগৃহীতা হলেও সীতা লবকুশের জননীরূপে সতীত্বের আদর্শরূপে চিরকাল বন্দনীয়া হয়ে থাকবেন। রাবণের অন্ত:পুরে রাবণ জননী নিকষা, স্ত্রী মন্দোদরী এবং বিভীষণ পত্নী সরমা উল্লেখযোগ্য। মাতৃরূপে, স্ত্রীরূপে এবং পুত্র -

বধূরূপে নারীর পৌরাণিক আদর্শেরই রূপ দিয়েছেন। রাবণের মৃত্যুর পর মন্দোদরী বিলাপ করছেন —

কি কাজ করিল তব শঙ্কর শঙ্করী
রামলক্ষ্মণ সংহারিল স্বর্ণলঙ্কাপুরী। (পৃঃ- ৪৭৫)

কিন্তু তিনি কখনো পতির নিন্দা করেন নি। অনার্য রাবণের গৃহেও আর্যজনোচিত এই আদর্শ কবির চিত্তভূমির প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাই প্রকাশ করে।

কৈকেয়ী নিজের পুত্রকে সিংহাসনে বসাবার জন্য এতই দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধা যে রুদ্ধবাক দশরথ যে বাণী উচ্চারণ করতে পারেন নি — তার জীর্ণদশা দেখেও তার প্রাণে এতটুকু কোমলতার সঞ্চার হয়নি। তিনি স্বচ্ছন্দে রামনির্বাসনের কথা উচ্চারণ করলেন। ভাবতে কষ্ট হয় যে এই নারীই দশরথকে সেবায় তুষ্ট ক'রে তার কাছ থেকে দুটি বর চেয়ে নিয়েছিলেন। অথচ সেজন্য কৈকেয়ীর কোন প্রতিক্রিয়াই নেই। যে রামচন্দ্রের অভিষেক সংবাদে তিনি কুব্জাকে পুরস্কৃত করতে চেয়েছেন সেই রামচন্দ্রকেই কৈকেয়ী বলছেন —

কৈকেয়ী বলেন রাম আগে যাহ বন।
ভরত আসিবে তবে এই নিকেতন। (পৃঃ- ১১৪)

এই নিষ্ঠুরতা মধ্যযুগীয় শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে আশ্চর্য সঙ্গতিরক্ষা

করেছে। ব্যতিক্রম শুধু এইটুকু যে এখানে নির্যাতনের অধিকার এসেছে নারীর হাতে।

কৌশল্যা পতিপ্রাণা রমণীর আদর্শ। তিনি ভেবেছিলেন রামচন্দ্রের অনুগমন করবেন — কারণ, পুত্র ও পুত্রবধূ যেখানে নেই সেখানে তার জীবনে কি সুখ? কিন্তু দশরথ রয়েছেন — সপত্নী বিদ্বেষ বশেও তিনি পতির প্রতি অবিচার করতে পারেন নি। সুমিত্রা প্রকৃতপক্ষে কৌশল্যার ছায়া। কৃত্তিবাস অনেকক্ষেত্রে একই রকমের উপমা ও যুক্তি দিয়ে দুটি চরিত্রকে একই ভাষায় কথা বলিয়েছেন।

(ঘ) চণ্ডীমঙ্গল — কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম — (ষোড়শ শতক)

এই কবির আবির্ভাবকাল ষোড়শ শতকের শেষভাগ। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকেই প্রতিষ্ঠা হলেও এই শ্রেণীর কাব্যের ব্যাপক প্রচলন ঘটে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে।

এই কাব্যে আছে চণ্ডী নামক স্ত্রীদেবীর মহিমা বর্ণনা। এই চণ্ডী

পুরাণের মহিষাসুর মর্দিনী নন — মার্কণ্ডেয় পুরাণের সুরথ পূজিতা চণ্ডীও তিনি নন। মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী ব্যাধপূজিতা অষ্টাভুজা অনার্যদেবতা অথবা বণিকপূজিতা চতুর্ভুজা কমলে-কামিনী। চণ্ডীর এই মূর্তি হিন্দুর পুরাণে নেই।

একথা মনে রাখতে হবে, সামাজিক প্রয়োজনেই মঙ্গলকাব্যগুলি প্রচারিত হয়েছিল। সর্পদংশন থেকে ত্রাণ লাভের জন্য সর্পের দেবতা মনসার পরিকল্পনা আবার পশুদের অত্যাচার থেকে ত্রাণলাভের জন্য চণ্ডীর কল্পনা। পরবর্তীকালে আর্য ও আর্যেতর সংস্কৃতির সমন্বয়ের যুগে চণ্ডী হলেন মহাদেবের পত্নী বা দুর্গা, মনসা হলেন মহাদেবের কন্যা।

সমালোচকদের বিচারে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল — এজাতীয় কাব্যসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে। এই কাব্যে এমন একটি উক্তি আছে - যার মধ্যে আমরা সমগ্রকাব্যের নারী মর্যাদার চাবি - কাঠিটি পেয়ে যাই। সেই উক্তিটি হচ্ছে —

'স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি।'

নারীর স্থান অবশ্য গৃহকোণে। সেইখানে সে পুরুষদের এবং অন্যান্য প্রাধানা নারীদের দাসীত্ব ক'রে পুরুষের সন্তান গর্ভে ধারণ ক'রে — তাদের মানুষ করবে এই ছিল সমাজের বিধান। এই কাব্যে নারী যেন মানবী নয়, সে একাধারে পুরুষের, দৈবের, সমাজের ষড়যন্ত্রকারীর

অর্থাৎ অন্যের খেয়াল খুশীর ক্রীড়নক মাত্র । কোথাও নির্যাতিতা নারীদের মুখ থেকে একটি সামান্য প্রতিবাদও ধ্বনিত হতে শুনিনা ।

দক্ষরাজ যজ্ঞের আয়োজন করেছেন, যে যজ্ঞে ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ আমন্ত্রিত — দানব, গন্ধর্ব, কিন্নর প্রভৃতিরাও আছেন । একমাত্র বর্বর জামাতা শিবের উপস্থিতি দক্ষরাজ চাননি । দক্ষকন্যা সতীর কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে । পিতৃগৃহে উৎসব, সতী স্বাভাবিক ভাবেই যাবার জন্য উতলা হলেন, কিন্তু শিব যেতে দিতে রাজী হচ্ছেন না । উপায়হীনা সতী নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন —

বাঘ - বলদে দন্ধ সদা নিবারিব কত ।
অভাগীর কপাল দারুণ দৈব হত ।।
ময়ূর মূষায় দ্বন্দ্বা দ্বন্দ্ব সদাই কন্দল ।
এই নিমিত্তে সদাগালি মোর কর্মফল ।
দারুণ দৈবের ফলে হইনু দুখিনী ।।
ভিক্ষার ভাতে দারুণ বিধি করিল গৃহিনী ।।
উন্মত্ত ল্যাংটা হর চিতাধূলি গায় ।
দান্ডাইতে শিবের জটা অবনী লোটায় ।।
একত্রে শুইতে নারি সাপের নিঃশ্বাসে ।
আর অধিক প্রাণ পোড়ে বাঘছালের বাসে ।।
পায়ে ধরি ধার করি শুধিতে কোন্দল ।
পুনর্বার উধার করিতে নাহি স্হল ।।

~~পুনর্বার উধার করিতে নাহি স্থল ।।~~

উচিত কহিতে আমি সবাকার অরি ।

দুঃখ যৌতুক দিয়া বাপ বিভা দিল গৌরী ।। (পৃঃ- ১১৯)

এমনিভাবে ফুল্লরারও খেদোক্তি ধ্বনিত হয়েছে —

ভালে করাঘাত হানি কান্দে ব্যাধ নিতম্বিনী

নিঃশ্বাসে মলিন মুখচান্দে ।

দারুণ দৈবের গতি কপালে দরিদ্র পতি

ঠেকিনু সম্বল চিন্তা ফান্দে ।।

সুন্দর সুখের দাম্পত্য জীবন কালকেতু ও ফুল্লরার — অকস্মাৎ তার মধ্যে এক সুন্দরী ষোড়শী রমণীর আবির্ভাব । স্বাভাবিক ভাবেই ফুল্লরা ভীতা হয়েছে, পাছে তাকে সতীনের ঘর করতে হয় । এরজন্য নিজের বারো মাসের দুঃখের কাহিনী বলে সম্ভাব্য সতীনকে পরাঙমুখ করার চেষ্টা খুবই স্বাভাবিক । কিন্তু সেখানে তো কোন পৌরুষ নেই, আছে আত্ম - বিলাপ । অবশ্য এখানে কবি মুকুন্দরাম খানিকটা বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন । মনে হয় এ যুগের কাব্যের সমস্ত নারী চরিত্রের মধ্যে একমাত্র ফুল্লরাই বাস্তবমুখী আধুনিক জীবন সংগ্রামের কথা বলেছে ।

(তোরে) দেখিগো উত্তমজাতি দেবতা সমান ভাতি

কোপ কর নীচের সমান ।

ছাড়িয়া পতির পাশ   কেন আন্যা পরবাস
আপনার কি সাধিলে মান ।।
সতিনী কোন্দল করে   দ্বিগুন বলিবে তারে
অভিমানে ঘর ছাড় কেনি ।
কোপে কৈলে বিষপান আপনি তেজিবে প্রাণ
সতিনের কিবা হবে হানি ? (পৃ:- ২৪৯)

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যযুগীয় সেই শাশ্বত সতীত্ব হানির চিত্রও ফুল্লরা তুলে ধরলো ।

অধম অবর্ণা জাতি   যদি থাকে এক রাতি
পরের ভবনে কদাচিৎ ।
কুল ধরে বন্ধু জন   লোকে করে গঞ্জন
অবিচারে কৈলে অনুচিত ।। (পৃ:- ২৪৯)

সতী বেহুলা, খুল্লনা প্রভৃতি একই সুরের বিভিন্ন মূর্চ্ছনা মাত্র । ফুল্লরা চন্ডীর প্রতি যে উপদেশগুলি দিয়েছে তাতে স্বামীর মহিমাই সুকৌশলে সাজানো, পক্ষপাতদুষ্ট স্বামীকেই দেবতা জ্ঞানে পূজা করতে হবে, নারীর যে একটি পৃথক মানবিক সত্তা থাকতে পারে — একথা সেই যুগের সামাজিকেরা ভাবেন নি । পতিকে ছেড়ে একদিন অন্যত্র বসবাস করলে নারীর যে পাপ হয় তারজন্য তাকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয় । কিন্তু সেই স্বামী দেবতা যদি অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হয় তারজন্য তার প্রায়শ্চিত্তের কোন বিধান নেই ।

সুন্দরী রমণীকে প্রতিনিবৃত্ত করতে না পেরে ফুল্লরা শেষে কাঁদতে কাঁদতে স্বামীর কাছে গিয়ে বললো —

সতা সতী নাহি মোর , তুমি মোর সতা
আজি হইতে ফুল্লরারে বিমুখ বিধাতা ।

এখানে সেই বিধাতার উপর নির্ভরশীলতা ।

বণিক খণ্ডের শুরুতেই দেখা গেল , ধনপতি সদাগর নিজ শ্যালিকাকে বিবাহ করার আগ্রহে অধীর । শ্যালিকা জামাইবাবুর সঙ্গে পায়রা নিয়ে লুকোচুরি খেলবে এতে কোন অস্বাভাবিকতা দেখিনা — কিন্তু লহনার মত সতী সাধ্বী স্ত্রীর সঙ্গে একি ধরণের বিকৃত লুকোচুরি ! ধনপতি এই বলে লহনাকে ভোলাতে চেষ্টা করেছেন —

রন্ধনের তরে আমি আইন্যা দিব দাসী । (পৃ:- ১১৭)

লহনার যে দাসীর প্রয়োজন নেই , সে যে গৃহকর্মে নিপুণা , এই কথা বলে' লহনা অবশ্য কিঞ্চিৎ আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছেন । তার নিজের কোন অপরাধের জন্য কি তার স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করছেন - এই তার জিজ্ঞাসা —

সত্য কৈলে মত সব কৈলে হত
কী মোর দোষ দেখিয়া ।

অঙগনা সমাজে   কিবা গৃহকাজে

পাইলে মোর অনোচিত ।।   (পৃ:- ১১৮)

কবি লহনার মুখে বা ব্যবহারে কোন দৃঢ়তা আরোপ করতে পারেন নি এই কারণে যে দেবী পূজার প্রচলন করাতে হলে' কাব্যকাহিনীতে সমাজ মানসিকতার উপর অবশ্যই নির্ভর করতে হয় ।

যে লহনা স্বামীকে তুষ্ট করার জন্য (অথবা) নিজের মূর্খতার জন্য খুল্লতাত ভগিনীকে সপত্নী রূপে গ্রহণ করেছে সেই লহনাই দুর্বলাদাসীর প্ররোচনায় খুল্লনার উপর নির্যাতন শুরু করেছে । এখানে তার ব্যক্তিত্ব হীনতা, নারীত্বের অপমান ও অত্যধিক পতিকেন্দ্রিকতার প্রমাণ মিলছে । স্বামীকে বশ করার জন্য দুর্বলাদাসীকে সাহায্য করতে বলছে অথচ নিজের স্বামীকে সে কিছু বলতে পারছে না ।

খুল্লনা আর এক নারীচরিত্র । ধনপতিকে পতিরূপে পাবার জন্য তার পায়রাকে লুকিয়ে রেখে নানা রকম ছলাকলা করেছে — সে তো সুচতুরা রমণী । একটা তুচ্ছ দাসীর কাছে সে যে কি ক'রে বোকা বনে গেল — সে এক বিচিত্র রহস্য । কিন্তু এর সমাধান রয়েছে মধ্যযুগের সাহিত্য নির্মাণ শৈলীতে — 'তোমাকে এই ভাবে চললে হবে না, এই রীতিতে কথা বলতে হবে, চলতে হবে — নইলে আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে না ।'

এই মানসিকতার বশবর্তী হয়ে খুল্লনা নির্বিবাদে মেনে নিল সতীনের নির্যাতন — সে যেন নিজের কর্মফল বলে সব কিছুকে মেনে নিতেই অভ্যস্ত। এই নীতিতেই সে যুগের সাহিত্যে চিত্রিত হয়েছে রমণীরা।

নিদারুণ কর্মদোষে, নিদারুণ কর্মদোষে
বিধাতা বঞ্চিল মোরে, তুমি নাহি বাসে। (পৃঃ-১৬৫)

সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সে স্বাভাবিক ভাবেই দেবী চণ্ডীর কৃপায় স্বামীকে ফিরে পেয়েছে। সে চণ্ডীকে তার বিদেশগমনোদ্যত স্বামীর কল্যানের জন্য গোপনে পূজা করেছে — আর এই সংবাদ পেয়ে ধনপতি যে মন্তব্য করেছে তা এখানে উদধৃত করলাম — মন্তব্যের ভার দিলাম সমালোচককে - অন্য মন্তব্যের প্রয়োজন নেই। —

'স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি।'
কোপযুত ভাষে কিছু বলে ধনপতি।
অদৃষ্টে আছিল মোর পাপিনী যুবতি।।
কার কুলে নাহি দেখি হেন পাপ বধূ।
এমন কোথায় কিবা কুলযশ বিধু?
বামপথি হইয়া করিস কার পূজা।
একথা শুনিয়া যদি ছলে ফিরে রাজা।।
পুনর্বার জ্ঞাতিবন্ধু যদি ছল ধরে।
কত না পরীক্ষা তোরে দিব বারে বারে।। (পৃঃ-১৯৩)

অবশ্য স্বামীর অগোচরে সেই 'স্ত্রীলিঙগ' দেবতার কাছেই অসহায়া খুল্লনা নালিশ জানিয়েছে --

মুর্খ আমার পতি তোমা নাহি ভজে
আমা দেখ্যা স্বামী রায় পদ সরসিজে ।।

যে খুল্লনা পতিগৃহে প্রবেশ করার সঙেগ সঙেগ পেয়েছে কেবল নির্যাতন, অবহেলা আর কটূক্তির বিষ দংশন জ্বালা তার জন্য তার কোন প্রতিবাদ নেই --- বিনিময়ে সে করেছে শুধু পতির কল্যান কামনা । তার কন্ঠেই শুনতে পাই সমাজ বিধির যূপকাষ্ঠে যন্ত্রণাহতা নারীর করুণ ক্রন্দন ।

কবি মুকুন্দরাম মঙগলকাব্যের একজন বিশেষ খ্যাতিমান কবি -- তাঁর কাব্যের নাম অভয়ামঙগল । ইনি ছিলেন মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসন - যন্ত্রের এক প্রত্যক্ষ শিকার । দারিদ্র্যে পীড়িত ও অপমানে সঙকুচিত হয়ে যে সমাজে তিনি নিজে বাস করেছিলেন, ব্যক্তিগত জীবনে যে দু:সহ দু:খ ভোগ করেছিলেন তারই বেদনার আন্তরিক প্রকাশ আমরা দেখতে পাই তার কাব্যে । কবি প্রদত্ত আত্মবিবরণীতে আছে বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে কবির পৈত্রিক নিবাস ছিল -- ডিহিদার মামুদ শরিফের নিষ্ঠুর উৎপীড়নে তাঁকে গৃহত্যাগ করতে হয়েছিল । স্ত্রী পুত্র সঙেগ নিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে তিনি বেড়িয়েছিলেন পথে --- আশ্রয় নেই, ক্ষুধার অন্ন নেই --- 'শিশু কাঁদে ওদনের তরে'।

কবি এলেন মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণ ভূমিতে। সেখানকার রাজার উত্তরাধিকারী জমিদার বাঁকুড়া রায় কবিকে পুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক রূপে নিযুক্ত করলেন, আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। রঘুনাথের অনুরোধেই পরে তিনি তার অভয়ামঙ্গল (চণ্ডীমঙ্গল) কাব্য রচনা করেছিলেন। রচনাকাল আনুমানিক ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

এই সমাজ ব্যবস্থার নির্যাতনের শিকার কবি নিজেই ছিলেন। নির্যাতিত মানুষ অপর কোন নির্যাতিত মানুষের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই সহানুভূতি সম্পন্ন হবেন। কিন্তু পুরুষ সমাজ কর্তৃক নির্যাতিতা নারীর প্রতি কবির তেমন সহানুভূতি প্রকাশিত হতে দেখা যায় না। নিষ্ঠুর সমাজ ব্যবস্থার খেলার পুতুল কবি নিজেই ছিলেন। মনে হয় পুরুষদের মানসিকতাও নির্যাতক ব্যক্তি বা ব্যবস্থার প্রতি নতি স্বীকার করে প্রাণ বাঁচানোর মধ্যেই তৃপ্তি পেতো। তাই নির্যাতিতা নারী চরিত্রগুলি অঙ্কন করার সময় নির্যাতনের চিত্রটি এঁকেই কবি নিয়তি নির্ভরতার কথা তুলে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন।

(৬) মনসামঙ্গল — কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ —(সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগ)

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ — ১৬৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কবি। কবি দেবী মনসাকে অতি সাধারণ মানবী রূপেই চিত্রিত করেছেন — তবে তার সঙ্গে দৈবী মহিমাও রয়েছে। দেবসভায় বেহুলার সঙ্গে তার কথাবার্তায় তাকে কপট চাতুরীর আশ্রয় নিতে হয়েছে — আবার তিনি তার পদ্মহস্ত বুলিয়ে লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন। অন্যান্য বিষয়গুলিতে তিনি অন্যান্য মনসামঙ্গলের অনুগামী। নারীজাতির প্রতি কামনা লোলুপ পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টি তেমনিই আছে — অবিচার ও নির্যাতনের চাপে নারীজাতির অসহায়-রূপ ঠিক তেমনি। বেহুলা মৃত স্বামীকে নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় দীর্ঘপথ একাকিনী অতিক্রম করেছে — তাই উৎপীড়ক সমাজ তার উপর বিরাট এক শাস্তির খড়্গ উত্তোলন ক'রে বসে আছে। অন্যান্য মনসামঙ্গলে যেমন আছে এখানেও তেমনি দেবী যে কোন উপায়ে তার আধিপত্য স্থাপনে ব্যগ্র। নতুনত্ব এইখানে মহেশ্বর ও তার দৈব মহিমা হারিয়েছেন — তিনি ডোমনীর রূপে আসক্ত।

তবে পরচৈতন্য যুগের মনসামঙ্গলের কবি তালিকায় কেতকাদাস বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রতিভা দ্বিতীয় শ্রেণীর হলেও তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। জনৈক বিশিষ্ট পণ্ডিত তাঁকে মনসামঙ্গলের

সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে অভিনন্দিত করেছেন। কিন্তু এসবই ভক্তিবাদের উচ্ছ্বাস। সুতরাং সাহিত্য বিচারে অচল।

কবির প্রকৃতনাম ক্ষমানন্দ, ভনিতায় তিনি নিজেকে কখনও বলেছেন — 'কেতকাদাস' (মনসার দাস) কোথাও বলেছেন ক্ষেমানন্দ বা ক্ষমানন্দ, কবির প্রকৃতনাম ক্ষমানন্দ।

তার রচনা পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। একটু অধিক পাণ্ডিত্য তিনি দেখিয়েছেন — শিবের চরিত্র অঙ্কনে — তাঁর কাব্যে শিব এক ডোমনীর রূপে মুগ্ধ।

লড় দিয়া গিয়া শিব ডোমনীর ঘরে।
মাথা দিয়া ধরে শিব ডোমনীর করে।।
বড় করি' ডোমনী যে চিৎকার করে -
এখানে পরশী নাহি সাথী করি কারে। (পৃঃ- ৪৫৪)

কিন্তু ডোমনী নিতান্তই ভোগের পাত্রী — সুতরাং জোর ক'রে শিব তাকে আলিঙ্গন করলেন। তিনি বললেন —

তোর রূপ হেরি মোর স্থির নহে প্রাণ
প্রাণরক্ষা কর মোরে দিয়া রতিদান। (পৃঃ- ৪৫৪)

তাঁর মনসা চরিত্রের নিষ্ঠুরতা অক্ষুন্ন রয়েছে।

(চ) মনসাপুরাণ — তন্ত্রবিভূতি — (সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগ)

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তন্ত্রবিভূতির প্রবেশ খুবই সাম্প্রতিক ব্যাপার। সম্প্রতি এই কবি ও এঁর কাব্য সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। কাব্যে কবি ভণিতা দিয়েছেন —

মনদিঞা শুন সবে মনসার গীত
তন্ত্রবিভূতি গায় মনসাচরিত।

তন্ত্রবিভূতি রচিত মনসাপুরাণে মনসার জন্মবৃত্তান্ত এইরূপ — পাতাল-পুরীতে পদ্মনালের ভিতর দিয়ে শিবের বিন্দু পতিত হলে বাসুকী ধ্যানের মাধ্যমে তা জানতে পারলেন, তিনি তাতে জলসিঞ্চন ক'রে দেবী মনসার সৃষ্টি করলেন। শিবের মানস কন্যা বলে তার নাম হল মনসা, পদ্ম-নালের মধ্যে জন্ম, তাই তিনি পদ্মা। সেই নবজাতা যখন শিবকে 'বাপু-বাপু' বলে ডেকে তার সঙ্গে ঘরে যেতে চাইলেন তখন তিনি বললেন —

তুমাকে লইয়া আমি না যাইমু ঘর।
তুমাকে বোলিত্রে আমি না জাইহ ঘর।।
ঘরে দুর্গা আছে মোর বড়ই প্রখর।
আমার বাক্য শুন মা ব্রাহ্মণী তোতল।।

তুমি গেলে হবে যাই দ্বন্দ্ব কোন্দল ।
যখন বোলিবে দুর্গা কুৎসিত বচন ।।
সহিতে না পারিবে তুমি করিবে ক্রন্দন ।। (পৃঃ- ১০)

শিব ঘরে গিয়ে পুষ্পের সাজির মধ্যে পদ্মাকে লুকিয়ে রাখলেন ।

এরপর ফুলের সাজি থেকেই পদ্মাকে আবিষ্কার করলেন দুর্গা ।

বৎসর পাঞ্চের মত কন্যারূপে হৈঞা ।
যাও যাও বলি চরণ ধরিল ব্যাপিয়া ।।
ক্রোধিত হইয়া দুর্গা ধরে তার চুলে ।
চড়কে চাপড় মারে বিষহরির গালে ।। (পৃঃ- ১৪)

অনেক প্রশ্ন জাগে । প্রথম প্রশ্ন-পাঁচবছরের কন্যাকে লুকিয়ে রাখার প্রশ্ন কেন ওঠে ? দ্বিতীয় প্রশ্ন — ফুলের সাজির মধ্যে এই বয়সের একটি মেয়েকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব কিনা ? তৃতীয় প্রশ্ন — শিবের সঙ্গে তার যৌন সম্পর্কের কথা ভেবেই কি দুর্গার এই ক্রোধান্বিতা রূপ ? চতুর্থ প্রশ্ন — মাত্র পাঁচ বছরের কন্যার (খুকীর) সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব কিনা ? দুর্গা অতি স্পষ্ট ভাষায় বলেছে —

সুন বেটি দুষ্টমতি বাপ লইঞা তোর রতি
কাহাকে বোলহ তুমি বাপ ।। (পৃঃ- ১৫)

মধ্যযুগীয় মানসিকতায় নর-নারীর সম্পর্ক কেবলমাত্র যৌনোপভোগ ছাড়া যেন আর কিছুই স্থান পায়নি তাই এই যৌন সম্পর্ক যে সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে সেদিকে কবির দৃকপাত নেই। শিবায়ন কাব্যে শিবের কৃষকরূপ বুঝতে পারি - কিন্তু শিব চরিত্র সম্পর্কে দুর্গার এই অস্বাভাবিক মন্তব্য আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আমরা দেখে এসেছি মাত্র এগার বছরের একটি কন্যাকে ধর্ষণের জন্য (শ্রীকৃষ্ণের ভাষায় 'রতি আশে') শ্রীকৃষ্ণ তার পিছনে ছুটাছুটি করছেন। স্বয়ং শিব এখানে তাঁর পাঁচ বছরের মানস কন্যার রূপে মুগ্ধ। শিবের এই অশিবমনোভাব সর্বথা নিন্দনীয়। ভ্রমনবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য শিবকে শেষ পর্যন্ত বলতে হল —

মানস সরোবরে ঘর দেওত বান্ধিয়া। (পৃ:- ১০)

তন্ত্রবিভূতি সবিস্তারে মনসার কাহিনী বলেছেন। শিব তাঁর ভক্ত চাঁদ সদাগরকে ডেকে আদেশ করলেন —

'আজি হৈতে পূজা তুমি কর মনসার।
পৃথিবীতে পদ্মার পূজা করহ প্রচার।।' (পৃ:- ৬৮)

চাঁদ এর উত্তরে যা বললেন তাতে তৎকালীন সমাজে নারীর আসনটি অতি চমৎকার ফুটে উঠেছে।

স্বামীতে ছাড়িল জাকে দেখি অনাচার।
হেন জনা পূজিবারে ইচ্ছা হয় কার।। (পৃ:- ৬৯)

স্বামীতে মনসাকে ছেড়ে দেবার ঘটনাটা একবার বিচার করা যেতে পারে। স্বামী জরৎকারু ইচ্ছে করেই সেদিন ঘুমিয়ে ছিলেন। সন্ধ্যাপাত হবে জেনে স্বামীকে জাগিয়েছে মনসা। না জাগালেও তো অপরাধই হত। জাগালে যে অপরাধ হল সেটা প্রমাণ করা হল এক প্রকৃতিবিরুদ্ধ (অতিপ্রাকৃত) যুক্তি দিয়ে। অর্থাৎ সন্ধ্যার ক্ষমতা নেই, জরৎকারু ইচ্ছা সন্ধ্যা না করা পর্যন্ত চলে যাবার। এতে স্বামী তাকে ছেড়েছেন। এক্ষেত্রে মনসার কোন অপরাধই তো আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু মনসার পূজা করতে স্বয়ং শিব আদেশ করেছেন — সেই আদেশের বিরুদ্ধে এমন সদম্ভ উক্তি করতে পারলেন চাঁদ সদাগর তার কোন অপরাধ হল না। অর্থাৎ নারীর এমন কোন উপাদান নেই যার মূল্য সমাজকে দিতে হবে।

বাসরঘরে লখিন্দরের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়ে রান্না সমাপ্ত ক'রে দেখে স্বামী ঘুমে অচেতন। আমরা বেহুলার আর্তনাদ শুনি —

এত দু:খে রান্ধিনু ব্যঞ্জন আর ভাত।
অভাগিনীর কর্মদোষে পড়িলা নিদ্রাত।। (পৃ:-৩২৮)

স্বামী নিদ্রাভিভূত হবেন তাও 'অভাগিনীর কর্মদোষে'। লখিন্দরের মৃত্যুর পর সেই শোচনীয় মৃত্যুকে পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল বলেই মেনে নিলেন বেহুলা —

কোথা গেলে পাইব প্রাণের গুণনিধি
পূর্বজন্মের পাপে বিড়ম্বিল আমায় বিধি।

এসবই সমাজচিন্তার এক নিদারুণ রূপ ! নারীর জীবনে যে সর্বনাশ ঘটবে — তার জন্য দায়ী তার কর্ম — এ জন্মের না হলেও পূর্বজন্মের । সমাজেরই প্রতিনিধি সোনাই মৃত্যুর পর এসে কোন সান্ত্বনার বাক্য উচ্চারণ করেনি — বেহুলাকেই সমস্ত সর্বনাশের মূল ঘোষণা ক'রে নিষ্ঠুর ভাষায় তিরস্কার করেছে । এদের ভাষায় যেন লখিন্দরের মৃত্যুর কারণও বেহুলা । আর সঙ্গে সঙ্গে চেপেছে সমস্ত অলক্ষুণে বিশেষণ সম্ভার বেহুলার কাঁধে —

দন্ত তোর চিরল দীঘল মাথার চুল ।
কুলক্ষিনী ডুবাইলে বানিয়ার - কুল ।। (পৃ:- ৩৭৪)

এর যোগ্য জবাব দিয়েছে বেহুলা শাশুড়ীর অভিযোগের উত্তরে --

এখন মরিল স্বামী মোর কুলক্ষণে
আর ছয় পুত্র তোমার মরিল কেমনে ?
দেবতা মনুষ্যে হৈল নিরন্তর বাদ ।
কুশলে থাকিবে নাকিন মনে কর সাধ ।। (পৃ:-৩৭৫)

বেহুলাকে ব্রত ত্যাগ করে' ঘরে ফিরিয়ে আনতে গেল আসাই বাসাই নামে তার দুই দাদা । বোনকে তারা প্রতিশ্রুতি দিল যে বাড়ীতে তারা তাকে সবরকম সুখে রাখবে । কিন্তু বেহুলা সমাজে তার স্থান সম্পর্কে সচেতন , সমাজে বিধবাদের জীবন যে কত বিষময় তার চিত্র বেহুলার উক্তির মধ্যেই ফুটে উঠেছে —

আসাই বাসাই যত কয় বেহুলার মনে নাহি লয়
জাহ দাদাই ক্ষেমা করিঞা
আতব চাউল নব হাঁড়ি লোকেতে বলিবে রাড়ী
মায়েতে মরিবে কাঁন্দিঞা ।।
নবীন হাঁড়ি কোথায় পাব বনের শাক কুড়াইব
ইহাতে আমার নাহি আশ । (পৃ:- ৪০৮)

স্বামীর মৃত্যুর জন্য সমাজ তাকেই দায়ী করেছে — যেন পুরুষের জীবনকে ধরে রাখার দায়িত্বও নারীর । বিধবা হয়ে সারা জীবন বনের শাকপাতা খেয়ে , নবীন হাঁড়িতে চাল সেদ্ধ ক'রে খেয়ে বেঁচে থাকতে হবে । এই দু:খের বোঝার উপর শাকের আঁটিও আছে — মানুষের কটাক্ষ , দীর্ঘশ্বাস আর খেদোক্তি । এই জীবনের চেয়ে মৃত্যুও বেহুলার কাছে বরণীয় — সে যদি স্বামীকে বাঁচাতে না পারে তবু এই ক্লেদাক্ত সমাজে আর ফিরে আসবে না — এই তার কঠিন সংকল্প ।

সারাটা জীবন যে কী কষ্টের মধ্যে বিধবা নারীকে কাটাতে হত তার একটি সুন্দর ও বাস্তব চিত্র আমরা এখানে বেহুলার কণ্ঠে পাই । গোয়াল সাফ করে ঢেকিশালে শুয়ে তাকে কালাতিপাত করতে হবে , স্বামী যাদের আছেন তারা নানা প্রসাধনে সেজে গুঁজে দিনগুলো কাটাবে আর বিধবাদের জন্য নানা কুৎসা রটনা করে প্রয়োজনে হাত ধরে তাকে ঘর থেকে বের করে' দেবে । দাদারা যতই বোনকে আপন মনে করুক , সব সময়েতো

তারা আর ঘরে থাকবে না। কাজেই ভাগ্যহীনা বেহুলাকে এক যন্ত্রনময় যন্ত্রণাময় জীবন যাপনে বাধ্য করার সকল ব্যবস্হাই সেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই চিত্রকে অবশ্য পরোক্ষভাবে কবি মনের নারীর প্রতি নিষ্ঠুর সমাজ ব্যবস্হার প্রতি বিক্ষোভ হিসেবে ধরা যেতে পারে।

এর পরবর্তী বেহুলার চিত্র অত্যন্ত করুণ। সঙ্গীহীনা সহায়হীনা বেহুলা নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেছে — সামনে তার স্বামীর মৃতদেহ। পথে শঙ্খ সদাগর তার কাছে কুপ্রস্তাব দিয়েছে — তার যোগ্য উত্তর ধ্বনিত হয়েছে বেহুলার কন্ঠে —

সুজনের বুদ্ধি নহে দুর্জনের মন
না জানিত্রা বিধি তোরে দিলা এত ধন।
রূপে গুণে বল কর মোর বিদ্যমান
মোর স্বামীর নহ তুমি নফর সমান। (পৃঃ- ৪৩৫)

শঙ্খ সদাগর এর উত্তরে যা বললেন — তাতে ফুটে উঠেছে নারী সম্পর্কে তৎকালীন সমাজের ধারণা, সেই সমাজের রায় এই, সতী নারীর পতি কখনো মরে না।

যদি তুমি হও সতী কেনে মরে তোমার পতি
কেনে রাড়ী হইলা পতিব্রতা ?
সতীর স্বামী নাহি মরে

কিবা তুমি কৈলে পাপ কি জানি কি হৈল তাপ
মাজে ভাসো জলের উপরে। (পৃ:- ৪৩৬)

সতীর পতি মারা গেলে তার দায় সতীর। ভ্রমর বৃত্তি শঙখ সদাগর চায় বেহুলার দেহ সম্ভোগ করতে — তার অনুকূলে সে যুক্তি দিয়েছে — মন্দোদরী বা তারা পতির মৃত্যুর পর তাদের দেবরের ঘর করেও সতী বলেই সম্মানিতা হয়েছেন। বেহুলা যদি শঙখ সদাগরের শয্যা সঙ্গিনী হয় তবে সতী বলে পরিগণিত হবার পক্ষে কোন বাধা শাস্ত্রে বা পুরাণে নেই। তাই —

কন্যা জদি তুমি কর অহঙকার
মৃতক ফেলাঞা জলে নৌকাতে তুলিব বলে
মহাসুখে ভুঞ্জিব শৃঙগার। (পৃ:- ৪৩৭)

পুরুষের অবারিত অধিকার প্রতিষ্ঠার চরম হুমকি উচ্চারিত হল শঙখ-সদাগরের কণ্ঠে।

শুধু কি শঙখ সদাগর? ক্রমে জুয়ারীর ঘাটে এল বেহুলা। সেই ঘাটে জুয়া খেলায় সর্বস্ব হারিয়ে গলায় কলসী বেঁধে আত্মহত্যা করছে। কিন্তু বেহুলার বরে সে হেরে যাওয়া ধন সম্পত্তি ফিরে পেল। পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই মরণোদ্যত কাপুরুষের মনে জেগে উঠলো পৌরুষ — সে প্রস্তাব করলো —

আমার কোলেতে বৈস সুন কন্যা রাই —
আমি বর তুমি কন্যা মিলাইল গোসাঞি (পৃঃ- ৪৫২)

ক্রমে দেবসমাজে উপনীত হলেন বেহুলা। এখানে নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পদ্মার বরে লখিন্দরের প্রাণদান করালেন। অসাধ্যসাধিকা বিজয়িনী বেহুলা দেবতাদের আনন্দ বিধানের জন্য নৃত্য সুরু করলেন। কিন্তু বেহুলার এই দেব সমাজে নৃত্যকে নবজীবন প্রাপ্ত লখিন্দর অন্য চোখে দেখলো। ঘুমের ঘোরে তার জীবন নাশ হয়েছিল বিষধর সর্পের দংশনে — এখনও চোখে তার নিদ্রার ঘোর —। সে বললো —

লখাই বোলে সুন বালী কুলে লাগাইলি কালি
তোমার কেনে এমতি বেভার
এতেক সমাজ মাঝে নৃত্য কর কোন্ লাজে
ত্রিভুবনে রাখিলে খাঁখার ।।

* * * * *

এমত ডাকিনী তুমি এবে সে জানিনু আমি
পাইনু বিষম মনস্তাপ।
আছিল চম্পালী পুরী আনিলে কেমন করি'
কান্দঞা মোরিবে মাও বাপ ।। (পৃঃ- ৪৮৩)

কেন, কেমন করে এই দেবসমাজে তারা এলো তা জানবার কোন আকাঙ্খাই তার নেই। লখাই নয় — মধ্যযুগই যেন বিকৃত সিদ্ধান্ত ক'রে

প্রাণদায়িনী বেহুলাকে বলেছে ডাকিনী। দেবী পদ্মার প্রতিও লখিন্দরের উক্তি ~~বিস্ময়জনক~~ বিস্ময় জনক। স্ত্রী দেবতা তো। নারী দেব ভূমির হলেও ক্ষমা নেই। জীবন ফিরে পেয়ে পদ্মাকে সে বলছে —

দেবীকে দেখিঞা বালা বোলে কটুবাণী।
মায়া পাতি বসিঞাছে চেঙ্গ মুণ্ডি কানী।।
মোর বাপার সঙ্গে বাদ করে নিরন্তর।
এখানে পালাঞা আছ দেবের গোচর।   (পৃ:- ৪৮৪)

আমাদের মনে লখিন্দরের অন্য ভাবমূর্তি। কবি একে নীরব রাখলেই পারতেন। বাসর ঘরেও লখিন্দর বাসরোচিত কথা বলেনি।

চাঁদের সমস্ত সম্পদ উদ্ধার করে' বানিজ্যতরী নিয়ে ফেরার সময় ওরা মধুসূদন দানীর খপ্পরে পড়লো, এই দানী ওদের আটক করে রাজ-দরবারে নালিশ করলো —

সাধু নহে অনাচারী   হরিঞা পরের নারী
লঞা যায় আপনার পুরী,
জে জন সজ্জন হয়   সঙ্গে নাকি নারী লয়
সর্বথায় পরের সুন্দরী।।   (পৃ:- ৫০৪)

এটাই মধ্যযুগীয় মানসিকতা। নারী লুটের মাল। সজ্জন কখনও নিজের নারী সঙ্গে নিয়ে বেড়ায় না — কাজেই এ নিশ্চয় পরের সুন্দরী,

সুতরাং রাজার কাছে দানীর নিবেদন —

এক বিদ্যাধরী আছে বানিঞার ঠাঞি
এমন সুন্দরী কন্যা কভু দেখি নাই।
ধনে গুণে ভুলাঞা পরের সুন্দরী।
চুরি করি লঞা যায় আপনার পুরী।।
চুরি করি লঞা যায় পরের যুবতী।
কাড়িঞা ত লেহ রাজা সেই রূপবতী। (পৃ:- ৫০৫)

নারী শক্তিশালী বা ডাকাতের লুটের মাল যেন। রাজা অধিকতর শক্তির অধিকারী হলে তা জোর করে কেড়ে নিয়ে ভোগ করবেন। এটাই ছিল সে যুগের রীতি — তাই তো প্রতিফলিত হয়েছে সাহিত্যে।

বেহুলা লখিন্দর গৃহে ফিরছে — দীর্ঘ ছয় মাসের কাহিনী বলতে বলতে বেহুলা সময় কাটাচ্ছে। ক্রীতদাসীর সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিতা ছিল বলেই কথায় কথায় নারীকে পরীক্ষা দেবার ছলে শোষণ ও নির্যাতন পদ্ধতি মধ্যযুগীয় সাহিত্যের পাতায় পাতায় লক্ষ্য করা যায়।

তন্ত্রবিভূতির 'মনসাপুরাণ' কাব্যে মনসা দেবী হয়েও মানবী। সমাজের সর্বজন মান্য চাঁদ সদাগর তাকে দেবতা বলে স্বীকার না করা পর্যন্ত তার দেবী মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় না। সামান্য ফুলজল পেলেই তিনি খুশী। চাঁদ সদাগর স্বভাবতই 'বিবাদিয়া' চরিত্র, মনসা সেইরূপ নন।

(ছ) মনসামঙ্গল — জগজ্জীবন ঘোষাল — (সপ্তদশ শতকের শেষভাগ)

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসে জগজ্জীবন ঘোষাল মনসামঙ্গল কাব্যের এক সার্থক কবি, আর যাই হোক একে গতানুগতিক কবি বলা চলবে না। দেবখন্ড এবং বাণিয়াখন্ড — এই দুই অংশে বিভক্ত তার কাব্য। প্রধানত: বাণিয়াখন্ডই পূর্ববর্তী কবি তন্ত্র বিভূতিকে তিনি অনুসরণ করেছেন — পালা বিন্যাসের ক্ষেত্রে দুই কবিই একই রীতি অবলম্বন করেছেন। ভাষার সাদৃশ্য বিস্ময় জনক। তবে তন্ত্র বিভূতির রচনায় যে সংযমের পরিচয় আছে জগজ্জীবনের রচনায় তা নেই।

জগজ্জীবনের কাব্য পড়ে বোঝা যায় — এই যুগের নারীরা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছে।

এই কাব্যে পুষ্পকরন্ডিকার (ফুলের সাজি) মধ্যে পদ্মা যখন আবিষ্কৃত হলেন তখন গঙ্গা ও দুর্গা উভয়েই তাকে মারতে শুরু করলেন। পদ্মা বলতে থাকেন —

> না বোল সতীন মোকে না করিহ পাপ
> শিব মোর স্বামী নহে, জন্মদাতা বাপ। (পৃ:- ৮৪)

কিন্তু তবু তাদের বিশ্বাস হয় না। প্রহার চলতে থাকে — একজন

পদ্মার কাঁকুনি ভেঙে দিলেন আর একজন চোখ কানা করে' দিলেন — তাদের প্রশ্ন — শিবের কন্যাই যদি হবে তবে গোপনে করণ্ডিকায় আসবে কেন ?

বাপের সহিতে ঘর করোক বিষহরি ।
তুমি আমি দুইজনে যাই দেশান্তরি ।। (পৃ:-৮৯)

এরপর পদ্মার বিয়ে হল জরৎকারু মুনির সঙ্গে । তখন —

সাগরের কূলে মুনি রহে মহাসুখে
শঙ্কর নন্দিনী সঙ্গে সুরতি কৌতুকে । (পৃ:-১০৩)

মুনি পদ্মার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন । ঘুমন্ত মুনিকে রেখে পদ্মা জলের কাছে গিয়ে সর্পগণকে 'চেঙ্ বেঙ্ ' (চেঙ্ একপ্রকার মাছ, বেঙ্ - ব্যাঙ্ নামক প্রাণী) খেতে দিলেন । ফিরে এসে ঘুমন্ত মুনিকে ডাকলেন পদ্মা —

চেতন হইয়া মুনির ক্রোধে হইল মন ।
ডেকে চণ্ডালিনী মোকে করালে চেতন ।।
প্রথমে সুন্দরী মোরে দিলে মহা শোক ।
অঙ্গীকার করিনু ছাড়িনু আমি তোক ।। (পৃ:-১০৩)

কিছুক্ষণ আগে যে নারীর সঙ্গে মনের 'সুখে সুরতি - কৌতুকে' কাটালেন তারপর পান থেকে চুন খসতেই ''ছাড়িনু আমি তোক ?''

শুধু মধ্যযুগ কেন কোন যুগের সাহিত্যেই এ জাতীয় খেয়ালীপনার কোন ব্যাখ্যা নেই — সমর্থনও নেই ।

ঐ খেয়ালী পুরুষের সন্তান গর্ভে ধারণ ক'রে নিরপরাধা পদ্মা বনে বনে ফলমূল খেয়ে দিনপাত করলেন ও আস্তিকমুনিকে জন্ম দিলেন ।

এরপর বাণিয়াখন্ড ।

আগেই বলেছি , এই খন্ডেই প্রধানত: জগজ্জীবন তার পূর্ববর্তী কবি তন্ত্রবিভূতিকে অনুসরণ করেছেন । স্থানে স্থানে আক্ষরিক মিলও দেখতে পাওয়া যায়, এটাই বিস্ময় জনক । স্বামীর মৃত্যুর পর বেহুলার যে আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে — তারমধ্যে একা বেহুলার নয় সমগ্র নারী সমাজের ক্রন্দনই যেন শুনতে পাই ।

যে নিয়তিকৃত সর্বনাশ বেহুলাকে গ্রাস করেছে বেহুলা সে সব কিছুর জন্যই নিজেকে দায়ী করেছে । তবু তাকে নিন্দিত হতে হয়েছে । সনকা বলছেন —

অতি কুলক্ষণী বেটি মটুক কপালী ।
মারিলে সুন্দর বালা নিরাশী বিড়ালী ।।
দন্ত তোর দীঘল চিরণ মাথার চুল ।
কুলক্ষণী ডুবাইলে বানিয়ার কুল ।। (পৃ:- ২৪৩)

বেহুলা এই অযথা তিরস্কারের প্রতিবাদ করেছে, মনে হয়, অতি-ক্রান্ত মধ্যযুগের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বাণী যেন প্রতিধ্বনিত হল বেহুলার কন্ঠে —

মরিল পুত্র তুমার মোর কুলক্ষণে ।
আর ছয় পুত্র তুমার মরিল কেমনে ।।
দেবতা মনুষ্যে হইব নিরন্তর বাদ ।
কুশলে থাকিতে নাকি মনে কর সাধ ।। (পৃ:-২৪৩)

জগজ্জীবন ঘোষালের অঙ্কিত বেহুলা লখিন্দরের চিত্র বচনে ও ভাষণে অবিকল তন্ত্র বিভূতির অঙ্কিত বেহুলা লখিন্দরের প্রতিচ্ছবি । বেহুলার কৃচ্ছসাধনের পর যখন লখিন্দর প্রাণ ফিরে পেয়েছিল তখনও তিনি একই কটূক্তি বর্ষণ করেছেন বেহুলার উপর ।

বালা বোলে শুন বাণী কুলে লাগাইলে কালি
তোর কেনে অনুচিত কাজ ।
এতেক সমাজ মাঝে নৃত্য কর কুল লাজে
ত্রিভুবনে রহিল খাঁখার ।।

* * * * *

এমত ডাকিনী তুমি এবে সে জানিল আমি
পাইল বিষম মনস্তাপ ।
আছিলাম চম্পাপুরী এথা কেনে বিদ্যাধরী
কান্দিয়া মরিবে মাও বাপ ।। (পৃ:-৩১৪)

এর সঙেগ তন্ত্রবিভূতির লখিন্দরের ভাষণ (পূর্বে উদধৃত পৃঃ- ১৩৮) তুলনীয়। নব পরিণীতা পত্নীর প্রতি জেগে ওঠা স্বামীর প্রেম সম্ভাষণ তথা শাসনের ভঙগী দেখে অবাক হতে হয়। কেমন করে চম্পাপুরী থেকে এখানে এলো সে প্রশ্ন লখাই নিশ্চয়ই করতে পারে। কিন্তু না জেনে শুনে ''কুলে লাগাইলি কালি'', ''নৃত্য কর কুল লাজে'', আর ত্রিভুবনে রহিল খাঁখার'' -- প্রভৃতি কথাগুলি মদগর্বী শাসকের শাসিতের প্রতি কটূক্তি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

দেবলোকে লখাই শুনে এসেছেন, তার স্ত্রী ছয় মাস ধ'রে তার মৃতদেহ নিয়ে জলে ভেসে ভেসে এসেছে পথের সব বিপদ অতিক্রম ক'রে। ফিরে আসার পর আবার স্বামিত্বের অভিমান জেগে উঠেছে লখাইয়ের কন্ঠে --

একলা বিদ্যাধরী কেমতে সাহস করি
গেলা তুমি চম্পলা নগর।
চম্পলার দুষ্টলোক একা না দেখিয়া তোক
কেহ কিছু বলিল উত্তর।।
* * * * *
প্রভাতে গেলেন সতী সন্ধ্যা হৈল রূপবতী
আজি তোর মতি হৈল ভিন্ন।
শুনিয়া চম্পলা লোকে কি বোলিবে তোকে মোকে
বালা হৈল স্ত্রীর অধীন।। (পৃঃ- ৩৪৫)

মাত্র একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একা ছিল বলে এই কটূক্তি অত্যন্ত অশোভন। স্ত্রী তার অধীন একটি জড়পিন্ড মাত্র — সে কয়েক ঘন্টা তার কাছ থেকে দূরে আলাদা থাকলে অপবিত্র হয়ে যাবে। মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় এটাই নারীর স্থান।

(জ) পদ্মাপুরাণ — নারায়ণ দেব —(১৬১৫) সপ্তদশ শতকের শেষভাগ।

নারায়ণ দেবকে মনসামঙ্গলের সর্বপ্রধান কবিরূপে অভ্যর্থিত করা চলে — এঁর রচিত মনসা মঙ্গলের নাম 'পদ্মাপুরাণ'। পান্ডিত্য সহজ কবিত্ব ও সূক্ষ্ম রসবোধ এঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। কাব্যপাঠে মনে হয় সংস্কৃতেও এঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। চাঁদের পৌরুষ, বেহুলার পাতিব্রত্য এবং মনসার ক্রুরতা — সবই এঁর রচনায় সুন্দর ফুটে উঠেছে।

নারায়ণ দেব ও মনসা মঙ্গলের অন্যান্য কবিদের কাব্যে মনসা অত্যন্ত হীন স্বভাব সম্পন্না। নিজের পূজা প্রচারের জন্য নারায়ণ দেবের মনসা অনেক হীন কার্যে হস্তক্ষেপ করেছেন। তবু তাঁর কাব্যে তৎকালীন সমাজের সুন্দর প্রতিচ্ছবি রয়েছে। দেশের সংস্কৃতি ও ইতিহাস খুঁজতে হলে সে দেশের দুর্গম পল্লী অঞ্চলের কুটীরে, মন্দির গাত্রে, শিল্পকলা ও

কাব্যের ভিতরে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। কবি কাব্য রচনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গতঃএমন অনেক কথা বলতে থাকেন যার মধ্যে আমরা দেশের লুপ্ত ইতিহাস ও গুপ্ত কথা গৌরবের সন্ধান পাই। এই হিসেবে নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ কাব্যখানির মূল্য অনেক। অবশ্য দেবী মনসার, এই জাতীয় বর্ণনা দেবতার প্রকৃত চরিত্র অপেক্ষা এদেশ বাসীর নৈতিক অবনতিই সূচিত করে বলে আমাদের মনে হয়েছে।

কাব্যটি করুণরস প্রধান।

বেহুলা ও লখিন্দরের বিয়ের আয়োজন চলছে। এসময় দেবী নেতার পরামর্শে নাগবাহিনী নিয়ে লখিন্দরের মাথার উপর ছত্র ধারণ করালেন। সহসা লখিন্দর মাথার উপর কাল সাপ দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এ সময়ে বেহুলার আর্তনাদ খুবই মর্মান্তিক।

শূন্য হৈল ঘর শূন্য হৈল মাস।
বাহুড়িয়া না জাইব জিবন নইরাস।।
না দেখিম বাপ ভাই অন্ধকার রাতি।
অগ্নিকুন্ডে প্রবেসিব গলায় দিয়া কাতি।।
তবেত সুন্দরী বামা নাম পাড়াইমু।
ধর্ম্মদড়ি দিয়া মামি পদ্যারে মানিমু।।
পদ্যারে মানিয়া আমী কর্ম্মে সিদ্ধী করিব। (পৃঃ-৩৭)

লখিন্দরকে বাসর ঘরে সর্পদ্বারা দংশন করাতে এই চিন্তায় দেবী

অন্যমনা। দেবী কালিনাগের কাছে গিয়ে নিজের জীবনের দুঃখের বর্ণনা করেছেন। ——

আমার জতেক দুখ　　কহিতে বিদরে বুক
সুনহ কালি হইয়া সাবধান।
মাও নাহি বাপ হর　　দুষ্ট সতাইর ঘর
একচক্ষু করিয়াছে কান ।।

*　　*　　*　　*

পাপের কর্ম্মের ফলে　　মুনি ছাড়ি গেল ছলে
একরাত্রি না কৈলাস বসতি।　　(পৃঃ- ৬৮)

পুরুষ সমাজের স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বৈরাচারের ফলে নারী জীবনে যে ব্যর্থতা নিপীড়ন ও অসহ্য যন্ত্রণার বোঝা চেপেছে তার জন্য ক্ষমতাসীন সমাজপতিকে বা প্রচলিত শাস্ত্র বিধিকে দায়ী করা যাবে না, কৈফিয়ৎ তলব করা যাবে না। তারজন্য সৃষ্টি হয়েছে পাপবোধ, পূর্বজন্মের কর্মফল ইত্যাদির সংস্কার। তাই মানবী দেবী মনসা তার ব্যর্থতার কারণ স্বরূপ নিজের পাপের কথাই ভেবেছেন, জরৎকারু বা শিবকে দায়ী করতে পারেন নি। তাই সর্পদংশনে স্বামী লখিন্দরের মৃত্যুতে বিহুলা বেহুলা কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন —

আমি হেন অভাগিনী নাহি ক্ষিতিতলে।
অকালেতে রাড়ি হৈনু খণ্ড ব্রত ফলে ।।

*　　*　　*　　*

লখাই কোলে লইয়া বেউলা কান্দে
পাপ কর্ম্মের ভাগে　　তোরে খাইল কালনাগে
প্রাণ গেল সসুরের বিবাদে ।　(পৃঃ- ৭৯)

মধ্যযুগের কবিদের লেখনীতে যে কাব্যের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তাতে কাহিনীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ঘটনাই দৈবনির্ধারিত । ধর্মানুশাসিত সমাজের কাছে ধর্মের প্রভাব অধিকতর হওয়াই স্বাভাবিক ।

কি বোল বুলিব আমি নারিগণের মেলে ।
আপনার কর্মদোস, কি বুলিব কারে ।　(পৃঃ- ৮১)

লখিন্দরের শিয়রের কাছে বসে বেহুলা কাঁদছেন । বিধির বিধান জেনেও বেহুলা নিজের কর্মকেই দায়ী করছেন । কবি নারায়ণ দেব পুরাণ ঘেঁষা কবি ছিলেন । তার অর্থ মনসার লৌকিক কাহিনীর চেয়ে পুরাণাশ্রিত কাহিনী অংশের প্রতি তার অধিক আকর্ষণ ছিল এবং তিনি তাকে গুরুত্ব দিয়েছেন । সনকা চরিত্রটি একান্ত ভাবেই দৈবনির্ভরশীল অসহায়া নারী চরিত্র। পুত্রের মৃত্যুতে শোক বিহ্বলা সনকা বলছেন —

সাপ দিয়া বিধাতারে করো ভস্মরাশি ।
বিধাতারে কি বুলিব, মুই কর্মদুসি ।।　(পৃঃ- ৮৪)

পুত্রের মৃত্যুতেও বিধাতাকে দোষী করছেন, বলছেন, তার কর্ম-দোষেই এই সর্বনাশ ঘটেছে । কখনও আবার পুত্রবধূকেই দোষী সাব্যস্ত

করে তিরস্কার করছেন — তিরস্কারের ভাষা এক 'উচু কপালী, চিকন দাতী' ইত্যাদি। বেহুলা অবশ্য প্রতিবাদ করেছে — তবে প্রতিবাদের ভাষাও এক।

আমারে রাক্ষসি বউলান বোল তুমি কিসে।
আর জে ছয় পুত্র মৈল সেহ কি আমার দোষে ।।

বেহুলা তার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে —

করিলাম অনেক পাপ বিধি দিল বড় তাপ
জাইব আমি সাগরে ভাসিয়া ।। (পৃঃ-৮৮)

গ্রামের অন্যান্য নারীদের উক্তি প্রণিধান যোগ্য। বেহুলার বিরুদ্ধে তাদের মন্তব্যগুলি উল্লেখযোগ্য — এগুলির মধ্যে 'অভাগিনী' কথাটি না হয় বোঝা গেল। কিন্তু 'কুল' কলঙ্কিনী' ও 'পাপকপাল' কথা দুটোর কি তাৎপর্য বোঝা গেল না। নারীদের সম্পর্কে কথা বলতে গেলেই কুল নিয়ে টানাটানি করেছে, কলঙ্কের কালি নিয়ে মাখামাখিও করছে। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার — সে যুগে রূপবতী নারী দেখলে সম্ভোগ চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই মনে জাগতো না। গোদার ঘাট অতিক্রম করার সময়ে গোদা বলছে —

আমা হেন সুন্দর বর পাইবা কথা গেলে।
আমার সনে নেউটীয়া তুমি আইস ঘরে ।।
তোর রূপে তেজিব ঘরের চাইর নারি।
রত্ন - অলঙ্কার দিব দুই হস্ত ভরি ।। (পৃঃ-৯৮)

* * * *

আমার ঘরে আসিয়া কর নানা সুখ ।
সকলি পাসরিবা তুমি মরা স্বামীর দুখ -   (পৃ:-৯৯)

গোদার কথায় একটি বড় আশ্বাস ছিল । বেহুলা যদি তার ঘরে যায় তবে 'ঘরের চাইর নারীকেও সে ত্যাগ করবে । তাহলে আরও চার স্ত্রী তার ছিল । কিন্তু সে জানতো না যে বেহুলা এইসব জঘন্য মানসিকতার বহু উর্দ্ধে । বেহুলার ভেলা ধনামনার ঘাটে উপস্থিত হলো । ধনামনাকে ডেকে বললো —

ধনা বোলে মোনা ভাই নৌকা রাখ দেখি ।
জিজ্ঞাতা মনুষ্য হেন অভিপ্রায় লেখি ।।
* * * *
যদি আজ্ঞা কর কন্যা আমি লইঞা জাই ।।
আমাকে না দিয়া কন্যা তুমি নিতে আশা ।
* * * *

পরম সুন্দরী   জলে ভাসে একেশ্বরী
দেখি ধনা পড়ি গেল ভোলে ।   (পৃ:-১০৫)
এক রমণী লাগি   দুহে মিলি নৌকা লইয়া
বিবাদ বাঝিলেক জলে ।।   (পৃ:-১০৬)

* * *

আমি তোর জেষ্ঠ ভাই   কন্যা লইয়া আমি জাই
তুমি কেনে নিতে চাও বলে ।।   (পৃ:-১০৬)

তৎকালীন সমাজে এই হল নারীদের আসন ও নিরাপত্তার রূপ । পথে পাওয়া ধন — যার শক্তি অধিক সেই অধিকার করবে । এহেন বিপদে শুধু দৈবের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায়ই নেই । বিভিন্ন সঙ্কটের মধ্য দিয়ে বেহুলা কৈলাস পর্বতে উপস্থিত হলে , নেতা ধোপানীর পরামর্শে বেহুলা দেব সভায় যাবার অনুমতি পেলেন । শিবের আদেশে দেব সভায় বেহুলার নৃত্য পরিবেশনের আয়োজন চলতে থাকে ।

এদিকে নারদ মুনির চক্রান্তে দেবী চণ্ডী বেহুলার আগমন বার্তা শুনে ঈর্ষ্যান্বিতা হলেন এবং সিংহবাহনে সেখানে এসে বেহুলার চরিত্র নিয়ে কটূক্তি করলেন । মনসাকে দেব-সভায় আনার আগেই চলে গিয়েছিলেন কার্ত্তিক, গণেশ ও নারদমুনি । দেব-সভায় শিব মনসাকে লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে বললেন , মনসা তার উত্তরে বললেন —

কোন দিন উহার যামার পরিচয় নাহী ।
হেন অপবাদ কথা কহে তোমার ঠাকুরী ।।
নগরিয়া , বৈদভূলি দুষ্ট পাপ বেটী ।
খেদাইব এথাহনে নাক চুল কাটী ।।
মাথা মুড়াইয়া পুনি পাঠাইয়া দিব দেসে ।
লোকে দেখিয়া জেন রাত্রী দিব হাসে ।। (পৃ:-১৩০)

মনসা শুধু হিংসা পরায়ণা নন — এই উক্তিতে তার নীচ অন্ত:-করণের পরিচয় ও ফুটে উঠেছে । অবশ্য কাব্যে এই দেবী মানবী রূপেই

চিত্রিতা হয়েছেন ।

চণ্ডী ও মনসার বাদানুবাদ শুনে মহেশ্বর বেহুলাকে প্রমাণ স্বরূপ উদাহরণ দেখাতে বললেন — বেহুলা উপযুক্ত নিদর্শন দেখালেন — পদ্মাবতী শির অবনত করলেন । তখন বেহুলার পূর্ব পরিচয় জ্ঞাত হয়ে শিব বলে উঠলেন —

জিয়াইব লখিন্দর   পাঠাইয়া দিব ঘর
তব সদয় হইয়া য়ামী ।।   (পৃ:- ১৩০)

বেহুলা বললেন —

জে ডাল বউলা ধরে   সেহি ডাল ভাঙ্গি পড়ে
বেউলার কি পাপ কপাল ।।
ভুবন পালক তুমি   তোমাকে কি বুঝাব য়ামী
দেখিতে দেখ সব ভাল ।   (পৃ:- ১৩৩ - ১৩৪)

কিন্তু কামাতুর শিব বেহুলার রূপে মুগ্ধ হয়েছেন, তাকে আরও বলেন —

সিবে বোলে সসিমুখি   তার রূপ জৌবন দেখি
হৃদয়ে ফুটিল কামসর ।
চঞ্চল হইল চিত্ত   কাম হইল ব্যাপীত
সরির করিল জর্জর ।।   (পৃ:- ১৩৪)

দেবাদিদেব শিবের এই চরিত্র চিত্রনে কবির কলম কাঁপলো না। কারণ সমাজে নারী কেবল ভোগ্য পণ্য দ্রব্যের পর্যায় ভুক্ত বলেই বিবেচিত হত। পুরুষ চরিত্রগুলির বেশির ভাগই তো চিত্রিত হয়েছে নারীদেহলোলুপ - রূপে। কাজেই এমন চিত্র বিস্ময়কর নয়। বেহুলার শত উপরোধে — অনুরোধে শিব মনসাকে লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে বললেন। পদ্মাবতী নিজের নাগবাহিনী নিয়ে যমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত হলে যুদ্ধে যম - রাজের সেনাবাহিনী পরাজিত হল।

কিন্তু নারী দেবতার কাছে পুরুষ দেবতা পরাজিত হয়েছেন এই বার্তা ত্রিভুবনে প্রচারিত হলে অপযশ — সুতরাং তাকে হারাতেই হবে। দ্বিতীয়বার যুদ্ধ হল। এই যুদ্ধেও যমরাজ পরাজিত হয়ে নাগপাশে বন্দী হলেন।

এবার সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে বেহুলা জীবিত স্বামী সহ স্বদেশে যাত্রা করলেন।

হিংসা পরায়ণা দেবীর অত্যাচারী চরিত্র কবি এই কাব্যে অঙ্কিত করেছেন। নারী হিসেবেই হোক্ আর দেবী হিসেবেই হোক্ — নারী হৃদয়ের কোমল ভাবটি এখানে অদৃশ্য। চন্দ্রধরের স্ত্রী সোনেকাও যেন অতি সাধারণ বুদ্ধিহীনা এবং দৈব নির্ভরশীলা রমণী।

দুর্লভ শক্তির অধিকারিণী এই বেহুলা তার দৃঢ়সঙ্কল্পের কোন ব্যাখ্যা নেই। বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি স্বামী, ছয় ভাসুর ও চৌদ্দ ডিঙা ফিরে পেলেন। কিন্তু সামাজিক বিধানে তিনি এখনও গ্রহণ যোগ্যা নন — চাঁদ সদাগর তার পরীক্ষার আয়োজন করলেন। তার মধ্যে একটি পরীক্ষা —

বান্ধি চারি হাত পায়   সাগরে হাটিয়া জায়
ভাসে বেউলা জলের উপর ।।
সুক্ষ পাটের গৌণ ছান্দি   চারি হাত পাও বান্দি
নায়ে বেউলা সায়রের ঘরে। (পৃঃ- ২৮৭)

বহু সাধ্য সাধনার পর নারায়ণ দেবের চাঁদ সদাগর সনকার অনুরোধে মনসার পূজা করলেন। সদাগরের সাত পুত্র ফিরে এলেন।

এখানে আমরা 'মনসামঙ্গল' কাব্যের পালাটির সমাপ্তি ঘোষণা শুনলে কাব্যরসাস্বাদনে বঞ্চিত হতাম না। কিন্তু পৌরাণিক প্রভাব ও সামাজিক সংস্কারাবদ্ধ কবিমন তৎকালীন সমাজের নারী নির্যাতনের পরবর্তী অঙ্কটি যোজনা না করে পারলেন না।

আমরা বেহুলার সতীত্বের পরীক্ষার কথা বলছিলাম। স্বয়ং দেবী মনসা বললেন — 'পুত্রবধূ লইয়া যাও আপনার ঘরে' (পৃঃ- ২৮৫)। পুত্রবধূর সতীত্ব সম্পর্কে এই তো সব চেয়ে বড় 'সারটিফিকেট'। স্বয়ং শ্বশ্রূমাতা

সতীত্বের পরীক্ষা দিতে আগ্রহী , এতো প্রতিহিংসাপরায়ণা শ্বশ্রূ মাতার নারী বিদ্বেষ নয় — এ হচ্ছে তৎকালীন সমাজ ব্যবহারেরই প্রতিফলন ।

আমরা মনে করি এই সব পরীক্ষার নামান্তর 'প্রহসন' বিমুখ চাঁদ-সদাগরের মনসা পূজাতেই এই কাব্যের যথার্থ সমাপ্তি ।

(ঝ) **শিবায়ন —রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র (রায়)— সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগ।**

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে কবি রামকৃষ্ণ যখন তাঁর 'শিবায়ন' নামক সুবৃহৎ কাব্যখানি রচনা করেন তখন মঙ্গলকাব্য রচনার ধারা এর সৃজনযুগ অতিক্রম করে ঐশ্বর্যযুগে প্রবেশ করছে । তখন পর্যন্ত চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্বের প্রভাব সমাজের উপর থেকে দূর হয়ে যায়নি । সমাজের নৈতিকদৃঢ়তা তখন পর্যন্তও সুদৃঢ় ছিল । এই পরিবেশে কবি রামকৃষ্ণ তাঁর শিবায়ন কাব্য রচনা করেন । তাঁর কাব্য বাঙলার সামাজিক ইতি - হাসের এক গৌরবোজ্জ্বল যুগে রচিত হয় তাঁর গ্রন্থে এর প্রমাণ রয়েছে । কিন্তু একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে , মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের

ইতিহাসে কবি রামকৃষ্ণের রচনা একটি বিচ্ছিন্ন কীর্তি। কাব্যটি যেমন পূর্ববর্তী কোন ধারা অনুসরণ করতে পারেনি, তেমনি পরবর্তী কোনও ধারারও দিক নির্দেশ করতে পারেনি। কাব্যটি কবির আত্মকেন্দ্রিক জ্ঞান সাধনার ফল। কবি সমাজগত রুচি ও রসবোধকেই তাঁর কাব্যরচনার মূলে নিয়োজিত করেছিলেন। মানসিক প্রবণতা ও রুচি অনুসারে কবি পৌরাণিক অংশের উপর বেশী জোর দিয়েছেন। তা থেকে অনুমান করা যায় যে, আর্যেতর অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত আদি বঙ্গবাসীদের সমাজ তখন মূলত: কৃষিনির্ভর ছিল। সেই দূরাপসৃত অতীতের কৃষক সমাজে যে ধরণের কৃষি দেবতার পরিকল্পনা হয়েছিল, বহু শতাব্দী পরেও তার ক্ষীণ ধ্বংসাবশেষ এদেশে বজায় ছিল। কবি যুগের রুচি ও রসবোধের ধারাকে তাঁর কাব্য রচনার ভিত্তি করে নিয়েছিলেন।

দক্ষালয়ে সতী স্বামীর অনুমতি ছাড়াই উপস্থিত হয়েছেন। সতী বিনা নিমন্ত্রণেই যজ্ঞে এসেছেন। অভিমানিনী সতী মাতা পিতার দেওয়া 'পট্টবস্ত্র কাঞ্চনের অষ্ট অলঙ্কারকে' উপেক্ষা করে বলছেন —

সতী বলে তুমি মোর জন্মদাতা বাপ।
যত কথা কহ বাপা সকলি প্রলাপ।।
প্রিয় কন্যা আমি যদি হই স্নেহ পাত্রী।
আমারে বিস্মৃতি কেন হইলা জনয়িত্রী।।
আমি আইলে ভাল যদি হেন জান চিত্তে।
কেন না আনিলে আমা স্বামীর সহিতে।।

আহ্বান করিলে যত জামাতা দুহিতা ।
কি কারণে আমি ইথে হইলাঙ বঞ্চিতা ।।
ভৃগু আদি আছেন যতেক ব্রহ্মঋষি ।
বল দেখি সবে আমি কোন দোষে দোষী ।। (পৃঃ- ৫৩)

এক্ষেত্রে কবি চন্ডীকে মানবী রূপেই অঙ্কন করেছেন । নারী মনের স্বতঃস্ফূর্ত অভিযোগটি ফোটাতে কবি বেশ নিপুণতাও দেখিয়েছেন । নিমন্ত্রণ না করবার কারণও দেবী জিজ্ঞাসা করলেন এবং নারীর স্বভাবজাত ধর্মানুসারে দেবী কাঁদতেও শুরু করলেন ।

দক্ষের মুখে শিবনিন্দা শুনে —

সত্যবতী দিল দুই শ্রবণে অঙ্গুলি ।।
না বল না বল বাপা বিরূপ ঈশানে ।
*   *   *   *
কন্যাদান করিয়া বিচার কর দোষ ।
উচিত না ছিল এত করিতে আক্রোশ ।।
*   *   *   *
এত যদি জান আমা কেন দিলে বিভা ।   (পৃঃ- ৫৪)

এর উত্তরে দক্ষ বললেন —

দক্ষ বলে পূর্ব্বে ইহা না কৈল মীমাংসা ।
বিরিঞ্চির মুখে শুনি শিবের প্রসংসা ।।

*　　*　　*　　*

তোমা বিভা দিতে পিতামহ দিল আজ্ঞা ।।

ললাটের লিখন আমার দোষ নহে ।　　　(পৃ:- ৫৫)

দেবী চরিত্র অঙ্কন করতে কবি সমাজের নারী মনকেই দেবীত্বে আরোপ করেছেন । কাজেই এই চিত্র দেখে অনুমান করা যায় যে — সমাজে নারী অবহেলিতা ছিলেন । পিতা কন্যার বিবাহ দেবেন পাত্র যাচাই না করে । তারপর কন্যার বিপদে বা অসন্তুষ্টিতে দৈবের লিখন বলে যুক্তি দাঁড় করাবেন । পিতামহ আদেশ দিয়েছেন , অতএব পাত্র যাই হউক না কেন পিতামহের আজ্ঞা পালন করতেই হবে । এই বিধান সমাজে নারীর স্থানকেও বুঝিয়ে দেয় । যে যুগে বসে কবি দেবীর এরূপ স্থান নির্ণয় করছেন তা সে যুগের সাধারণ নারীদের স্থানই নির্দেশ করে । দেবীর ব্যক্তিগত অস্তিত্ব ও মতামতের বিশেষ কোন মূল্য না দিয়েই পিতার ইচ্ছানুসারে বিয়ে ঠিক করলেন । বিয়েও দিলেন । তারপর পিতা হয়ে কন্যার স্বামীর নিন্দা পঞ্চমুখে করলেন । দেবীতো এক্ষেত্রে নিতান্তই খেলার পুতুল । দেবীর নিজস্ব কোন মতামত, পছন্দ, থাকতে পারে পিতা তা বিচার করলেন না । এর চেয়ে নারীর অস্তিত্বের অবমাননাকর উদাহরণ আর কিছু থাকতে পারেনা।

পিতৃবাক্য শ্রবণ করে 'ক্রোধেতে জ্বলিল অগ্নি ভবানীর দেহে ।' অত:পর সতী দেহত্যাগ করলেন । তনু ত্যাগ করে অবশ্য সতী তার সতীত্বের পরীক্ষায় জয়ী হয়েছিলেন ।

হিমালয় গৃহে শিব উপস্হিত হয়ে —

প্রকাশ করিল হর গৌরী কার ঝি।
কন্যাদান কর মাতা আর দান কি ।। (পৃ:-১০১)

মেনকা নানা প্রকার ভিক্ষাদান করে শিবকে বিদায় করতে চাইলেন। কিন্তু শিব এসব কিছুই গ্রহণ করতে চান না। মেনকা তাই —

কাঁদেন মেনকা মোরে কি হইল জঞ্জাল ।।
তপোবন উপবন ভূমি নাত্রি মাগে।
হেন কথা কহে যে শুনিতে ত্রাস লাগে ।।
ভালই আছিলুঁ উমা যখন ছাওয়াল।
যৌবন শরীর রূপ মোরে হৈল কাল ।।
*   *   *   *
না জানি প্রসন্ন হর হয় কত কালে।
কি জানি লিখিল বিধি গৌরীর কপালে ।। (পৃ:-১০১)

মেনকা চিরাচরিত সুরে আক্ষেপ করছেন। ভিখারী শিবের নিকট তিনি কন্যাদান করবেন না। তিনি দৈবনির্ভরশীলা নারী রূপেই চিত্রিত হয়েছেন। মেনকার আক্ষেপ শুনে গিরিরাজ শিবকে পাটশালে বন্দী করে রাখলেন। পিতার একাজ দেখে পার্বতী সঙ্কোচ ভাবে বলছেন —

আমার কারণ প্রভু পাও এত ক্লেশ।
মোর অপরাধ ইথে নাহিক বিশেষ ।। (পৃ:- ১০২)

পার্বতীকে পাইবার জন্য শিবের এ অবস্থা — এ স্বীকারোক্তি পার্বতীর রয়েছে তবে এ অবস্থার জন্য তিনি দায়ী নন — একথা আবার কারণ দেখিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। দেবীকে আত্মসচেতন বলেই মনে হচ্ছে।

কাব্যটির 'চণ্ডীর ক্রোধ' অংশে (পৃ:-১৭১) পার্বতীকে কলহপ্রিয়া, সন্দেহ প্রবণা নারীরূপে অঙ্কিত দেখতে পাই। পদ্মিনীকে দেখে দেবী অকারণ ক্রোধে উন্মত্তা। তিনি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে দেবাদিদেব মহা - দেবকে বলছেন —

পদ্মিনী পাইয়া তুমি পড়িয়াছ ভোলে।
প্রত্যয় না ছিল পাট পড়শীর বোলে।।
এখনে দেখিল চক্ষে তেঞি পতি আই।
বিড়ম্বনা কেন মোরে করহ গোসাঞি।।
শুনিল তোমার মুখে ব্রহ্মার চরিত্র।
অন্যের কলঙ্ক কহ আপুনি পবিত্র।।
এতদিনে ব্যক্ত হৈল তোমার তপস্যা।
সাজির ভিতরে কেন সুন্দরী ষোড়শ্যা।। (পৃ:-১৮০)

দেবীকে বিচার বুদ্ধিহীনা নারী বলেই মনে হয়। ত্রিদেশ পতি মনসার পরিচয় ব্যক্ত করলেও তিনি যুক্তি দিয়ে বোঝবার বা বিচার করবার চেষ্টা করলেন না। বিনা বিচারে বিনা দ্বিধায় নানা রূপ কুৎসিত উক্তি করলেন এবং মনসাকে শাস্তি ও দিলেন।

দেবী শিবের গৃহের দারিদ্র দোষ দেখে অভিযোগের সুরে বলেন —

যাঞা তোমার বৃত্তি   স্ত্রীর কর অপকীর্তি
এ নহে তোমার যোগ্যকথা ।
স্ত্রী নিন্দা যে বা করে   লক্ষ্মী নাহি রহে ঘরে
সংসার বাসনা তার বৃথা ।।   (পৃ:- ২৩৭)

সংসার বাসনায় দেবী স্ত্রী জাতির মূল্যকে বেশ উঁচু কণ্ঠে ঘোষণা করলেন । অন্যদিকে দেবীকেও নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বেশ সচেতন বলেই মনে হয় ।

দেবী জটার ভিতরে নারীর রূপ দেখতে পেয়ে বলছেন —

স্ত্রী হৈয়া গুপ্ত বেশে   থাকে পুরুষের কেশে
জানিলাও গঙগার সতীত্ব ।।   (পৃ:- ২৩৮)

*   *   *   *

প্রভুহে , ইবে হৈলে কপট প্রকট ।
তেঞি দেখি নিতে নিত   স্নান হয় কদাচিত
আলু য়াইয়া না শুখাও জট ।।   (পৃ:- ২৩৮)

দেবী গঙগার সতীত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করছেন । উপরন্তু শিবকেও দোষ দিচ্ছেন । নারীমনের স্বত:স্ফূর্ত হিংসা ও সন্দেহ প্রবণতাকে কবি এক্ষেত্রে বেশ নিপুণ ভাবেই অঙকন করেছেন । দেবীর আচরণ এক্ষেত্রে

বাঙালী ঘরের নারীর আচরণ রূপেই ফুটে উঠেছে ।

শিবের সাথে দেবীর কোন্দল শুরু হয়েছে । নারদমুনি তা দেখে দোকাঠি বাজিয়ে হাসছেন । ঋদিধ, রম্ভা, মেথা তা শুনে সেখানে এসে উপস্হিত হয়েছেন । পরিস্হিতি দেখে গঙগা লজ্জা পেলেন । এতক্ষণ গঙগা অনেক ধৈর্য ধরে সহ্য করেছেন । অবশেষে তিনিও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পার্বতীকে বললেন –

আমি দ্বিচারিণী দুর্গা তুমি বড় সতী ।।
আমার সাক্ষাতে আর না বল বাখান কুল ।
কল্পে কল্পে জানি আমি তোমার আদ্যমূল ।। (পৃ:-২৩৯)

দেবী চন্ডী গঙগার উক্তিতে আরও ক্রোধে উন্মত্তা হয়ে বলছেন –

কি বা জান কহ কেন কর অনুরোধ ।।
কল্পে কল্পে জান তুমি আমি মহামায়া ।
* * * *
লোকমুখে শুনি তুমি সমুদ্র মহিষী ।
কেহ কেহ বলে স্বামী শান্তনু ঋষি ।।
পূর্ব্বে সত্যলোকে এক মহারাজা দেখি ।
ব্রহ্মার সাক্ষাতে তুমি হৈলে গর্ভবতী ।
কাঞ্চন প্রসব হইলে কার্ত্তিক সংহতি ।।

কারো মুখে শুনি ইবে ভজ বিশ্বনাথে ।
তাহার লক্ষণ এই দেখিল সাক্ষাতে ।।
স্বামীর নাহিক নৈত্য চঞ্চল চরিত্র ।
আসিয়া আমার ঘর করিলে পবিত্র ।। (পৃ:- ২৩৯)

পার্বতীর এই উক্তি শুনে বাহু নাড়া দিয়ে দেবসভাকে সাক্ষী করে গঙ্গা দেবী বলছেন —

শুনিহ শুনিহ সভে উমার উত্তর ।
আমি কুচি কই এই সভার ভিতর ।।
ভিন্ন মূর্ত্তি দেখি আজি ভিন্নই বন্ধান ।
অভিপ্রায় বুঝি আজি হইলা মধুপান ।।
আমি প্রতিকূলা নারী তুমি কূলবধূ ।
যক্ষের পাড়ায় নিত্য পান কর মধু ।।
অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি হরের ভাণ্ডার ।
তাহার গৃহিনী হৈয়া, নিত্য কর ধার ।।
ছাওয়াল করিয়া কাঁখে দিয়া হাত নাড়া ।
রূপ দেখাইয়া তুমি বুল পাড়া পাড়া ।।
আদ্য কথায় জাতিনাশ লোকে করে গদ্য ।
তোমার পূজায় চাহি রক্ত মাংস মদ্য ।।
আমি যত কর্ম্ম করি ব্রহ্মার আদেশে ।
স্ত্রী রূপে ভজ দুর্গা সকল পুরুষে ।। (পৃ:- ২৩৯ - ২৪০)

এর উত্তরে দেবী পার্বতী বলছেন —

শুন গঙগা দেশে দেশে যত মরে মড়া ।
তোমার গর্ভেতে যত জাতি যায় পোড়া ।।
তোমার কূলেতে ডাকে কাক চিল শিবা ।
পূতিগন্ধে প্রীতি তোমার জাতি আছে কিবা ।।
অস্হি মাংস কেশে তোমার পরিপূর্ণ পঙক ।
শিশুঘাতী করিয়াছে তোমার কলঙক ।।
পাপিষ্ঠ গরিষ্ঠ কি বা সজ্জন দুর্জন ।
তোমার জলেতে কে বা না করে মার্জ্জন ।।
পাতক পাখালে লোক তোমার সলিলে ।
শুদ্ধ তুমি শুদ্ধ হৈয়া যাও হর পরশিলে ।।
কোন বা পুরুষ নাহি তোমারে পরশে ।
নদী রূপে কেলি কর মনের মানসে ।। (পৃঃ- ২৪০)

পার্বতীর উত্তরে গঙগার মনের ক্ষোভ আরও বেড়ে গেল । তিনি আরও বললেন —

আমার গোচর গো তোমার যত কলা ।
কালিকা রূপেতে তুমি পর মুণ্ডমালা ।।
করেতে কর্পূর কাতি হও দিগম্বরী ।
ইবে লজ্জাশীলা হইলে রাজার কুমারী ।।
মড়াএ চড়িয়া নাট মশানে মাতনি ।

পরনিন্দা কেন কর আপনা না জানি ।।
রক্তপানে লোলজিহ্বা কালিকা খ্যাতি ।
আমি জাত্যে নাহি দুর্গা তোমার বড় জাতি ।।
আমার মহিমা তুমি কহিলে আপুনি ।
আমার শরণ লৈয়া মুক্ত হয় প্রাণী ।।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে নিবসে যত লোক ।
আমা পরশিয়া পরিহরে দুঃখ শোক ।। (পৃঃ- ২৪০)

কবি দেবীগণকে মানবীরূপে এঁকেছেন । উভয়েই বাঙালী ঘরের সাধারণ নারীর ন্যায় আচরণ করছেন । দুজনেই কলহে রত । দুজনার উক্তি -প্রত্যুক্তির মাধ্যমে নারী মনের স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তাধারাকে কবি ফুটিয়ে তুলছেন । তাদের স্বভাবজাত ধর্ম কলহ । এর মাধ্যমে উভয়েই নিজের অস্তিত্বের মূল্যকে বেশ যাচাই করে নিচ্ছেন । কেউ কারো থেকে কম নয় ।

পরস্পর কলহ করে অবশেষে পার্বতী গমনের উদ্যোগ করছেন । পার্বতী গঙ্গাকে আরও বলছেন —

গঙ্গা তোমার চরিত্র জানি বর্জিল শান্তনু মুনি
তবু তোমার নাহিক তিতিক্ষা ।
পরিবর্ত্ত হৈল মনু শান্তনু নাহিক তনু
কোন্ সুখে প্রাণ কর রক্ষা ।। (পৃঃ- ২৪০)

গঙগা উত্তরে বলছেন –

গঙগা বলে শুন গৌরি   তুমি কতকাল নারী
দিন দশ হইয়াছে বিভা ।।
অধীন করিলে শিবে   অন্যে না ভজিতে দিবে ।
মুখের সুখেতে বল কিবা ।।
শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্য   দুহাঁ সনে করি সত্য
হাতাহাতি করিলে সংগ্রাম ।।
পর পুরুষের অঙগ   কর নাহি পরিষ্বঙগ
আমি সব জানি গুনগ্রাম ।।   (পৃঃ-২৪১)

সতীনের জ্বালায় পার্বতী জর্জরিতা । তিনি কিছুতেই মনের এ জ্বালাকে সংবরণ করতে পারছেন না । ভবানী এরপর অভিমানি নী হয়ে কার্তিক ও গণেশকে নিয়ে পিত্রালয়ে যেতে উদ্যত হলেন । এক্ষেত্রে কবি অতি নিপুণ হস্তে নারীমনের কথাকে প্রকাশ করে পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করেছেন ।

দেবদেবীর উপাখ্যান রচনা করতে গিয়ে মধ্যযুগের কবিগণ তাঁদের সমকালীন সমাজ ভাবনার ও সমাজ দর্শনের চিত্র এঁকেছেন । কোথাও দেবতারা অপরিসীম ক্ষমতাশালী জন্য মানবের উপর তাদের নির্যাতনের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে । কোথাও সে চিত্রের অভাব দেখা গেলে কেবল দেবতাদের কাহিনীই রচিত হয়েছে । কিন্তু সেই দেবদেবীদের সংসার জীবন যাপন প্রনালীতে সমসাময়িক সমাজ জীবনেরই প্রতিফলন ঘটেছে ।

কাজেই দেবদেবীদের সংসার জীবনের কাহিনীকে তৎকালীন সমাজ জীবনের মানব মানবীর কাহিনী বলেই ধরে নেওয়া যায় ।

বহু বিবাহ প্রথা চালু ছিল এটা বোঝা যায় শিবের কয়েকজন স্ত্রীকে দেখে । এই প্রথা চালু ছিল বলেই সংসারে কোন শান্তি ছিল না । দেবাদিদেব শিব গঙ্গাকে বিয়ে করেছেন । এজন্য পার্বতী বা চন্ডী বা কালিকা-দেবীরা শিবকে ভাল চোখে দেখেন না । আর শিবকে সেজন্য গঙ্গাকে জটার মধ্যে লুকিয়ে রাখতে হয় । স্বামীকে যে শ্রদ্ধার চোখে দেখা দরকার সে শ্রদ্ধার কোন চিহ্ন আমরা এসব কাব্যে দেখি না । কারণ শিব যখন কন্যা মনসাকে নিয়ে এলেন ঘরে তখন শিব চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করে মনসা যে শিবের অপর এক স্ত্রী হতে এসেছে বা তাদের একজন সতীনের সংখ্যা বাড়ছে এটা বুঝতে পারেন । আর সেজন্য মনসা বা পদ্মার কোন যুক্তিতেই তাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারেন না । শিবের অনুপস্থিতিতে পদ্মার উপর দুই সতীনে যে দৈহিক নির্যাতন করলেন তা তৎকালীন সমাজে নারীর মর্যাদার আসন ছিল না জন্যই সম্ভব হয়েছে । নারী মাত্রই ভোগ্য পণ্য দ্রব্যের মত ছিল । আর পদ্মাও শিবের ভোগ্যা হয়েই এসেছে এ ধারণা থেকেই এসেছে এ নির্যাতন । পদ্মাও নারী । তারও ব্যক্তিত্ব থাকার কথা । কিন্তু সেটা ফুটেনি এক্ষেত্রে । কারণ নারীর প্রতি নারীও সম্মান দিতে জানত না । সবাই ভাবতো সবাইকে অংশীদার রূপে ।

কাব্যটির'ঊষার শোক' অংশে ঊষাকে ক্রন্দনে রত দেখতে পাই ।

কারণ ভগবতীর বরে স্বপ্নে নাথের সাথে মিলিত হয়েও ছিলেন। নিশিশেষে সেই বিলাসী নায়ক নিদ্রিত অবস্থায় বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। জাগ্রত অবস্থায় প্রাণনাথকে না পাওয়ায় ঊষা ক্রন্দন করে বলছেন —

বরদিয়া আমারে বঞ্চিল ভগবতী।
আমি কন্যা হতভাগ্য পাপী খণ্ডব্রতী।।
*　　*　　*　　*
কহিবার কথা নহে জনক দুরন্ত।
তেকারণে চিন্তিলাঙ আপনার অন্ত।।
তাহা বিনে পিতা যদি চিন্তে অন্য বর।
অগ্নি কুণ্ড সাজিয়া তেজিব কলেবর।।　　(পৃ:-২৭৬)

ঊষা নিজেকে পাপী, খণ্ডব্রতী বলে মনে করছেন। পিতার কঠোর শাস্তির কথা ভেবে চিন্তিতও হচ্ছেন। উপরন্তু অগ্নিকুণ্ড সাজিয়ে দেহ-ত্যাগের সংকল্পও নিচ্ছেন। নারীমনের এই ধরণের মানসিক চিন্তাধারার উদাহরণ মধ্যযুগের কবিদের লেখনীতে যত্রতত্র রয়েছে। পরিস্থিতির কারণ বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সেকালের নারী অসমর্থা। কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েই আত্মত্যাগের সংকল্প নারীমনের স্বত:স্ফূর্ত দুর্বলতাকেই প্রকাশ করে। স্বপ্নের দোষেই তিনি নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করছেন। বাস্তবে এর কি মূল্য তার বিচার কখনই করছেন না।

পার্বতী ও গঙ্গার কলহ কথাগুলিতে নিম্নমানের নারী চরিত্র চিত্রিত

হয়েছে। গঙগার পাপ তাপ হারিণী পবিত্র সলিলাচরিত্রকে সপত্নীর দৃষ্টিতে চরিত্র হীনতার রূপ পরিগ্রহ করেছে। নৃমুণ্ডমালিনী দিগবসনা কালিকা রূপী চণ্ডীকেও শুনতে হয়েছে চরিত্র হীনতার খোটা। শিব কিন্তু এই কলহের নীরব শ্রোতা বা দর্শকমাত্র। নারদতো ততোধিক। অর্থাৎ নারীর দেহ-দান করা ছাড়া স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম, মাতৃত্ব ইত্যাদি দেবার যে ক্ষমতা আছে মধ্যযুগের সাহিত্যের এইসব অংশে তার কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। একটা পুরুষকে অবলম্বন করে দুইটি নারী যেভাবে একে অপরকে বহুভাবে বহু পুরুষ ভোগকারিণী রূপে চিত্রিত করেছে তাতো কবি মনেরই কথা। গঙগাকে পার্বতী বলছেন —

''কোন বা পুরুষ নাহি তো মারে পরশে,
নদীরূপে কেলি কর মনের মানসে।''

পার্বতীকেও গঙগা অনুরূপ গাল দিয়েছেন —

''আমি যত কর্মকরি ব্রহ্মার আদেশে
স্ত্রী রূপে ভজ দুর্গা সকল পুরুষে।''

— এতে প্রমাণ হয়ে যায় যে নারীর কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না। একে অপরকে যেভাবে নিন্দাবাদ করছেন তারদ্বারা তারা পুরুষের মনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারছেন না। তাদের ভাবনা চিন্তা মতামতের উপর সমাজ জীবনের গতি প্রগতি কিছুই নির্ভরশীল নয়। নারীদের জগৎটা সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। তারা তাদের নিজেদের মধ্যেই বাদ-বিসম্বাদ

করত — আর সে বাদ - বিসম্বাদ কেবল পুরুষের জন্য নিজ নিজ দেহকে আর্য্য সাজাবার সীমার বন্ধনেই বন্দী ছিল । নাগরিকত্বের যে আধুনিক চেতনা তার মানদণ্ডে নারী কোন শ্রেণীতেই পড়েনা ।

(ঙ) সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী — আখ্যানকাব্য — দৌলতকাজী
(সপ্তদশ শতাব্দী)

নরনারীর প্রণয়কে উপলক্ষ্য করে মধ্যযুগে যে সব আখ্যানকাব্য গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান পেতে পারে দৌলতকাজী রচিত 'সতী - ময়না ও লোরচন্দ্রানী'। দৌলতকাজী ছিলেন মধ্যযুগের কবি — চট্টগ্রামের সুলতানপুরে তাঁর জন্ম । অল্পবয়সেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কৃতী হয়ে আরা- কান রাজ থিরি-থু, ধর্মার (শ্রীসুধর্মার) রাজসভার আশ্রয় লাভ করেন । ইনি আরাকান রাজের সমর সচিব আশরফ খানের পৃষ্টপোষকতায় হিন্দু - কাব্য অবলম্বনে 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্যটির রচনা শুরু করেন — কিন্তু কাব্যটি শেষ করে' যেতে পারেন নি । কবির মৃত্যুর পর বিখ্যাত কবি সৈয়দ আলাওল বাকী অংশ সমাপ্ত করেন ।

এ যুগের কাব্যের পৃষ্টপোষকতা করতেন রাজা-বাদ্‌শারা। লোরচন্দ্রানী কাব্যের আলোচনায় একটি কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন — যে একাব্যে সাধারণ মানুষের চরিত্র অনুপস্থিত। কারণ, কাব্যটি রোমান্স ধরণের, আমরা একাব্যে ভিন্ন রুচির সঙ্গে পরিচিত হই। লোর তার নিজের পত্নী ময়নাকে ত্যাগ করে বিবাহ করলেন চন্দ্রানী সুন্দরীকে। চন্দ্রানী ছিল এক বামন নপুংসকের স্ত্রী — লোর তার স্বামীকে হত্যা করে' চন্দ্রানীকে গ্রহণ করলেন।

এরপর কাব্যখানি একদিকে ময়নার একানুরক্তি ও সেই অনুরাগের কেন্দ্রমণি তার স্বামী লোরের বিরহ যন্ত্রণা আর একদিকে অতৃপ্ত যৌবনা চন্দ্রানীর যৌবন তৃপ্তি জনিত সুখের সঙ্গে হিন্দু আদর্শ নারীর দ্বিচারিণীত্বের দ্বন্দ্ব অপূর্বভাবে চিত্রিত হয়েছে। এই চিত্রে শক্তির স্বেচ্ছাচারিতা প্রকটিত হয়েছে। আবার স্বামী পরিত্যক্তা অসহায়া নারীর আর্তনাদে ডুবে গেছে কাব্যদেহ। লোর যদি চন্দ্রানীকে অপহরণ না করতো তাহলে তার জীবন হাহাকারে ভরে যেতো। তার স্বামী ছিল বামন ও নপুংসক। নরনারীর সম্মিলিত জীবনে সুস্থ যৌন জীবন যাপনের চাহিদার অতৃপ্তিতে ভরে উঠতো চন্দ্রানীর জীবন। অপহৃতা হলেও সমাজের নির্যাতন চন্দ্রানীকে স্পর্শ করেনি। পরন্তু ময়না এক অসহায় নির্যাতিত জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছে সামাজিক নিয়ম নীতির যূপকাষ্ঠে।

লোর রাজপুত্র এবং স্বয়ং রাজাও বটে। ময়না ও চন্দ্রানী রাজকন্যা।

নায়ক যুবক এবং নায়িকা যুবতী । লোরের সঙ্গীরাও যুবক , অন্যদের হাতে রাজ্যভার দিয়ে এই যুবকদের নিয়ে লোর বনবিহারে মত্ত । অন্যদিকে নায়িকা চন্দ্রানীকে সঙ্গদান করে তার সঙ্গীরা , তাছাড়া নায়িকাকে পরামর্শ ও সাহায্য দানের জন্য বিচক্ষণ ধাত্রীও রয়েছে একজন । এরা আবার প্রেমরোগের ব্যবস্থাদিও জানতো ।

একটি মালিনী চরিত্রও আছে । মালিনী তার ভূমিকা পালনে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তৎপর ছিল । প্রেমের ষড়যন্ত্রে এ নারীর ভূমিকাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

কাব্যটির 'বনবিহার' অংশে বিহারে মত্ত স্বামীর বিচ্ছেদে ময়না - বতী বিলাপ করছে ।

আহা মোর পতি প্রাণের পোত্তলী
বিনোদ লোর রাজ্যেশ্বর ।
সময় বসন্ত যৌবনকালে কান্ত
এড়ি যায় দিগন্তর ।।
পুরুষ ভ্রমর কঠিন কলেবর
অন্তরে বাহিরে কালী ।
যাবৎ মত্তমতি পুরি মন: প্রীতি
আর পুষ্পে করে কেলি ।।

*　　*　　*　　*

কেমনে স্ত্রীজনা　　　ধরিব আপনা
পুরুষ নিষ্ঠুর জাতি ।।　　(পৃ:-৫৬)

কাব্যটির প্রথমেই দেখা যায়, ময়নাবতী শূন্য হৃদয়ে নিজের পতির জন্য আনমনা। একে যৌবন, তার উপর আবার বসন্তকাল, এ হেন সময়ে নানা গুণে বিশারদ লোরকনৃপতি তার পতিব্রতা নারীকে ত্যাগ করে বিহারে মত্ত। এই অবস্থাতেই এই বিরহখিন্না নারীর আর্তনাদ আমরা শুনতে পাচ্ছি।

এ ধরণের চরিত্রাঙ্কণ অবশ্যই ধর্মানুশাসিত ও প্রথাসিদ্ধ। এই বিলাপে স্বামীর প্রতি ময়নাবতীর কোন অভিযোগ নেই।

মধ্যযুগীয় সামন্তদের লোভ লালসার কথা মনে রাখলে এ কাব্যের নায়ক সম্পর্কে কোন মোহ থাকে না। কাব্যটিতে যে পরকীয়া প্রেমের চিত্র দেখতে পাই — তা একান্ত ভাবেই দরবারী প্রেম। এই ঘটনার মধ্যে সামন্তরাজার শক্তির পরিচয় থাকলেও সুরুচির কোন ছাপ নেই। নায়ক লোরকরাজ গোহারী রাজ্যের মোহরা রাজার কন্যা চন্দ্রানীর সঙ্গে প্রেম-বিলাসে মত্ত। এইতো মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের মূল্যায়ন। এক রাণী নির্জনে আত্মবিলাপে দিনাতিপাত করেন — আর তারই পতির সঙ্গে বিয়ে হল চন্দ্রানীর।

যে স্বামী প্রবেশ করলো ঘরে তার কাছ থেকে কোন উল্লাসসূচক উত্তর না পেয়ে চন্দ্রানী বলে' উঠলো —

বৃথা মোর আশা অভিলাষ ।
নবরূপ করি বিধি   পাষাণ নির্মিত যদি
তথাপি পাইতুম রসহাস ।।

*   *   *

এতেক চিন্তিয়া বামা   ছাড়িয়া সঙ্গতি সীমা
করে কর হানয় আক্রোশে ।   (পৃ:- ৬৭)

পরক্ষণেই দেখতে পাই চন্দ্রানী ধাইয়ের কথা শুনে' সখীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করছে ।

পতির আশায় রাত জেগে বসে আছে সে । মাঝে মাঝে বাতাস ভরে উঠছে দীর্ঘশ্বাসে । অবশেষে রাত্রিশেষে শয্যায় শয়ন করলো চন্দ্রানী । এ চরিত্র একান্ত ভাবে দৈব নির্ভরশীলা — এই একই ছাঁচে মধ্যযুগের মানুষ-গুলির সৃষ্টি হয়েছে — সাহিত্যে আমরা দেখি তারই প্রতিফলন ।

চন্দ্রানী মনে মনে স্থির করেছে, একাকিনী জীবন কাটিয়ে দেবে — রাজকুমারী তাই রাজমহিষীকে বলছে তার জন্য এক মন্দির তৈরী করে দিতে — তার বক্তব্য —

'মূর্খ স্বামী সংগে ক্রিয়া সহস্র জঞ্জাল ।।'   (পৃ:- ৬৮)

এখানে চন্দ্রানীর কণ্ঠে আধুনিক রমণীর সুর গোপনে ঝংকৃত হল বলা চলে। লোক সাহিত্যের 'জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতী' পালার চন্দ্রাবতীও এমনি করেই বিরহের জ্বালা সইতে না পেরে দেব - আরাধনার জন্য পিতাকে বলেছিল মন্দির তৈরী করে দিতে। তবে একথাও বুঝতে হবে যে এদের আরা - ধনা — আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর। আসলে এই নারী তো রক্ত- মাংস পিণ্ডের জড় পদার্থ মাত্র। নারীর যে নিজস্ব একটা সত্তা আছে, বিকল্প পথের সন্ধানে সে যে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে এবং সে যে নারী হিসেবে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে একথা সে ভাবতেও পারলো না। মেঘনাদবধ কাব্যের বীরাঙ্গনা প্রমীলা চরিত্রের সেই স্বতস্ফূর্ততা এখানে অপ্রত্যাশিত। প্রমীলা মন্দির তৈরী করতে বলেনি, নিজেই সে যুদ্ধ যাত্রা করতে চেয়েছে — বলেছে —

'আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ?'

চন্দ্রানীর অন্তঃপুরে লোর বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছেন এমন সময় সংবাদ এল খর্বকেতু (চন্দ্রানীর বামন নপুংসক স্বামী) সেই নগরে এসেছে। চন্দ্রানীর মনে ভীতির সঞ্চার হলো। সে জানে নিষ্ঠুর সমাজ বিধান তার কৃতকার্যের জন্য বিকৃত প্রশ্ন তুলে তাকে নির্যাতন করবে — রমণী সমাজে সে নিন্দিতা হবে। চন্দ্রানী লোরকে বলে —

বাপে মায় শুনিলেহ তেজিব গৌরব।
লোক- দোষ শুনিলেহ করিব পরাভব।।
সেই ভাল তুমি আমি যাই দেশান্তর।

এড়াইমু বামন ক্রোধ কলঙক দুস্তর ।।   (পৃ:-৮৮)

চন্দ্রানী চতুরা । গোপনে প্রিয়তমের এই মিলন সম্ভোগ বেশী দিন চলবে না, সে বুঝতে পেরেছে । তাই সে ভীত হয়ে পলায়নের প্রস্তাব করেছে । এর পাশাপাশি চিত্র —

নিজ রাজ্যে ময়নাবতী   দেব ধর্ম্ম পূজে নিতি
স্বামী বর মাগে সর্ব্বকাল । (পৃ:-১০৯)

কিন্তু এই ধর্মানুশাসিত সমাজ কি চেষ্টা করেছে ময়নার জীবনের দু:খকে মুছে দিয়ে তাকে সুখী করতে ? বরং তার বিপরীত চিত্রই এই কাব্যে দেখতে পাই । পতিপ্রেমের একনিষ্ঠতা যাতে বিঘ্নিত না হয় তার জন্য কত চেষ্টা । ময়নার নিষ্ঠার নিশান প্রোথিত হয়েছে বটে, কিন্তু এর আড়ালে তার উজ্জ্বল দেহটি ঢাকা পড়ে গেছে । ময়না বলেছে —

এক এক করি মুই দিমু নিজ প্রাণ ।
জগতে দোসর নাম না লইমু আন ।।
*   *   *   *
দীন ভাগ্য ফিরিলে সুহৃদ হয় বৈরী ।
বিধি বক্র হৈলে কার শক্তির নিবারি ।। (পৃ:-১১৩)

— ময়নাও শেষ পর্যন্ত বিধির দোহাই দিচ্ছে । সখীরা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রতীক্ষা করতে বলছে । কিন্তু 'জামাতা বিরস' অর্থাৎ

উদাসীন। এই উদাসীনতা নারীর দিক থেকে নির্মম অপরাধ। অথচ মোহরা নৃপতি বিবিধ মঙগল বিধানের মধ্যদিয়ে শূরবংশের ধনুদর্ধর বীর অবতার বামনের সঙেগ চন্দ্রানীর বিবাহ দিয়েছিলেন। এই বামনের সঙেগ রাত্রি যাপনকালে চন্দ্রানী বলছে —

আপনে আপনে কন্যা করয়ে বিলাপ।
কাহাতে কইমু মুই মনের সন্তাপ।।
কোন বিধি পূর্ব্বজন্মে দিল মোরে শাপ।
কিবা উপনীত হৈল কর্মফল পাপ।।
হাহা বিধি কি কহিমু কারে দিমু দোষ।
মোর কর্মফলে পতি খর্ব্ব কাপুরুষ।। (পৃ:-৬৩)

এখানে চন্দ্রানীও বিধাতাকে কিংবা তার পূর্ব্বজন্মের কর্মফলকে তার বর্তমান জীবনের দুর্ভোগের জন্য দায়ী করেছে।

কিন্তু লোরকে তো সে নিজে পছন্দ করেই বিয়ে করেছে তবে সে সুখী হতে পারলো না কেন? মূল অপরাধ লোরকের নাইট চরিত্রে। লোরক মধ্যযুগীয় নাইট নারীবর্জ্জিত বনবাস জীবনে যোগীর কাছে সুন্দরী নারীর চিত্র দর্শন — এবং প্রচন্ড কৌতূহল বশত: তার উদ্দেশ্যে যাত্রা — দড়ির মইয়ের সাহায্যে প্রণয়িনীর সঙেগ নিভৃত মিলন এবং সেই পথেই নায়িকার অপহরণ - পথে বামনের অনুসরণ এবং যুদ্ধ ও বামন সংহার — সবই এক নাইটের চরিত্রকে প্রতিফলিত করে। নাইটের চরিত্রে এও একটি প্রধান

বৈশিষ্ট্য যে সে করায়ত্ত সম্পদের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে — ভাবে — এতো আমারই, যখন খুশি ভোগ করা চলবে। এইভাবে সে অনায়ত্ত সম্পদের পিছনে ধাবমান হয়। চন্দ্রানীও সর্বথা নাইট ধর্মে দীক্ষিতা। সে নিজেই যোগীর ছদ্মবেশধারী লোরকের সঙ্গে চাক্ষুষ মিলনের সুযোগ করে' দিয়েছেন — চন্দ্রানী পিতামাতার সস্নেহে সান্নিধ্যে অন্ত:পুর বাসিনী হলেও প্রেম-চঞ্চলা। তার বীর স্বামী মৃগয়াসক্ত, পত্নীর প্রতি অবহেলা, সর্বক্ষণ তাঁর ধনুক নিয়ে যুদ্ধ বা শিকারে মত্ততা তার স্বভাব সিদ্ধ। অতৃপ্ত যৌবনা চন্দ্রানী পতি নির্বাচনে সে যাচাই ক'রে নিয়েই লোরকের কাছে আত্মসমর্পন করেছে। সুতরাং উদ্ধৃত অংশে যে বিধাতার উপর বা প্রাক্তন কর্মফলের উপর দোষ চাপান হয়েছে তা যুক্তিহীন। আসলে সে মধ্যযুগীয় সামন্ত - লালসাবহ্নির পতঙ্গ মাত্র। অন্তরঙ্গ পরিচয়ে সে, সে যুগের অন্যান্য রমণীর মতই দৈবনির্ভরশীলা।

এই কাব্যেরই 'চন্দ্রানীর সঙ্গে বামনের রাত্রিযাপন' অংশে চন্দ্রানীর মা বলেছেন —

> ভার্যা বিনু পাটেত না শোভে নরপতি।
> স্ত্রী বিনে পুরুষের কোথাতে বসতি।। (পৃ:- ৬৪)

রাজমহিষীর কথায় বোঝা যায়, সুপুরুষ সুকামিনীর কোলেই শোভা পায়, উভয়েরই মূল্য সমান হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভূমি ভিত্তিক অভিজাত - তন্ত্রের প্রভুদের মনোরঞ্জনের জন্যই হয়তো মধ্যযুগের কবিরা রাজমহিষীর

মুখ দিয়ে এ ধরণের উক্তির উল্লেখ করেছেন ।

কবি এক বিবাহ প্রথাকেই জানিয়েছেন অকুণ্ঠ সমর্থন । এখানে অবশ্য মধ্যযুগীয় জীবন ব্যবস্থার প্রতি তার অনাস্থা ও প্রতিবাদকে মূর্ত করে প্রগতিশীল ও আধুনিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন । শিল্পীর দায়িত্ব হয়তো তিনি পালন করেছেন , কিন্তু এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি নারী মহিমার কথা যেভাবে প্রকাশ করেছেন তাতে নারীরা হয়েছে অবহেলিত । জীবনকে ভালবাসার, ভোগ করার উল্লোল উল্লাসে ভেসে যাওয়ার মধ্য দিয়ে নারী জীবনের মর্মান্তিক ঘটনা এখানে বিবৃত হয়েছে —

নিজ রাজ্যে ময়নাবতী দেবধর্ম্ম পূজে নিতি
স্বামী বর মাগে সর্বকাল ।

* ** *

ভাগ্যবতী ময়নারাণী সত্যের প্রতিষ্ঠা শুনি
প্রশংসেন্ত সকল জগত । (পৃ:-১০১)

ময়নাবতী বিলাপের সুরে বলছে —

এক এক করি মুই দিমু নিজ প্রাণ ।
জগতে দোসর নাম না লইমু আন ।। (পৃ:-১১৩)

এখানে ময়নাবতীর বক্তব্য — জগতে যা কিছু ঘটে সব বিধাতার চক্রান্তে । এই চরিত্রের নিজস্ব কোন সত্তা নেই — সব কিছুকে সে বিধির

বিধান বলে মেনে নিয়েছে। সর্বান্তঃকরণে স্বেচ্ছায় ময়নাবতী এই আত্ম - ত্যাগকে মেনে নিয়ে থাকলে বিধাতার উপরে দোষারোপ বেমানান।

কাব্যটির দ্বিতীয়ভাগে কবি সতীনারীর পতিভক্তি বারমাস্যার মধ্য দিয়ে বর্ণনা করেছেন — এ বর্ণনায় মালিনী নামে একটি চরিত্র রয়েছে — সে আবার ময়নার সতীত্বে ঘুণ ধরাতে ব্যস্ত। কিন্তু তার সে চেষ্টা সফল হয়নি।

বিধি রক্ষা করে যারে বঙক নহে কেশ অগ্রে
তার ছায়া না লঙ্ঘে সংসারে।
বিপরীত বায়ু, বলে সত্যঘট নাহি টলে
সতীত্বকে টলাইতে নারে।। (পৃঃ-১১২)

এই সতীত্বের জয়গান কবির কাব্যে আছে বটে কিন্তু নারী মনের সূক্ষ্ম মূল্যায়ন নেই।

লোরকরাজ সুন্দরী ও গুণবতী ময়নাকে পত্নীরূপে পেয়েছিল — কিন্তু তার রোমান্টিক মনে পূর্ণ তৃপ্তি ছিল না। ঈপ্সিত চন্দ্রানী যখন অধিগত হলো তখন তার মনের চিন্তা — যা পেয়েছি তা নয়, যা পেতে পারি তার জন্যই দুর্গমের পথে অভিযান চাই। এই অভিযাত্রায় আছে দুঃখ, কষ্ট, অনিশ্চয়তার উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা, সংঘর্ষ ও যুদ্ধ।

এই দিক দিয়ে 'সতীময়না' কাব্যটি অনন্য। মধ্যযুগের সাহিত্যে তো আগাগোড়া ভক্তিবাদ আর দেবতার কথায় ভরা। সেখানে এই কাব্য — গতানুগতিকতার অভ্যস্ত পথ থেকে দূরে সরে এসে বলেছে মানুষের কল্পনা ও স্বপ্নের কথা — মানুষের বাস্তব সুখদু:খের কথা। যেন আমরা নিরুদ্ধ নিরাকাশ এক কক্ষের বাইরে এসে দাঁড়ালাম মুক্ত আকাশের তলে যেখানে আকাশে বাতাসে অক্সিজেনের স্বস্তি যেখানে নিশ্বাসও সহজতর। ময়নাবতীর একনিষ্ঠ সতীত্ব দেখে সমাজ তার জয়ধ্বনি করেছে। কিন্তু সমাজ তার দু:খ লাঘবের চেষ্টা করেনি — একথা আমরা আগেই বলেছি। তারপরে আমরা দেখতে পাই, ময়নাবতী লোররাজের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। যে নারী লোর ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের নাম উচ্চারণ করতে দ্বিধাবোধ করে সেই নারীই আবার বিধাতাকে দোষা-রোপ করে পতিপ্রেমের একনিষ্ঠ সাধিকা হিসেবে সে স্বামীকে কাছে পাবার জন্য কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছে না — কখনও চন্দ্রানীর প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করছে, কখনও বা বিধাতার উপর দোষারোপ করছে — অথচ যে স্বামীর বিরহে সে দিন কাটাচ্ছে সে-ই' যে তার দ.:খের মূল — একথা সে একবারও ভেবে দেখার চেষ্টা করছে না। আসলে নারীরা পুরুষ সৃষ্ট সমাজের সকল বিষয়কেই বিনা বিচারে মেনে নিতে অভ্যস্ত ছিল। লোর-রাজ তার দেহ মন হরণ করেছে। তার মুখে উচ্চারিত হয় একমাত্র অদ্ভুত সান্ত্বনার বাণী — '' যদি বিধি সে বন্ধু মিলায়।''(পৃ:-১২৬)
বিধি তার লোরকে চন্দ্রানীর প্রেমে নিমজ্জিত করেছে সুতরাং বিধিই এর বিধান করবেন অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেবেন। এদিকে

বিরহানলে অবিরাম দগ্ধ হয়েও সে বলে —

সতী নামে যমুনাবতী জগতে রাখিমু খ্যাতি

মরণে তো মুক্ত স্বর্গদ্বার ।। (পৃ:-১২৭)

সতীত্বের নামে এত বড় আত্মপ্রবঞ্চনার কথা আর কি থাকতে পারে? যমুনার এইরূপ চিন্তাধারা পুরাণাশ্রিত ।

যমুনাবতীর মত কত রমনীর দীর্ঘশ্বাসে মধ্যযুগের আকাশ বাতাস ব্যথিত হয়ে আছে । কিন্তু তাতে সামন্ত রাজাদের সিংহাসন টলেনি । প্রেমের প্রশস্তি এতে থাকলেও ব্যভিচারী প্রেমের কাছে তা নতি স্বীকার করেছে । দাম্পত্য প্রেমকে উপেক্ষা করে একাব্য প্রধানত: পরকীয়া প্রেমকে সমর্থন করেছে। একটি নারীর মন সমাজের স্বেচ্ছাচারী পুরুষের নিতান্তই খেলার পুতুল হয়ে দাঁড়িয়েছে । অনেকাংশে সমকালীন কবিদের মধ্যে দৌলতকাজী আধুনিক মনোভাবের পরিচয় দিলেও চরিত্রাঙ্কণের ক্ষেত্রে তার স্পষ্ট লক্ষণ দেখিনা । নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য এখানে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি ।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' , বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' নারী-দের যে ভূমিকা রয়েছে ও পরকীয়া প্রেমের যে উল্লেখ রয়েছে তার তুলনায় একাব্যের নারী চরিত্রের পার্থক্য রয়েছে । পদাবলীর পরকীয়ার সঙ্গেও রোমান্সের পরকীয়ার অনেক পার্থক্য । লোর যেভাবে চন্দ্রানীকে তার স্বামীর অগোচরে অপহরণ ক'রে নিয়েছে তার সামাজিক স্বীকৃতি কখনই থাকতে পারে না । কাব্যটির কাহিনী বিশ্লেষণে দেখা যায় সমাজে

মেয়েরা ছিল পুরুষদের নিতান্তই কামনা ও লালসার উপকরণ ঠিক যেন 'পুরুষ-যমের' লালসা - ক্ষুধার খাদ্য। সতীময়না বলেছে —

যবে ইহলোকে না মিলে লোরকে
পরলোকে হইব সঙ্গী। (পৃ:-১৩৫)

এ ধরণের উক্তিকে আমরা কিছুক্ষণ আগেই 'আত্মপ্রবঞ্চনা' বলেছি। সতীত্বপনার এই দৃষ্টান্ত নারী জীবনের জয়গান ঘোষণা করেনা। যে নারী নানাশাস্ত্রে পারদর্শিনী, যে নারী কথায় কথায় নীতিবাক্য ঘোষণা করে — সে নারী নিজের মঙ্গল বিধানে কেন তৎপর হতে পারে না তা আমাদের মনে প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যাবে — আসলে এই সতী প্রাচীন পুরাণ প্রদত্ত স্মৃতিকারদের নারী বিদ্বেষের সংস্কার মথিত মালা পরে আমাদের সামনে উপস্থিত — তার আড়ালে ব্যক্তি-পুরুষকে চেনা কঠিন।

দৌলতকাজী যে সময়ে কাব্যটি লিখেছেন -- তখন বাংলাদেশে মুসলমানেরা এসেছে। বাঙলায় মুসলিম আগমনের ঘটনার সঙ্গে বাঙলা - সাহিত্যে রোমান্সধর্মী কাব্য কাহিনী সৃষ্টির প্রসঙ্গ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যুদ্ধবিগ্রহ, লোভলালসা, পররাজ্যগ্রাস, ষড়যন্ত্র ও নির্মম অত্যাচার ছিল মধ্যযুগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এককথায়, একটি ভূমিভিত্তিক অভিজাততন্ত্রই ছিল মধ্যযুগে সর্বেসর্বা। জায়গীরদার, জমিদার ও লাখেরাজ সম্পত্তির অধিকারী ধর্মীয়

নেতারাই ছিলেন সুলতানের দরবারের সম্মানিত সদস্য। এদের পরামর্শ ও সহযোগিতা ছাড়া সেকালে কিছুই হবার যো ছিল না। এই সব মধ্যযুগীয় নেতাদের পৃষ্টপোষকতায় এবং নির্দেশে কাহিনী কাব্য রচিত হত — সুতরাং চরিত্রগুলিকে মনে হত বিভিন্ন ব্যবস্থার যূপকাষ্ঠে নির্মম বলিদান মাত্র।

দ্বিতীয়খন্ড 'ময়নার বিলাপ' অংশে ময়না দেবধর্ম পালন করছে — উদ্দেশ্য স্বামীর কল্যান। সমাজের বিশিষ্ট লোকেরা তখন ব্যভিচারে লিপ্ত আর তাদেরই নির্দেশে কাব্য রচিত হচ্ছে। তাই সমাজের নীতি-যুক্ত, ধর্মীয় প্রভাব যুক্ত বড় বড় কথা দিয়েই সাজানো হয়েছে নারী চরিত্রগুলি।

দৌলতকাজী কাব্য সমাপ্ত করেন নি। কবি আলাওল রচনা করেছেন পরবর্তী অংশ। নারী চরিত্রগুলিও একই আদর্শে রচিত হয়েছে।

(ট) শিবায়ন — রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য — অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগ।

শিবমঙ্গল কাহিনীর নানা পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদান মিশিয়ে অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য শিবায়ন বা শিবসংকীর্তন

নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। কাব্যদেহে কবির সংস্কৃত ভাষায় পান্ডিত্যের স্পর্শ পাওয়া যায় অনুপ্রাস সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করে। পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনায় কবির কাব্য আড়ষ্টতা দোষে দুষ্ট হয়েছে। কিন্তু শিবের লৌকিক কাহিনী রচনার ক্ষেত্রে কবির মৌলিকতা লক্ষ্য করা যায়।

পার্বতীর গৃহস্থালী বর্ণনায় কবি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রেখে-ছেন। এই গৃহস্থালীর বর্ণনায় যে চিত্রটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তা প্রকৃতপক্ষে একটি দারিদ্র্যপীড়িত ব্রাহ্মণ পরিবারের চিত্র বলে প্রতীয়-মান হয়। নিত্য অভাবগ্রস্থ এক ভিক্ষুকের পরিবারে দাম্পত্য কলহ লেগে থাকারই কথা। এই কলহকে হর-গৌরীর কোন্দল রূপে কবি প্রকাশ করেছেন।

পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত পার্বতী চিত্রটি বড় সুন্দর। পতিদেবতা ভোলানাথ — পারিবারিক সুখ দু:খে নির্বিকার। সন্তানদের ও স্বামীর ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য মাথা ব্যথা যেন স্ত্রীরই বেশি। অনটনের সংসারে শাক পাতা সংগ্রহ করে স্ত্রী ঠিকই ভিক্ষালব্ধ তন্ডুল কণা দিয়েই সকলকে তৃপ্ত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু পার্বতীর এক লজ্জা যে তার হাতে শাঁখা নেই। শাঁখা না থাকায় সে বাইরের লোকের সামনে হাত বার করতে পারেনা। এই সাধের কথা স্বামীকে পার্বতী অতি গোপনে বিনয় সহকারে নিবেদন করে। নিবেদনের ভাষার মধ্যে কোন কর্কশতা নেই। আছে আত্ম নিবেদিতা এক নারীর সোহাগ ভরা একটু আবদার —

'দুঃখিনীর হাতে শঙখ দেহ দুটি বাই ।
কৃপাকর কান্ত আর কিছু নাহি চাই ।।'

কিন্তু পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষের পৌরুষ পতিব্রতা নারীর মর্যাদা রক্ষার চেয়ে আপন পৌরুষ প্রকাশেই বেশি মত্ত । পারিবারিক সুখ দুঃখে নির্বিকার পুরুষের রসনার ধার থাকার কথা নয় । স্ত্রীর সংসার পরিচালনার দক্ষতার প্রতি শ্রদ্ধা থাকাই আধুনিক রুচিতে আমরা প্রত্যাশা করি । কিন্তু রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য যে নিখুঁত সমাজ চিত্রটি আমাদের সামনে তুলে ধরলেন তা প্রণিধান যোগ্য । ভোলানাথ তাঁর স্ত্রী পার্বতীর ঐ অমায়িক গোপন প্রার্থনার উত্তরে বলে উঠলেন --

ভিখারীর ভার্যা হয়ে ভূষণের সাধ ।
কেন অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ ।।
বাপ বটে বড়লোক বল গিয়া তারে ।
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে ।।

শাস্ত্রমতে গোত্রান্তরিতা নারীর স্বামীগৃহই একমাত্র আশ্রয় স্থল । এই শাস্ত্র নির্দেশ নারী নীরবে মেনেও নিয়েছে । বড়লোকের ঘরের মেয়ে হয়েও পার্বতী কিন্তু দারিদ্রকে, ভিখারীর ভার্যা হিসেবে মেনে নিয়েই পরম শান্তিতে স্বামীপুত্রের সেবা যত্নে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে লক্ষ্য করা যায় । এ হেন পতিব্রতা রমণীর সোহাগ ভরা একটি প্রার্থনার জবাবে

বাপের বাড়ীর খোঁটা শুনতে হচ্ছে। নারীকে তার অতি সামান্য মর্যাদা - টুকুও মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষেরা দেবার কোন প্রয়োজন বোধ করে নি। স্ত্রীকে 'জঞ্জাল' রূপে গণ্য করার মধ্যে যে কুরুচির পরিচয় আমরা পাই তা অত্যন্ত দুঃখজনক। আর এই চিত্রটিই আমরা সর্বত্র লক্ষ্য করেছি মধ্যযুগের কাব্য সমূহে।

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' কাব্যে দরিদ্র ও ভিখারী স্বামী রূপে চিত্রিত শিবের আরও কিছু আচরন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পতিদেবতা রুজি রোজগারে যেমনই হউন খাদ্যরুচিতে মহীয়ান ছিলেন। ঘরে কি আছে, কি নেই তার খোঁজ নেবার খুব বেশি প্রয়োজন বোধ করেন না। কিন্তু —

সরস ব্যঞ্জন বিনা খায় নাই অন্ন।
একটু কি মন্দ হৈলে মারে মতিচ্ছন্ন।। (পৃঃ-১০)

সরস ব্যঞ্জন একটু মন্দ হলে স্ত্রীর কপালে পতির প্রহার রয়েছে। শিব এখানে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন রাজকর্মচারীর সঙ্গে তুলনীয়। ক্ষমতার বলে যা খুশী করার অধিকার আছে যার সেইতো শিবের মত খেয়ালী। তার খেয়ালের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা তো কারো নেই। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীর দন্ড মুন্ডের কর্তা তো পুরুষ।

এই গ্রন্থের ৮৯১ থেকে ৯০১ পর্যন্ত পয়ার গুলিতে শ্বশুর বাড়ীতে বসবাস কালে শিবের আচরণের চিত্র চিত্রিত হয়েছে। নিত্যকোঁচিনী পাড়ায় গিয়ে

শিব বিবিধ রঙ্গে কোঁচিনী যুবতীদের যৌবন উপভোগ করেন। আর —

এমত যুবতীগণ পাইয়া চান্দ্রচূড়।
বেড়িয়া বিহার করে পরম নিগূঢ় ।।
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বায় যন্ত্র।
কেহ করতালি দেই সবে একতন্ত্র ।।
কোঁচিনী সকল হৈল কুসুম উদ্যান।
শঙ্কর ভ্রমর তায় মধু করে পান ।।
নিত্য নিত্য এই কীর্ত্তি করে কৃত্তিবাস।
দিনশেষে বিজ্ঞ বেশে ভিক্ষা অভিলাস। (পৃ:-৯৫)

গ্রন্থখানির ৯৫ পৃষ্টায় প্রদত্ত এই পংক্তিগুলিতে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে নারীদেহের লাবণ্য ও সৌষ্ঠব বর্ণনার রীতি। এতে কাব্যিক সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে নারী ও প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা অবশ্য কবিদের অন্যতম প্রেরণা ও বিষয়বস্তু। আর সেইজন্যই নারী আজও প্রসাধনরতা। এ প্রসাধন যখন নিজ পতির মনোরঞ্জনে নিযুক্ত থেকে স্থায়ি দাম্পত্য প্রেমকে চির নতুন ক'রে তুলে, আস্বাদন যোগ্য করে' তোলে, তখন একে আর সমালোচনার বিষয়বস্তু করা যাবে না। কিন্তু শিবকে দিয়ে এই যে ডোমিনীপাড়ার কোচিনী যুবতীদের যৌবন মধুপানের (ভ্রমর সদৃশ) দৃশ্য রচিত হয়েছে, এটা দেবতার লীলা বলেই আমরা এতকাল মেনে এসেছি — কিন্তু এ যে পুরুষের অবচেতন মনের পরনারীভোগ লিপ্সার চরিতার্থতার প্রকাশ একেও

অস্বীকার করা যাবে না। সুন্দরতর পুরুষ দেখলেই নারী নিজ পতি নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন এবং রাসলীলায় মেতে নিজেদের যৌবন দিয়ে সেই সুন্দর পুরুষদের কামনা চরিতার্থ করে নিজেকে ধন্য মনে করেন — এতে যে চিত্রটি ফুটে ওঠে তাতে নারীকে ভোগ্য পণ্য দ্রব্যের সামগ্রী ছাড়া আর কিছু ভাবা হ'ত না বলে মনে হয়। এই ভাবনাই মধ্যযুগের নারী চরিত্র চিত্রণের আঙিক হয়েছে — প্রতিটি কাব্যেই।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় 'পুংশ্চলী' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে সেই নারীর প্রতি যে নারীর চিত্ত পুরুষ দেখলেই দেহ দানের জন্য চঞ্চল হয়। মধ্য-যুগের কাব্যে বর্ণিত দেবাদিদেব শিব ও তার ভক্ত পুরুষেরা যখন নারী দেখলেই সে নারীদেহ ভোগের জন্য চঞ্চল হয় তখন তাদের 'স্ত্রীংশ্চল' শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা হয়নি কোন সংহিতায়। কারণ নারীর সংহিতা রচনার অধিকার মধ্যযুগ দেয় নি।

কোচিনী পাড়ায় কোচিনী যুবতী পুষ্পের মধুপান করে ভ্রমর শিব বিজ্ঞের বেশে ভিক্ষায় বেড়িয়ে পড়েন। এ যেন আধুনিক গীতি কবিতার 'ওরাই রাতের ভ্রমর হয়ে নিশিপদ্মের মধু যে খায়' — কলিটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

মঙ্গলকাব্যের নতুন ধারা — ধর্মমঙ্গল ।

মনসামঙ্গলকাব্যে মনসার মহিমা , চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চণ্ডীর মহিমা প্রচারিত হয়েছিল । এইভাবে ধর্মঠাকুরের মহিমা প্রচার করে মধ্যযুগে আর এক শ্রেণীর কাব্য রচিত হয়েছিল , তাদের নাম ধর্মমঙ্গলকাব্য । অবশ্য , মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের মত বাঙলার সমগ্র অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের পূজা ব্যাপক প্রসার লাভ করতে পারেনি ।

শৈব , শাক্ত , বৈষ্ণব ও বৌদ্ধধর্মের সমন্বয়ে ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায় উপনিষদের ব্রহ্ম, সাংখ্যের পুরুষ, তন্ত্রের শিব, বৈষ্ণবের বিষ্ণু-কৃষ্ণ-রাম , পুরাণের ধর্মরাজ যম এবং বুদ্ধ একসঙ্গে মিশে গেছেন । বিভিন্ন দেবতার সমন্বয়ে গঠিত হলেও ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি , বীরভূম , বাঁকুড়া , বর্ধমান , মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি রাঢ় অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ।

১) ধর্মমঙ্গল — ঘনরাম চক্রবর্তী — অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ (১৭১১)

কাহিনী বিশ্লেষণ —

অভিশপ্তা অপ্সরা অম্বুবতী বেনুরায়ের স্ত্রী মহরার গর্ভে স্থান নিয়ে

রঞ্জাবতী নাম নিয়ে নরলোকে জন্ম নিলেন । শুক্লপক্ষ শশীর মত দিনে দিনে বেড়ে উঠে যুবতী হলেন ।

গৌড়েশ্বরের কৃপাপুষ্ট সোমঘোষ গোয়ালা অজয় নদের তীরে উপনীত হলে রাজা কর্ণসেন রায় ছয় পুত্র সহ অগ্রসর হয়ে তাকে রাজ নির্দেশ মত গড়ের মধ্যে বসতি করার অধিকার দিলেন । সোম ঘোষের পুত্র ইছাই, যা ভবানীর বরে বলীয়ান হয়ে বিরাট গড় নির্মাণ করে তার নাম দিলেন ঢেকুর । সোমঘোষের পুত্রের এই বাড় বাড়ন্ত দেখে রায় কর্ণসেন প্রমাদ গুণলেন । রাজ দরবারে নালিশ জানালেন । যুদ্ধ হল । যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয় পুত্র মারা গেল। তাদের স্ত্রীরা সহমরণে গেলেন । কর্ণসেনের স্ত্রীও পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করলেন । এমতাবস্থায় কর্ণসেন বৈরাগীর দশা প্রাপ্ত হলেন । কিন্তু রাজা তাঁকে ডেকে প্রবোধ দিলেন । এই প্রবোধ বাক্য শ্রবণ করে কর্ণসেন বলছেন —

কর্ণসেন বলে হায় আর হবে নারী ।
আটকুড়া বুড়া তায় নাছের ভিখারী ।।
কন্যাকে ফেলিবে জলে হেন বরে দিয়া ।
ভূপতি বলেন ভায়া থাকহ বসিয়া ।। (পৃ:-৪৫)

রাজ্যহীন ছয় পুত্র ও পুত্রবধূ হারা স্ত্রী হারা বৃদ্ধ কর্ণসেন রায় বৈরাগ্য ছেড়ে গৃহী হবেন । সেজন্য তার জন্য নারী চাই । যার ছয়পুত্রকে বিবাহ দেওয়া হয়েছে এবং তারা কেউই নাবালক ছিলেন না সেই কর্ণসেন তখনও নারী নিয়ে গৃহী হ'তে চান । হলেনও । রঞ্জাবতী নিশ্চয়ই কর্ণ -

সেনের ষষ্ঠ পুত্রবধূর বয়সের ছোট না হলেও সমান হবেন । সেই রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিবাহ প্রস্তাব আনলেন গৌড়েশ্বর । গৌড়েশ্বর রঞ্জাবতীর ভগ্নিপতি । বোনের বাড়ী বেড়াতে এসে 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা' হবার সৌভাগ্য অর্জন করলেন ।

জামতি পালায় যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে হয়তো এটা নিতান্তই প্রথার অনুবর্তন । কিন্তু তার মধ্য দিয়ে নারী সম্বন্ধে সমাজের অধঃপতিত ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় । তারা যেন সুপুরুষ দেখলেই তার কাছে আত্মনিবেদনে উৎসুক । লাউসেনকে দেখা মাত্র জামাতির নারীকূল —

কাঁচা সোনা বরণ বদন পূর্ণশশী ।
দেখিয়া মোহিত হল যতেক রূপসী ।।
জলের গাগরী কাঁখে নাগরী সকল ।
মনোহর মূর্ত্তি দেখি মদনে পাগল ।।
কামবাণে সবার অন্তর জর জর ।
মদনে মজিল চিত্ত পাসরিল ঘর ।।
*   *   *   *
বলিতে বলিতে বাড়ে মদন তরঙ্গ ।
লাজ ত্যজি বলে কেহ যাই ওর সঙ্গ ।। (পৃঃ-২৫৭)

নারী যেন কেবল যৌন সম্ভোগ চেতনারই প্রতীক মাত্র । যে কোন সুন্দর পুরুষ দেখলেই তার সঙ্গে রতি সম্ভোগ বাসনা উদ্বেল হয়ে ওঠে ।

আর সেই সম্ভোগ বাসনায় এমনই জর্জরিত হয়ে পরে যে তার নিজের সংসার ভুলে যায়, এতকাল যে স্বামী নিয়ে সে ঘর করছে তার নিন্দায় এবং ঐ সুন্দর পুরুষের প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। কেবল তাইই নয় - অপরিচিত 'নাগরের' উপর সমস্ত যোগ্যতা আরোপ করে নিজ পুরুষকে হেয় মনে করার যে চিত্র শ্রী ধর্মমঙগলের 'জামতি পালায়', অন্নদা মঙগলের 'বিদ্যাসুন্দরের পালায়' লক্ষ্য করা যায় তাতে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে নারীকে সম্ভোগের যন্ত্র মাত্র মনে করা হত। আর নারীর মানসিকতাকেও কেবল পুরুষের উপভোগের জন্য সর্বক্ষণ নিজেকে ভাববার মতো করে চিত্রিত করা হয়েছে। নয়নী নাম্নী নারী নিজ স্বামী পুত্র থাকা সত্ত্বেও লাউসেনকে তার দেহভোগের জন্য পীড়াপীড়ি করেছে। লাউসেন রাজী না হলে নিজ পুত্রকে কূপে নিক্ষেপ করে হত্যা করে হত্যার দায় ভাগ লাউসেনের স্কন্ধে চাপিয়েছে।

নয়নীর আত্মনিবেদনের ভাষা —

রতিরঙগ অনঙগ আবেশে রবে সুখে।
আপনি সাঁজিয়া পান তুলে দিব মুখে।। (পৃ:-২৬৬)

আবার বন্দী লাউসেনকে নয়নী বলছে —

তখন নয়ানী নারী বলে আঁখিঠারি।
কথা রাখ এখনো ছাড়ায়ে দিতে পারি।।
বেটা মলো তোমার বালাই লয়ে গেল।
বঁধু হে ছাড়াই যদি নিকেতনে চল।। (পৃ:-২৬৭)

দেখা গেল ।

লাউসেনকে উপভোগ করার লালসা এবার সুরিক্ষা নটীর । কিন্তু লাউসেন কৌতুক করে সুরিক্ষার কাছে ভোজন করতে চেয়ে এমন অসম্ভব সর্ত দিলো তা পূরণ করে সুরিক্ষা লাউসেনকে ভোজন করাতে পারবে না । শ্যাওলা দিয়ে আগুন জ্বালাতে হবে , বালি দিয়ে উনুন বানাতে হবে , সূর্য উদয় হলে ভোজন হবে না ইত্যাদি সর্ত । অমনি সুরিক্ষা দেবীর সাধনায় বসে গেল । দেবী এলেন - বর দিলেন ।

শুনি কিঙ্করীর কথা হাসিয়া কহেন মাতা
ভয় ভাব কোন্ ছার ভারে ।
অশেষ আপদ খণ্ডি হাতে হাতে সঁপি চণ্ডী
দুই নায়িকারে দিলা তারে ।।
যখন যে কিছু চাই নায়িকা যোগাবে তাই
আমি যাই নাথ নাই বাসে ।। (পৃ:- ২১৬)

যে যুগে নারী চিত্র একমাত্র দেহ সর্বস্ব - সে যুগে নারীদেবীদের এই অনৈতিক পক্ষপাতিত্ব শুধু বিস্ময় জাগায় না — চিন্তিত করে তোলে । কারণ নারীদেবী নটীর সাহায্যে এলেন ধর্মপুত্রের ধর্মনাশের প্রার্থনা পূর্ণ করতে । আর ধর্মও হনুমানকে পাঠিয়ে অবশেষে অকালে সূর্যোদয় ঘটিয়ে লাউসেনের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন যেন । এমনকি সুরিক্ষা পালায় লক্ষ্য করা যায় দেবী আবির্ভূতা হয়ে বলছেন —

তোর পূজা নিতে গো কৈলাস তেজ্যা আসি ।
গণেশ কার্তিক হতে তোরে ভালবাসি ।। (পৃ:- ৭২৩)

তবুও সুরিক্ষা ছাড়ার পাত্রী নয় । সে ধাঁধাঁ ধরে বসে । সব ধাঁধাঁর উত্তর কর্পূর সহ লাউসেন দিতে পারে কিন্তু নর-নারীর যৌন সম্ভোগ সম্পর্কিত ধাঁধাঁর উত্তর দেওয়া তো অবিবাহিত কুমারের পক্ষে সম্ভব নয় । আর যেহেতু তারা ~~ম~~ নটীর উত্তর দিতে পারল না সেহেতু তারা বন্দী হবে । আবার নটীর প্রস্তাব —

ঠাকুরানী করিয়া থাকহ দিন দশ ।
রতিরঙ্গ সন্ধান শিখাব পাঁচ রস ।। (পৃ:- ৩০৬)

নটী ওদের বন্দী করেই রাখল । বন্দী অবস্থায় ওরা ধর্মকে স্মরণ করলে দেবতাদের মধ্যে কোলাহল পড়ল । 'ধাতুতত্ত্ব' জানবার জন্য শিবকে রাজী করানো হল —

ঠাকুর কহেন শুন দেব সর্ব্বেশ্বর ।
ধাতুতত্ত্ব জানিতে আপনি যাও ঘর ।।
জিজ্ঞাসি জগতমায়ে আসিবে ত্বরায় ।
ভক্ত রক্ষা পায় যেন তোমার কৃপায় ।। (পৃ:- ৩০৯)

এই সময়ে শিবের উক্তি প্রণিধান যোগ্য —

শিব কন তোমার আজ্ঞায় যাই ধেয়ে ।
ভরসা না দিতে পারি খল জাতি মেয়ে ।। (পৃ:-৩০৯)

নারী মাতা হয়েও পুরুষের কাছে 'খল জাতি' বলে পরিচিত । এর থেকে অপমানকর বিশেষণ আর কিছু থাকতে পারে না ।

শিব যথারীতি পার্বতীকে প্রশ্ন করেন 'কোন্‌খানে বৈসে ধাতু নারীর শরীরে'। (পৃ:-৩০৯) আর পার্বতী অমনি শিবকে কুচনী পাড়ায় যেতে বলেন । পার্বতীর পক্ষে শিবকে কুচনী পাড়ায় যাবার কথা বলা যে খুব অন্যায় হয়েছে তা নয় । কারণ শিবতো সুযোগ পেলেই পার্বতীর ঘর ছেড়ে কুচনী পাড়ায় কুচনীর সঙ্গে প্রেম করতে চলে যান । কিন্তু শিব এই কটাক্ষ পাতের উত্তরে যা বললেন তা থেকে তৎকালীন সমাজ জীবনে নারীর স্থান নিরূপণে অপূর্ব সহায়তা করবে ।

হর বলে এই হেতু হইনু বৈরাগী ।
কখন কথায় সুখ নাহি দিল মাগী ।।
এসব ইঙ্গিতে খোঁটা সকল কথায় ।
এ ঘর করিতে চিতে মোর না জুয়ায় ।।
বিফল জীবন যার স্বতন্ত্রা নারী ।
অবলা প্রবলা হৈলে নষ্ট হয় গারি ।।
দেবের দেবতা বলি বেদে মোরে কয় ।
ঘরের মেয়ের কাছে কথা নাহি রয় ।। (পৃ:-৩০৯)

স্বামী অন্য নারীর সঙ্গে প্রকাশ্যে প্রেম করতে গেলে নারী কিছুই বলতে পারবে না। এমন কি প্রয়োজনে অন্য নারী সম্ভোগ লিপ্সু পুরুষের কাছে ঠাটাছলেও সে সব কথা উল্লেখ করতে পারবে না। কারণ পুরুষ তখন বলবে —

'বিফল জীবন যার স্বতন্তরা নারী।
অবলা প্রবল হৈলে নষ্ট হয় গারি।'

কিন্তু পুরুষ অন্য নারীতে আসক্ত হলেও নারীর জীবন বিফল হবে বলা চলবে না। একথা পার্বতী জানেন জন্যই —

ঈশ্বরী কাঁপেন শিব অভিমান ক্রোধে।
অমর অর্চ্চিত পদ ধরিয়া প্রবোধে।।
ক্ষমহ দাসীর দোষ ধাতুতত্ত্ব কই। (পৃ:-৩০৯)

দাসীর কোন ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করা চলবে না। দাসী কেবল দাসত্ব করার জন্যই এ পৃথিবীতে জন্মেছে। তাই পুরুষ রুষ্ট হলে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে হবে - সব অপরাধ নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়ে রুষ্ট দেবতাকে তুষ্ট করতে হবে।

যথা সময়ে 'ধাতুর স্থিতি রমণী নয়নে' জেনে নিয়ে লাউসেনকে হনুমান জানালেন। লাউসেন কর্পূর মুক্ত হলেন আর প্রবলা বেশ্যার নাসিকাছেদন হল।

অত:পর লাউসেন কামরূপরাজ কর্পূরধলকে পরাস্ত করে গৌড়পতির অনুকূলে

করদানের ব্যবস্থা করলেন। কামরূপরাজ বিজয়ী বীরকে উপঢৌকন দিলেন 'গুণবতী বালা'কে।

'আজ্ঞা পেলে দান করি গুণবতী বালা।' (পৃ:-৩৯১)

এই উপঢৌকন নিয়ে লাউসেন গৌড়পতির কাছে এলেন। সেখানে মামী মেসোর কাছে সমাদর পেয়ে বধূ নিয়ে রওনা হলেন গৃহাভিমুখে। পথে মঙ্গল কোটের রাজা গজপতি যখন শুনতে পেলেন যে লাউসেন বিবাহ করে ঘরে ফিরছেন তখন গজপতি ভাবলেন —

বিভা করি দেশে যায় লাউসেন রায়।
অমলা অঙ্গজা আমি সমর্পিব তায়।।
রূপে গুণে অনুপম ধর্ম্মের সেবক।
হেন পাত্রে কন্যা দিলে রয়ে যাবে সক।। (পৃ:-৪০৬)

বীরবর লাউসেনকে উপঢৌকন দেওয়া যে কোন রাজার পক্ষেই মঙ্গল দায়ক। আর যত ধন রত্ন আদি আছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভোগ্য পণ্য তো সালঙ্কারা রূপসী কন্যা। তাই কন্যা রত্ন দানের মত শ্রেষ্ঠ দান দ্বারা বীরের সম্মান রক্ষার চেষ্টাই তো স্বাভাবিক। লাউসেন সদ্য বিবাহ করে ফিরছেন কাজেই আরও কিছু নারী তাকে উপঢৌকন দিয়ে সার্থকতা লাভের সৌভাগ্য রাজারা হারাবেন কেন? নারীতো ভোগ্য পণ্য সামগ্রী মাত্র। সপত্নীর ঘরে কন্যা সুখে থাকবে কিনা, সুখী হতে পারবে কিনা এসব ভাবনার অবকাশ কোথায়? আর সেই দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে নারীর

মানসিকতাও যেন কবি আপন চিন্তাধারার অনুকূল করে নিয়েছেন। কবি মুকুন্দরাম গাইলেন সতিনী কিছু বললে দ্বিগুণ বলবে। অর্থাৎ সপত্নী বিদ্বেষে যে গৃহে অশান্তি হয় একথা স্বীকার করে তৎকালীন সমাজ। তবুও সে বিদ্বেষের কোন হিসাব যেন রাখতে চান না তারা। লাউসেনের প্রথমা পত্নী কলিঙ্গার কাছে লাউসেন প্রস্তাবটা পেশ করলেন।

> শুনি রাজা কলিঙ্গার মুখপানে চায়।
> শ্লেষ বুঝি সুন্দরী স্বামীরে দিল সায়।। (পৃঃ-৪০৭)

কলিঙ্গা বুঝল যে তার স্বামী তার সঙ্গে শ্লেষ করছেন। কিন্তু এটা যে শ্লেষ নয় কিছু পরেই সেটা বুঝতে বাকী রইল না। সপত্নী এলো - সঙ্গে এলো উপঢৌকন। কলিঙ্গাকেও পুরস্কৃত করলেন গজপতি রাজ।

> বহুরত্ন বসন ভূষণ অলঙ্কার।
> কলিঙ্গা রানীর করে কত পুরস্কার।।

শুধু তাই নয় - সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ —

> হাতে হাতে সমর্পিলা অমলা রূপসী।
> বিনয় বচনে কহে রাজার মহিষী।।
> সতিনী বলিয়া বাছা পাছে ছাড় দয়া।
> রাণী বলেন প্রাণ তুল্য তোমার তনয়া।। (পৃঃ-৪০৭)

সতিনীকে প্রাণতুল্য না বলে কি উপায় আছে কলিঙ্গার? সামাজিক

প্রথার প্রতি আত্মসমর্পন না করলে তো প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে। কারণ সমাজে নারীর মন বলে কোন বস্তু আছে এটা তো স্বীকৃতিই পায়নি। কাজেই যতই যন্ত্রণার কারণ হোক, যতই হিংসার কারণ হোক প্রাণকে ভালবাস বলে, এই সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে প্রাণটা চায় বলেই সমাজের কুসংস্কারের কাছে আত্মবলিদান না করে উপায় কি? বিশেষত দুর্বলা নারীর পক্ষে সবল পুরুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মত নারী জাগরণ সে সমাজে ছিল না। নারীকে মুখরা দেখি কেবল দেহ সম্ভোগের লালসায় - যাদের সেই সমাজ 'নটী' 'বেশ্যা' ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ নিজ পছন্দ মত পুরুষ নির্বাচনের স্বাধীনতা তথাকথিত গৃহস্থ নারীর ছিল না। সে স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগ করে বহু পুরুষের পতন ঘটিয়েছে যে নারী তার নাম কুলটা, বেশ্যা, বারাঙ্গনা ইত্যাদি। আর নীরবে নিভৃতে নিজ স্বাধীন চেতনাকে চেপে রেখে পুরুষ শাসিত সমাজের নীচে নিষ্পেষিত হয়েও যারা বলেছে - বেশ আছি, যারা মনে ভেবেছে সেটাই তাদের ভাগ্যলিপি তারাই হয়েছে সতী সাধ্বী।

বর্ধমানে এলে ভূপতি কালিদাস মহাশয়ও একই পথে বীরের সম্মান রক্ষা করলেন।

বলিল বিমলা কন্যা সমর্পিনু রায়।
শ্বশুর সম্ভাষ করি সেন দিল সায়।।
তবে রাজা আনন্দিত বেদের বিধানে।
বিধুমুখী বিমলা বিবাহ দিল সেনে।। (পৃ:- ৪০৮)

তিন পত্নী নিয়ে অবশেষে বীরত্বের গৃহে এলেন। রঞ্জাবতী ও কর্ণসেন সাদরে সানন্দে পুত্র ও পুত্রবধূত্রয়কে বরণ করে নিলেন। কানড়া চরিত্রাঙ্কনে কবি একটু পরিবর্তন করেছেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী। কানড়া স্পষ্ট ভাষায় পিতার প্রস্তাবের উত্তরে বলেছে—

উচিত বলিতে বাপা লাজ ভয় কি।
কোন বৃদ্ধ বুড়া বরে বিলাইবে ঝি॥
কেন কাঁচা কাঞ্চন মিশাতে চাও কাঁচে।
বর ভাগ্যে ছয়মাস বৎসর বুড়া বাঁচে॥ (পৃ:-৪২৯)

এবং কানড়া ঘোষণা করল —

'ময়না মণ্ডলপতি মোর প্রাণ নাথ।' (পৃ:-৪২৯)

অবশ্য কানড়া এখানে লাউসেনের চতুর্থা স্ত্রী হতে অধিকতর আগ্রহী এক বৃদ্ধ জরাতুর রাজার স্ত্রী হওয়ার চাইতে। আর এর জন্য তার সাহসের বলিহারি দিতে হবে। তার পিতা প্রাণভয়ে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু সে নিজ দাসীর সহায়তায় ভবানীর পূজা করে লৌহ গণ্ডার পেল। ঘোষণা করল যে ঐ লৌহ গণ্ডারের মুণ্ড এক কোঁপে কেটে ফেলতে পারবে কানড়া তার গলায় মালা দেবে। ঈশ্বরী প্রদত্ত গণ্ডারের মাথা অবশ্যই আর কেউই এক কোঁপে নামাতে পারবে না — কানড়ার প্রার্থিত প্রাণপতি লাউসেন ছাড়া। লাউসেন এসে কানড়ার ব্রত পূর্ণ করে তাকে তাঁর চতুর্থা পত্নী করে নিয়ে গেলে কানড়ার জীবন ধন্য হল। অবশ্য বীরাঙ্গনা কানড়ার বিবাহ কৌতুক-যুদ্ধের

মাধ্যমেই কবি সংঘটিত করিয়েছেন। দৈববলে বলী দাসী ধুমসী একটা বিরাট সৈন্যদলকে লন্ড ভন্ড করে দিল। এখানে নারীর বীরত্ব অপেক্ষা দৈববলের জয়গান ঘোষিত হয়েছে।

মূল কথা এই যে মধ্যযুগীয় সাহিত্যে যতটা দেব দেবী মাহাত্ম্য প্রচারের দিকে কবির মন নিবিষ্ট ছিল ততটা সমাজ জীবনের প্রতি ফলনের দিকে ছিল না। এর জন্য কবি সচেতন ভাবেই কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি করে সে সব সমস্যার সমাধান করিয়েছেন অলৌকিক ভাবে - নায়ক বা নায়িকার ইষ্ট দেবতা বা দেবীর আশ্রিত বাৎসল্যের প্রকাশের মাধ্যমে। এই একমুখ-গামী জীবন চেতনার মধ্যে তাই নরনারীর সম্পর্কটা তেমন সুন্দর ভাবে চিত্রিত হবার সুযোগ পায় নি। এসব সাহিত্যে যত নরনারীর চিত্র চিত্রিত হয়েছে সবাই একটা বিশেষ আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করা জন্য। শুধু পুরুষ জাতির সেবা, আনন্দ বর্দ্ধন ইত্যাদির জন্য যে নারীর সৃষ্টি বলে তৎকালীন সমাজ মনে করত বলে মনে হয় সে সমাজের কাছে নারীর জীবনের মূল্যায়ন আধুনিক দৃষ্টিতে আমরা যা করার চেষ্টা করি তা প্রত্যাশা করা যায় না।

বৃদ্ধ স্বামী পেয়েও রঞ্জাবতী খুশী। তৃপ্ত কিনা বলা যায় না। কারণ তৎকালীন নারীর জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্যই হল সন্তানের জননী হওয়া। তাই রঞ্জাবতী দেব দেবীর কাছে ধর্ণা দিয়ে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেই যেন একটা জীবনকে পেরিয়ে এমন একটা স্তরে উন্নীত হলেন যেখানে লাউসেনই (সন্তান) তার জীবনের অন্যতম অস্তিত্বের ধারক ও বাহক হয়ে

হয়ে দাঁড়াল । তার ব্যক্তিগত জীবন এক বিরাট পুত্রের কীর্তি স্তম্ভের অন্ত - রালে হারিয়ে গেল । কর্ণসেন ও রঞ্জাবতী ছিলেন লাউসেনের জন্যই - নিজেদের জন্য নয় ।

আবার যে সব নটী বা বেশ্যা চরিত্র চিত্রিত হয়েছে তারা সাবলীল । তাদের নিজস্ব একটা গতি ভঙ্গী ও জীবন চেতনা আছে । তারা কোন বিশেষ উন্মার্গগামী আদর্শের জন্য সমর্পিত প্রাণা নয় । তারা বোঝে নিজ দেহ সুখের স্বাদ । পুরুষ নারীর অন্যতম জৈবি সম্পর্ক ছাড়া অন্যকোন বোধ তাদের নেই । কবি তাদের এমন ভাবে চিত্রিত করেছেন যে কখনও লাউসেন ভ্রাতা কর্পূর সহ ওদের হাতে অসহায় ক্রীড়নক মাত্রে পর্যবসিত হচ্ছেন । বন্দী-দশা যাপন করছেন । এই প্রগলভা রমণীরাও দেব দেবীর আশ্রিতা । আর বহু পুরুষের সাথে রতিক্রিয়ায় যারা আনন্দ পান তারা তাদের আরাধ্যা দেবীদের কাছে সেই আনন্দ লাভে তাদের অধিকারকেই প্রতিষ্ঠা করতে চাই-বেন এটাই স্বাভাবিক । কিন্তু কবি চেয়েছেন এই সব স্বৈরিনী নারীর উদ্দেশ্য বিফল হোক । সেজন্য ধর্মকে অধিকতর শক্তিশালী করে ঐ সব নারীর অক্টোপাশ থেকে কবি তাঁর নায়ককে মুক্ত করেছেন । এই শ্রেণীর নারী চিত্র এই গ্রন্থে অনেক । সুরিক্ষা তার অন্যতমা । বোঝা যায় কবি এদের আদর্শ চরিত্রের নারী হিসাবে স্বীকৃতি দেন নি ।

কিন্তু এমন কোন আদর্শ চরিত্র পাশাপাশি পাইনা যা দেখে আধুনিক রুচির তৃপ্তি হয় । লাউসেনকে একে একে চার জন কুমারী বিয়ে করেছেন ।

প্রথম তিনজন এসেছে উপঢৌকন রূপে। পিতা পরাজিত - তাই বিজয়ী বীরকে কিছু উপঢৌকন দিতে হবে। স্বীয় অনূঢ়া কন্যাইতো অন্যতম অস্থাবর সম্পত্তি। সেই সম্পত্তি ভোগের জন্য তাই উপঢৌকন দেওয়া হল। কামরূপ রাজ তাই তার কন্যাকে দিলেন। এরপর মঙ্গল কোটের রাজা গজপতি — তারপর বর্দ্ধমানের রাজা পর পর এই বিজয়ী বীরকে স্ব স্ব কন্যাদান করলেন। আর সালঙ্কারা কন্যারাও অস্থাবর সম্পত্তির মতই বীরের বহু স্ত্রীর একজন হয়ে ধন্য করলেন তাদের জীবন। যেন তাদের ব্যক্তিগত কোন রুচি, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষাই নেই। একজন বীর পুরুষের ভোগে লাগাই যেন তাদের জীবনের একমাত্র স্বার্থকতা। এরপর এদের মাঝে মধ্যে উল্লেখ পাওয়া যায় মায়ামুণ্ড স পালায় — সেখানে লাউসেনের সাময়িক মৃত্যুতে হাহাকার ছাড়া ও স্বীয় ভাগ্যকে দোষারোপ ছাড়া আর কিছু প্রকাশ হল না।

কানাড়াকে এক বীরাঙ্গনা রূপে এঁকেছেন কবি। কিন্তু সে বীরাঙ্গনার ব্যক্তিগত স্বাদ আহলাদ একেশ্বরী হবার মধ্যে নেই। মধ্যযুগীয় নারী - ভাবনার বাইরে এ নারী নয়। আমরা দেখলাম বৃদ্ধ গৌড়পতির লালসার কাছে পিতার ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে নিজ জীবনকে ধন্য করার কোন বাসনা কানড়ার নেই। প্রত্যাখ্যান করেই নয় — স্বীয় সাধনাবলে পিতার পলায়ন প্রবৃত্তিকে উপেক্ষা করে বীরত্বের সঙ্গে গৌড়পতির শক্তিকে খর্ব করে নিজ উদ্দেশ্যে অটল থাকতে। ধর্মমঙ্গলে (ঘনরামের) এই চিত্রটিই একটু আধুনিক রসের ব্যঞ্জনা দিয়ে রচিত বলা যায়। কানড়া নিজে লাউসেনের সঙ্গে যুদ্ধও করলেন। আর সে যুদ্ধে বিজয়িনী হয়ে লাউসেনকে

পতিরূপে লাভ করলেন। কিন্তু তিনি হলেন চতুর্থা স্ত্রী। এক বীরপুরুষের বহু স্ত্রীর একজন হবার মধ্যে যে মধ্যযুগীয় গৌরব তা কানড়ার জীবনে এলো। কিন্তু আমরা আধুনিক দৃষ্টিতে এই রুচিকে সমর্থন করতে পারি না।

এখানেও মধ্যযুগে নারীর স্থান যথার্থ ভাবে নির্ণীত হয়নি। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মধ্যে যত বড় বীরত্বের বীজ আরোপ করিনা কেন তাতে কাব্যের বীর রসাত্মক রচনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় — কাব্যের অলঙ্কার যুক্ত ভাষায় বাহুল্য ঘটানো যায় মাত্র। নারীর মর্যাদা বাড়ে না।

ঙ) ধর্মমঙ্গল — মানিকরাম গাঙ্গুলী — অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ।

মানিকরাম গাঙ্গুলীর কাব্য অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে রচিত। যুগের অনাচারের একটি তালিকা দিয়েছেন কবি তার কাব্যে তাতে রাজার মঙ্গল চিন্তার কথা আছে। 'রাজার মঙ্গল হলে রাজ্যের মঙ্গল'— একথা কবি একাধিকবার বলেছেন।

মহামদ ক্ষমতা পেয়ে রাজ্যে অনাচার আরম্ভ করেছিল। এমনও শোনা

যায়, দেশ থেকে লোক পালিয়ে গিয়ে কোন রকমে অন্যত্র আত্মরক্ষা করছিল। এসময়ে রাজ্যের কিভাবে মঙ্গল হবে তাই নিয়ে মানিকরাম ভাবতেন এবং ভাবাই স্বাভাবিক।

মঙ্গলকাব্যের আদর্শে রচিত ব'লে তাঁর কাব্যে এক বিশেষ ধারার অনুসরণ দেখি। বিশেষ ক'রে তাঁর কাব্যের নারী চরিত্রগুলি শাশ্বত সাহিত্যের দরবারে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারেনি। নারী চরিত্রগুলি যথাপূর্বম্ দৈবনির্ভরশীলা — এইগুলিতে সংস্কৃত পুরাণ রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির প্রভাব পড়েছে। কাব্যটির প্রথম পালাতে ধর্মঠাকুর বলেছেন —

'আমি যার সহায় তার এত ভয় কেন ?' (পৃঃ-২৩)

নির্ভয়ে কবি কাব্য রচনা করতে গেলেন। অনাবিল ভক্তি এবং আন্তরিকতার স্পর্শ কাব্যটিতে থাকলেও নারী চরিত্রগুলি নিতান্তই গতানুগতিক এবং পুরাণাশ্রয়ী। কাব্যরস অপেক্ষা তিনি শ্রোতাদের অর্থাৎ তথাকথিত সমাজের পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্যই অধিক আগ্রহী বলে মনে হয়। বিশেষ একশ্রেণীর লোকদের কবি সমঝে চলতেন — তাদের তুষ্টিবিধানই ছিল তার লক্ষ্য।

মানিকরামের কাব্যে রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনীর সমাবেশ রয়েছে। কৃষ্ণকথা এবং রামকথা সেকালে অসামান্য জনপ্রিয় ছিল। কবি

যেন রামায়ণ-মহাভারতের আদর্শ ধর্মমণ্ডগলের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে উপস্থা-পিত দেখে উল্লাস বোধ করেছেন ।

একদিন নিরঞ্জন পূজার প্রকাশ করবার জন্য যোগীবেশে , মাথায় ফটিকের মালা দিয়ে বাঘছাল পরে হরিহরের গৃহে যান । স্বকার্য সিদ্ধিই ছিল তার উদ্দেশ্য । উত্তম নাচের দ্বারা সকলের মনে উল্লাসের সৃষ্টি করলেন । নাচের ধ্বনি শুনে তিলোত্তমা , রম্ভা , উর্বশী , মেনকা এবং আরও অনেকে এসেছিলেন । শত্রুসুতা রম্ভাবতী বড় দুরন্তা , উপরন্তু ধর্মের মায়াতে আচ্ছন্ন হয়ে হেসে হেসে মূর্ছা গেলেন । এসময় ধর্ম রোহি-তাক্ষে রম্ভাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন । স্বরীশ্বর কন্যা রম্ভা অভিশাপ শুনে হাহাকার করে ধর্মের পা ধরে বলে উঠলেন ।

মোরে রক্ষ রক্ষ যুগপতি ।।
আমি অবলা অল্প বোধ ।
নহে উচিত করিবারে ক্রোধ ।।
আদি অনাদি পুরুষ তুমি ।
চর্মচক্ষে কি চিনিব আমি ।।
ইবে শরণ লইনু তোমা ।
কর অপরাধ মোর ক্ষমা ।।

* * *

মোরে দিয়া কুমতি কলাপ ।
দিলে অতি গুরুতর শাপ ।। (পৃঃ-৩০ - ৩১)

কাব্যের শুরুতেই নারী মুখের এই অসহায়তা আমাদের বিব্রত করে তোলে । স্বর্গের রূপসী কন্যা নিজেকে 'অবলা' মনে করছেন । এমন কি বুদ্ধিও তার অল্প এ স্বীকারোক্তিও রয়েছে । অথচ কবি কিছুক্ষণ আগে 'রম্ভাবতী শত্রুসুতা সে বড় দুরন্তা' বলেছেন । কবির চরিত্রকল্পনাটিতে স্পষ্ট মনোভাবের প্রকাশ নেই । যে নারীকে কবি দুরন্তা বললেন পরক্ষণেই সেই নারীই অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবার আশায় ধর্মঠাকুরের শরণাপন্ন হয়েছেন । উপরন্তু রম্ভাবতী একথা বলছেন ধর্মঠাকুরই তাকে 'কুমতি কলাপে' আচ্ছন্ন করেছেন । যে নারী কুমতি কে দিলেন তা নির্ধারণ করতে পারেন তিনি এত অসহায় বালিকার মত নিজেকে অবলা বা অল্পবোধের নারী বলে চিহ্নিত করছেন । চিত্তে তাঁর ভয়েরও সঞ্চার হয়েছে । ধর্মঠাকুরের কৃপা লাভের জন্য বলছেন —

কেহ নাহি তোমা বিনে আর ।
দয়া করে দুঃখে কর পার ।। (পৃঃ- ৩১)

পিতৃমাতৃহীনা রঞ্জাবতী ও মহামদ গৌড়েশ্বরের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন । রঞ্জাবতীর বড় বোন ভানুমতী এ সংবাদ পেয়ে বাবা ও মাকে না দেখার অনুশোচনায় ক্রন্দনে রত দেখতে পাই —

সেই যে এস্যাচি আমি না গেলাম অদ্যাবধি ।
ঘুচিল বাসুড়ে যাওয়া বিধি হল বাদী ।।
দুর্বলের বিষাদে বৃক্ষের ঝরে পাত ।
প্রিয়া বোলে প্রবোধ করিল নরনাথ ।। (পৃঃ-৩৫)

ভানুমতী বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ীতে এসেছে । যে পিতা মাতা তার জন্মদাতা সে মাতাপিতাকে দেখার স্বাধীনতাও যেন ভানুমতীর নেই । সে নিজেকে দুর্বলা নারী মনে করেছে - সে যেন স্বামীর নিকটে বন্দিনী। ভানুমতী ভাবতে পারছে না - পিতৃমাতৃগৃহে যাওয়ার স্বাধীনতা তার আছে । তাই এই ব্যাপারেও বিধিকে দায়ী করতে হয়েছে - 'বিধি হল বাদী'।

মানিকরামের কাব্যে রঞ্জাবতীকে রামায়ণের কৌশল্যার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে , আর কর্ণসেন হলেন দশরথ । রঞ্জাবতী যুবতী নারী — সামাজিক ন্যায়নীতির যূপকাষ্ঠে তাকে বলি দেওয়া হয়েছে — রঞ্জাবতীও নীরবে এই বলিদানকে মেনে নিয়েছে । এই বলিদানের বিরুদ্ধে রঞ্জাবতীর মুখে কোন শাণিত বাক্যের উল্লেখ কবি করলেন না।

ভানুমতীর স্বামী গৌড়েশ্বর রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিবাহ দিলেন ।

জায়ার সহিত যুক্তি করে সংগোপনে ।
রত্নাজার বিবাহ আজ দিব কর্ণসেনে ।।
বুড়া বর পাছে মহামদ শুনে ।
মফ:স্বলে ডাকাইলা পুরোধা ব্রাহ্মণে ।।
লুকাইয়া নিভৃতে গৌড়ের অধিপতি ।
কর্ণসেনে বিবাহ দিলেন রত্নাজাবতী ।। (পৃ:-৪৫)

এমনকি মহামদ ভগিনীর বিবাহের সঠিক খবর জিজ্ঞাসা করলে গৌড়েশ্বর বললেন —

বিচারে বুঝেছি সেন কুলেশীলে ভাল ।
ধনে মানে রূপে গুণে ধরাতলে আল ।। (পৃ:-৪৬)

মধ্যযুগের সাহিত্যের পাতায় পাতায় সমাজ জীবনে নারীদের প্রতি এইরূপ অবিচারের চিত্র ছড়িয়ে আছে । এই জাতীয় চিত্র আমাদের মনে পীড়ার সৃষ্টি করে — নারী যেন শুধুই পুরুষের জীবনে আনন্দ বর্ধনের উপকরণ মাত্র । নারীরও যে একটি পৃথক সত্তা আছে — একথা যেন সে যুগের সমাজ দরদী ব্যক্তিরা ভাবতেও পারতেন না । মধ্যযুগের দুর্দিনের অন্ধকারে রত্নাজাবতীর ব্যক্তিগত জীবন হারিয়ে আছে — তার ব্যক্তিগত জীবনের ক্রন্দন আমরা শুনিনি । সমাজ নীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য শাসনের দাপটে তার উচ্ছ্বসিত হাহাকার স্তব্দ হয়ে গেছে ।

কবি সামুলার মুখ দিয়ে হরিচন্দ্রের উপাখ্যানটি বলিয়েছেন । হরিচন্দ্রের ভার্যা মদনাবতী পুত্রহীনা ছিলেন । পুত্র লাভের জন্য তার আকুল ক্রন্দন নারীর স্বভাবজাত ধর্মকেই প্রকাশ করে । দৈবাদেশে মদনাবতী পুত্রের জননীও হয়েছিলেন । কিন্তু এক ব্রহ্মচারীর অদ্ভুত খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য অথবা স্বামীর তথাকথিত কথা রক্ষা করার জন্য মদনাবতীকে নিজ পুত্রকে বিসর্জন দিতে হল । প্রথা ও সংস্কার নারীর মাতৃত্বের চেয়ে অধিক বলশালী । পুত্রের জীবন রক্ষা করার জন্য মায়ের অধিকারও এখানে অপহৃত হয়েছে । অসহায়া মদনাবতী স্বামীকে বলছেন —

রও নাথ বাছাকে বদন ভরে দেখি ।
বড় অভাগিনী আমি প্রায় জন্মদুখী ।।
*   *   *   *
অনেক করিয়ে ক্লেশ প্রাণ ত্যজে বাণে ।
পেয়েছিনু অভাগিনী তোমা হেন ধনে ।।
বার বৎসরের কৈনু কার তরে অভাগী ।
পুনর্বার পরাণ ত্যজিব তোমা লাগি ।। (পৃ:- ৬৬)

বার বৎসর লালন পালন করেছে ছেলেকে । সেই ছেলের মাংস দিয়ে ব্রহ্মচারীর উপবাসান্ত পারণ করাতে হবে স্বামীর শপথ রক্ষার জন্য । মদনাবতী আর যেন নারী নয় — মধ্যযুগের প্রথা, রীতি ও পুরুষের খেয়ালের ক্রীড়নক একটি প্রাণহীনা, হৃদয়হীনা জড় মাংসপিন্ড মাত্র ।

ব্রহ্মচারীর অভিলাষ পূরণের জন্য মদনাবতীকে নিজ পুত্রের মাংস রন্ধন করতে হয়েছিল —

রোহিত মৎস্যের জুস যতনে রান্ধিয়া ।
রান্ধিল লুয়ার মাংস যতন করিয়া ।। (পৃ:- ৬৮)

এর চেয়ে মর্মান্তিক ও পৈশাচিক দৃশ্য আর কি হ'তে পারে ? লুই-চন্দ্রের মুন্ডকে মদনাবতী লুকিয়ে রেখেছিল । কিন্তু নিষ্ঠুর ব্রহ্মচারী পিশিতের অম্বল ছাড়া পারণ করবেন না । আর অমনি স্বামীর নির্দেশ হল মদনাবতীর উপর । জন্মদু:খিনী মদনাবতী বললেন —

শুনিয়া স্বামীর তুন্ডে বচন অশান্ত ।
মদনার মুন্ডে যেন পড়ে বজ্রাঘাত ।।
কহে কি কহিলে নাথ বিদরয়ে বুক ।
দু:খিনীকে পুন পুন কেন দেহ দুখ ।। (পৃ:- ৬৯)

মদনাবতী মা । নিজ পুত্রের কাটা মুন্ডটাও তার লুকিয়ে রাখার অধিকার নেই । শুধু আছে চোখের জল - মুখে প্রতিবাদের বা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ভাষা নেই ।

মধ্যযুগের দৈবনির্ভরশীল সমাজে মানুষ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে

অভ্যস্ত ছিল। আর এই ধর্মীয় অনুশাসন দিয়ে নারীর জীবন বৃত্ত রচিত হয়েছিল সে যুগের সাহিত্যে। হরিচন্দ্রের পালাটিতে রামায়ণের রাজা হরিচন্দ্রের উপাখ্যানের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। নিয়তিকে মেনে নেবার ধর্মীয় চেতনা মদনাবতীর ব্যক্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মদনাবতী ধর্মানুশাসিতা নারী, ধর্মানুশাসন মানুষের ব্যক্তি চেতনা, রুচি, ইচ্ছা -অনিচ্ছার যেন অনেক উর্ধ্বে। নারী যেন তার হাতের অসহায় ক্রীড়নক। পুত্র বধের আদেশের প্রতিবাদের সামাজিক সাহস মদনাবতীর মধ্যে কবি আরোপ করতে পারেন নি। মাতাপিতার হাতে পুত্রের জীবন নাশ করিয়েও কবি যেন বিশেষ কোন আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেন না। তিনি অধিকতর পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার একটা বীভৎস চিত্র রচনা করলেন। মদনা-বতী ক্রন্দন থামিয়ে —

শুনিয়া স্বামীর বাক্য সম্বরি ক্রন্দন।
অম্বলে লুয়ার মুণ্ড করিল রন্ধন।। (পৃঃ-৭১)

এরও পর আছে। এবার মদনাবতীর উপর আদেশ ব্যঞ্জনের চারিটি ভাগ করে ব্রহ্মচারীর সঙ্গে একটি ভাগ মদনাবতীকে খেতে হবে।

শুনে তায় মদনা মহিষী মহানসে।
কান্দিয়ে করুণা করে কান্ত প্রতি ভাষে।।
কি করিলে প্রাণনাথ কেন আল্যা বলে।

কি করে পুত্রের মাংস খাব হাতে তুলে ।। (পৃঃ-৭১)

*　　*　　*　　*

পতিব্রতা পতিবাক্য বুঝে সমুদয় ।
কান্দিতে কান্দিতে কৈল ভাগ চতুষ্টয় ।। (পৃঃ-৭২)

এক তথাকথিত আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পিতৃমাতৃ স্নেহরূপ এক বিরাট আদর্শের যে অপলাপ ঘটছে প্রথাবদ্ধ জীবন যাপনের ফলে কবি সে দৃষ্টিভঙ্গী হারিয়েছেন । একটা অযৌক্তিক ও অতি অলৌকিক উদাহরণ স্থাপন করতে গিয়ে কবি নারী জীবনের যে চিত্রটি এঁকেছেন তা অত্যন্ত করুণ । প্রতিব্রতা রমণীর স্বামী কথা দিয়েছেন তাই পুত্রের মাংস রেধে খাওয়াতে হবে কোন প্রতিবাদ করা চলবে না । কোন নারীই এরূপ প্রস্তাবে রাজী হতে পারে না । কিন্তু মধ্যযুগে নারীকে তো রক্তমাংসের একটা পিন্ড মাত্র ভাবা হত । অসহায়া নারীর হৃদয় বিদারক ক্রন্দনের প্রতি প্রথা সর্বস্ব সমাজের পুরুষদের কর্ণপাত করার অবকাশ ছিল না ।

রঞ্জাবতীর শালেভর পালার কাহিনী মর্মস্পর্শী । রঞ্জার ছিল পুত্র কামনা । সামুলার মুখে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য শুনে তিনি সুখী হলেন — মনে মনে স্থির করলেন যে তিনি ধর্মের পূজা করবেন । পূজার আয়োজন হতে লাগলো — তখন রঞ্জাবতী বলছেন —

পূজিতে প্রভুর পদ যাব সেই স্থানে ।
কি কহেন আগে দেখি কহি গিয়া সেনে ।।
অবলার পতিগতি পুরাণে বিদিত ।
* * * *
আমি গিয়া অভাগিনী কর আশীর্ব্বাদ ।
প্রাণনাথ পূর্ণ যেন হয় মোর সাধ ।।   (পৃ:-৭৯)

পুরুষের দেওয়া জীবন বৃত্তের বাইরে যাবার অধিকার নারীর ছিল না। পুত্রলাভ কামনায় ধর্মপূজা করার জন্য শালে ভর দিতে যাবেন কিন্তু তার জন্য স্বামীর অনুমতি প্রার্থনা ও নিজেকে 'অবলা' ইত্যাদি বলার মধ্যে নিহিত আছে নারীর সামাজিক স্বাধীনতাহীনতার চিত্র ।

পুত্র সন্তান লাভ করেছে রঞ্জাবতী । কিন্তু সে পুত্র সন্তান চুরি হয়ে গেছে । তার জন্য কান্নাকাটি করা স্বাভাবিক । কিন্তু সেই কান্নার ভাষার মধ্যে দৈবনির্ভরশীলতার চিত্র —

কে করে খণ্ডন মোর কপালের কথা ।
দিয়ে পুন হরি নিল দারুণ বিধাতা ।। (পৃ:-১১১)

রঞ্জাবতীও দৈবনির্ভরশীলা রমণী ।

কাব্যটির চতুর্থ পালায় উল্লেখ রয়েছে দেবী কাত্যায়নী কৈলাস থেকে নেমে আসতে ইচ্ছুক হয়েছেন। মর্ত্যে কার কত ভক্তি —যাচাই ক'রে দেখাই তাঁর উদ্দেশ্য। প্রথমে সুরপুরের ইন্দ্রালয়, ব্রহ্মলোক, শিবলোক, বিন্ধ্যাচল, কালীঘাট প্রভৃতি সিদ্ধস্থান ভ্রমণ করলেন —অবশেষে এলেন ময়নানগরে।

ময়নানগরে লাউসেন ও কর্পূর ধর্মঠাকুরের পূজারী। পদ্মার সঙ্গে দেবী আলাপ করছেন —

> মোহিব তাহার মন মোহিনীর বেশে।
> কহিব রসের কথা অশেষ বিশেষে।।
> যদি চায় ভুইল্যা ভাবে, না চিনে আমাকে।
> এই খড়্গে কর‍্যা তবে কাটিব তাহাকে।। (পৃঃ-১২৯)

জগতের মাতা যিনি তার মুখের কথাকে দেবীর উক্তি মনে করতে দ্বিধা হয়। এই উক্তিতে তার দেবীত্বের মহিমা কালিমালিপ্ত হয়েছে। অবশ্য, এখানে দৈবী মহিমা প্রত্যাশা করাই অন্যায়, কারণ দেবী এখানে প্রতিহিংসা পরায়ণা সাধারণ মানবীরূপে চিত্রিত হয়েছেন। তারপর মোহিনীরূপ নিয়ে এলেন লাউসেনের আখড়ায়। লাউসেনের শিয়রে বসে তিনি বললেন —

বুড়া মোর ভাতার বড়ই দেখ জ্বালা ।
কতেক সহিব কষ্ট আমি সে অবলা ।।
সংসারের তত্ত্ব করি সভে মোরে জানে ।
তথাপিহ ভয় নাই ভাতারের মনে ।। (পৃঃ-১৩২)

পরস্ত্রীকে লাউসেন মায়ের মত মনে করেন বলায় দেবী বললেন —

মোহিনী কহেন, শুন দুর্লভ সদাকর ।
যাচকা যুবতী ছাড়া অধর্ম্ম বিস্তর ।।
* * * *
সহিতে না পারি আর স্বামীর ভর্ৎসনা ।
কুচনীর সঙেগ করে কৌতুক বেহার ।।
শয়ন সম্ভোগ মোর সব অন্ধকার ।
সিদ্ধির খিয়ালে সদা শুদ্ধ বুদ্ধিহীন ।।
* * * *
বড় বেটা বাকসিদ্ধ ছোটবেটা বীর
এই অনুরাগে আনি কুলের বাহির ।
প্রচুর আছয়ে ধন পুষিব তোমাকে ।। (পৃঃ-১৩৪)

এই স্বামী নিন্দার ব্যাপারেও ত্রিলোকতারিণী দেবী ছলনার আশ্রয় নিলেন লাউসেনের কাছ থেকে নিজের পূজা আদায় করার জন্য ।

অবশ্য লাউসেন দিব্যজ্ঞানের প্রভাবে মায়ের আসলরূপ জানতে পেরেছিলেন বলে দেবী বরও দিয়েছিলেন — তিনি লাউসেনকে দিয়েছিলেন 'জয়খড়্গ'।

সুরপুরের সুরগণ বিশ্বনাথকে বেষ্টন করে বসে আছেন, দেবসভায় সুবেশা, সুকেশা, বিদ্যাধরী নৃত্য পরিবেশন করছেন। মোহে আবিষ্টা বিদ্যাধরীর নৃত্যে তালভঙ্গ হল। বিশ্বনাথ অভিশাপ দিলেন — তাকে মর্ত্যে জন্ম নিতে হবে। পার্বতীর নিকট নর্তকীগণ এ অভিশাপ থেকে মুক্তির প্রার্থনা করলেন —

নারী হয়ে জনমিলে দু:খ পাব নানা।
বিশেষত: হত্যে হব পরের অধীনা ।। (পৃ:-১৪১)

কিন্তু বিশ্বনাথের অভিশাপ থেকে কোন ক্রমেই মুক্তি পেলনা তারা —কলিঙ্গা, কানড়া, সুয়াগা ও বিমলা। নারী হয়ে জন্ম নিলে মর্ত - লোকে তাদের অশেষ দু:খ বরণ করতে হবে একথা সুরপুরের দেবীদের ও নর্তকীদের পর্যন্ত অজানা ছিল না।

ধর্মমঙ্গল কাব্যটির বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি যে সকল পুরাণ কাহিনী উ উল্লেখ করেছেন তার নারীচরিত্র চিত্রনে একই রকম ভাব লক্ষ্য করা যায়। তাতে মনে হয় সৃষ্টির সূচনা থেকেই নারীরা কখনও পুরুষের সমান হতে পারেনি। গৌড়ের রাজদরবারের যে ছবি মানিকরাম এঁকেছেন তাতে

দেখা যায় রাজারা বিলাসিতায় দিন যাপন করতেন ।

একটি উপভোগের চিত্র —

পুরাণে শুনেন ব্যাসের যোগ ।
পরদারে কত পাপের ভোগ ।।
বুঝিয়্যা বিহিত বিয়োগ তার ।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ শরণ যার ।।
হীরা যত বলে নিয়োগ তত্ত্ব ।
না শুনে নৃপতি মদনে মত্ত ।। (পৃ:-৩৬৪)

এই বিলাসিতার একটি উপকরণ ছিল রাজনর্তকী । হীরা রাজনর্তকীর একজন । সে নানা শাস্ত্রকথা তুলে রাজাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলো বটে, কিন্তু এই চেষ্টার মধ্যেও দৈবনির্ভরশীলতা । শ্রীকৃষ্ণের নাম সে অবিরাম স্মরণ করতে লাগলো । কিন্তু রাজা বিশাল শক্তির অধিকারী — নর্তকীর কথায় তিনি কর্ণপাত করবেন না ।

চিত্রটি তৎকালীন রাজার শাসনে রক্ষিতা নারীদের দুর্দশার কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় । নারীরা এখানে নিতান্তই পুরুষের কেবলমাত্র ভোগের সামগ্রী ।

মন্ত্রী রাজাকে পুনরায় শিমূলের রাজা হরিপালের কন্যাকে বিয়ে করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। শিমূলের রাজা কর প্রদান করেন নি। অতএব তার বিনিময়ে তার কন্যা কানড়াকে অবশ্যই গৌড়রাজার হাতে সমর্পণ করতেই হবে।

তবে যদি এখন না করে কন্যাদান।
তারজন্য বিধাতা হইল তাকে বাম ।। (পৃ:-৩৬৬)

করের বিনিময়ে কানড়াকে রাজার হাতে দিতেই হবে — এই ছিল রাজ নির্দেশ।

কিন্তু কানড়াও রাজার মেয়ে। নারী হিসেবে তার যে পৃথক সত্তা বা মতামত থাকতে পারে — একথাটি তৎকালীন রাজ্যের রাজারা যেন ভাবতেও পারতেন না। তাদের ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা কামনার উপর নারীদের জীবনের গতি নির্ভর করতো। রাজার হুকুম — অতএব নারী তার সতীত্বকে, নারীত্বকে, মর্যাদাকে সম্পূর্ণভাবে তাদের হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য।

কানড়ার উদ্দেশ্য লাউসেনকে পতিরূপে পাওয়া। কানড়ার মুখে কবি কিছু আত্মরক্ষার বাণী উচ্চারণ করিয়েছেন বটে — কিন্তু এই নারী

চরিত্রটিও মধ্যযুগীয় নারী ভাবনার বাইরে নয় ।

সঙ্কেত মন্দিরে গিয়ে সেবে ভদ্রকালী ।
দুয়ারি খর্পরে কেটে দেয় লক্ষ্য বলি ।।
প্রণতি করয়ে সতী পড়িয়ে ভূতলে ।
নেতের আঁচল ভিজে নয়নের জলে ।।
বাপ হল বিরুদ্ধ দিলেক বনবাস ।
কানড়ার কেউ নাস্তি করিতে আশ্বাস ।।
তুমি যদি বাম হও তবে সব যায় ।
দয়াময়ী দয়া কর্য্যা রাখ দু'টি পায় ।। (পৃ:-৩৭৯)

এরপর দেবী নিজেই ধরা দিলেন —

মূর্চ্ছিত কানড়া পড্যা আছে ভূমিতলে ।
ত্রিলোকতারিণী তুল্যা করিলেন কোলে ।। (পৃ:-৩৭৯)

ভবানীর পূজা করে' কানড়া লাউসেনের সঙ্গে যুদ্ধও করেছিলেন । তিনি লাউসেনের চতুর্থা স্ত্রী হতে আগ্রহী ।

একটি কৌতুক যুদ্ধের মাধ্যমে কবি কানড়াকে লাউসেনের সঙ্গে বিয়ে দিলেন ।

সতিনীর জ্বালা যন্ত্রণার উজ্জ্বল চিত্র পাই কলিঙগা, কানড়া, সুয়াগী ও বিমলার কথোপকথনে। সেখানে আছে —

সদা সতিনীর সবত্র-গতি।
বিনা দোষে বলে বিষের রাতি।।
সহজে সতিনী শেলের কাঁটা।
উঠিতে বসিতে অশেষ খোঁটা।। (পৃ:-৫৪০)

কর্ণসেনের অবর্তমানে মহামদের চক্রান্তে রাজ্যের সমূহ সর্বনাশ উপস্থিত হলো। তিনিই বিভিন্ন সঙকটের সৃষ্টি করে লাউসেনকে সঙকট মোচন করতে পাঠাতেন। উদ্দেশ্য — লাউসেনের মৃত্যু। কোন একটা যুদ্ধ থেকে লাউসেন তো ফিরে নাও আসতে পারেন। লাউসেনকে যেতে হবে ঢেকুরে — ঢেকুরে যাবার আগে লাউসেন জননীর অনুমতি চেয়েছিলেন। এসময়ে রঞ্জাবতীর উক্তি উল্লেখযোগ্য।

তেমতি আকুল প্রাণে কোলে কর্যা লাউসেনে
রঞ্জাবতী করয়ে রোদন।।
তোমা লেগে অভাগিনী সকল বিফল মানি
সপ্তশালে দিয়াছিনু ঝাঁপ

* * * * *

শূণ্য ভয় হয় চিত্তে　　　না দিব ঢেকুর যাইতে

পরাণ পুত্তলি তুমি মোর ।

*　　*　　*

অভাগিনী মায়ের কথা মান ।।　　(পৃঃ-৪২০)

রঞ্জাবতী নিজের পুত্রকে যেতে দেবেন না — কথাটি বলতে গিয়ে তিনি রামায়ণের কৌশল্যা, দশরথের কথা উল্লেখ করলেন । তথাপি নিজের পুত্রকে ঢেকুর না যেতে আদেশ জারী করতে পারলেন না । ছলনা ক'রে মহামদ বারানসী বীরের পুত্রের কাটামুন্ড ময়নাগড়ে পাঠালেন । কোনরূপ বিচার বিবেচনা না করে বা সংবাদের যথার্থতা যাচাই করে না নিয়েই রঞ্জাবতী পুত্রশোকে কাঁদতে শুরু করলেন , লাউসেন অবশ্য মার আদেশ অমান্য করেই ঢেকুর যাত্রা করেছিলেন ।

বিধি হল্য নিদারুণ　　　ভাবিতে তোমার গুণ

হিয়া মোর বিদরিয়া যায় —

*　　*　　*　　*　　*

ঘুচিল সকল সাধ　　　বিধাতা সাধিল বাদ

অভাগিনী কি উপায় করি ।　　(পৃঃ-৪৩৩)

ছেলে মাতার আদেশ অমান্য করেছে । কিন্তু মা ছেলেকে দোষা-রোপ না করে' নিজেকেই পাপী, অভাগিনী মনে করছেন — পুত্রবধূদের

তিনি বলেছেন —

অনেক অধর্ম কর্যা আমি অভাগিনী ।   (পৃঃ- ৪১০)

মধ্যযুগীয় নারীদের পক্ষে এই জাতীয় আক্ষেপ — এই ধরণের দৈবনির্ভরশীলতা স্বাভাবিক ।

কালুর স্ত্রী লখ্যা যথার্থ বীরাঙ্গনা । এই চরিত্রে বীরত্ব, নিষ্ঠা, স্নেহ, কর্তব্যবোধ এবং তীক্ষ্ণবিচার বুদ্ধি এমনভাবে মিশেছে যে আপাত-দৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না । তবে এই চরিত্রও ধর্মানুগৃহীত এবং দৈবনির্ভরশীলা । মহামদের চক্রান্তে, কর্ণসেনের অবর্তমানে রাজ্যে সর্বনাশের ভ্রূকুটি । কালুবীর ঘুমে অচেতন । লখ্যা বলছে —

উঠহে পরাণ ধন অভাগিনী ডাকে
সেন গেল রাজ্যভার সঁপিয়া তোমাকে ।   (পৃঃ- ৫২৩)

সমরে লখ্যার পুত্র প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে । লখ্যাই যুদ্ধে পাঠিয়েছিল তাকে, যুদ্ধের ফলাফল সে ভাবেনি — তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ময়নাকে রক্ষা করা । কালুবীর সমরে প্রাণত্যাগ করলেও ভেঙ্গে পড়েনি । শুধু বলেছে —

আমি কি করিব একা   ভাই বন্ধু নাস্তি সখা
এবে হল্য অনর্থভাজন ।   (পৃঃ- ৫৩৯)

শুধু লাউসেন প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। স্বামী ও পুত্রকে যে যুদ্ধে পাঠিয়েছে — সে নিজেও যুদ্ধে অবতীর্ণা। একদিকে লখ্যার শৌর্যের প্রকাশ — অন্যদিকে দৈবাধীন অসহায় ভাব দেখে বিস্মিত হতে হয়। এই দোলাচল চিত্ততা আমাদের মনে বিষাদভাবের সৃষ্টি করে। স্বামী-পুত্রকে হারিয়েও লখ্যা বিধিকে দোষারোপ করবে না, নিজেকে অভাগিনী বা শক্তিহীনা মনে করবে না — এই ছিল প্রত্যাশিত।

চ) গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস — কবি শুকুর মাহমুদ — অষ্টাদশ শতক।

দশম শতকের দিকে সমগ্র উত্তর ভারতে শৈবধর্মের (দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় — নাথধর্ম 'শৈবধর্মের ভগ্নধ্বজা') প্রচলন হয়েছিল। হিন্দুতন্ত্র, শৈবমত, হঠযোগ, বৌদ্ধতন্ত্র ইত্যাদির সমবায়ে একপ্রকার ধর্মীয়সাধনা বাঙলাদেশে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। এই শৈবনাথ ধর্মকে কেন্দ্র করে' বাঙলায় ও বাঙলার বাইরে বহু গল্প ও পাঁচালী প্রচলিত ছিল কিন্তু এই সাহিত্যের প্রাপ্ত পুঁথির কোনটিই অষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তী নয়। সমগ্র সাহিত্য নাথ পুরুষদের যৌন অধঃপতনের কাহিনীতে পূর্ণ। আদিগুরু মীননাথ কদলী সহরে ষোলশত নারী পরিবেষ্টিত হয়ে সাধনভজন সম্পূর্ণ

রূপে ভুলে গিয়ে যৌন সাধনায় মগ্ন ছিলেন। শিষ্য গোরক্ষনাথ তাকে উদ্ধার করেন। হাড়িফার সঙ্গে ময়নাবতীর অবৈধ সম্পর্কের কথা নাথ সাহিত্যে সুবিদিত। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িফা প্রভৃতি সিদ্ধাগণ ছিলেন এক একজন নারীর যৌনমিলনের সাথী। রাজা মানিকচন্দ্রের মৃত্যুর পরে গুপিচন্দ্রের জন্ম হয় হাড়িফার ঔরসে। এই জারজ পুত্রকে সমাজে সম্মানীয় ব্যক্তি হিসাবে সুপরিচিত করাবার উদ্দেশ্যে ময়না তাকে জোর করে সন্ন্যাসে পাঠান এবং বারো বৎসর সন্ন্যাসধর্ম প্রতি-পালনের পর গুপিচন্দ্রের মানসম্মান বেড়ে যায় এবং ঘরে ঘরে তার কাহিনী প্রচারিত হয়।

বৌদ্ধধর্মের অবসানকালের কিছু আগে বৌদ্ধ-গুরুদের মধ্যে যে অনাচার ও ব্যভিচার প্রবেশ করেছিল, আদিতে নাথগুরুরাও তা থেকে মুক্ত ছিলেন ব'লে মনে হয় না। কায়াসাধনের সঙ্গে নারীসাধনের রেওয়াজটা বোধ হয় তান্ত্রিকদের মধ্যে গোড়া থেকেই প্রচলিত ছিল। এই প্রসঙ্গে দিনাজপুরের প্রবীণ এডভোকেট মনস্বী বরদাভূষণ চক্রবর্তী নাথগুরু প্রভৃতিদের মধ্যে যৌন ব্যভিচারের দৃষ্টান্তগুলিকে মাতৃতান্ত্রিক **(Matriarchal)** পরিবার প্রথায় প্রচলিত যৌনমিলনের ব্যাপারে নারী স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত বলে' উল্লেখ করেন। তাঁর মতে প্রাক্-আর্যযুগ থেকে আরম্ভ করে' মাতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথা ময়নামতীর সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। আমরা জেনেছি, নিজের জারজ পুত্রকে সমাজে

প্রতিষ্ঠা দেবার জন্যই ময়নামতী তাকে সন্ন্যাস গ্রহনে বাধ্য করেছিল ।

এই মতবাদে সংশয়ের সম্পূর্ণ নিরসন হয় না । এটি এক বিরাট সামাজিক প্রশ্ন — এতে নিশ্চয়ই বিতর্কের অবকাশ আছে ।

ত্রিভুবন জিনিঞা রূপ ছিল মক্তেনামতী ।
স্বামীর রস নাহি জানে সেহি মহাসতী ।।
একরাত্রি না বঞ্চিল স্বামীর বাসরে ।
একপুত্র হইল তার যতি গোর্খের বরে ।।
মক্তেনামতী হইয়াছিল গোর্খের সেবক ।
গুরুর প্রসাদে হইল মুনির বালক ।। (পৃ:-৩)

মক্তেনামতী এক রাত্রিও স্বামীর বাসরে বাস না করে গর্ভবতী হয়েছে । আর এই একপুত্র তার জন্ম নিল 'যতি গোর্খের বরে ।' এই 'বর' জিনিষটা কি তা আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না । এই অবৈধ সম্পর্ককে বরণীয় করে তোলাই ছিল ধর্মের কাজ - অন্তত মধ্যযুগীয় সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় । অসমর্থ পুরুষের স্ত্রী হিসেবে জীবন কাটাতে হবে পতিব্রতা সতীসাধ্বী রূপে বিখ্যাত হবার জন্য নারীকে । আর সেই ব্রত থেকে চ্যুত হলে পুরুষ সমাজ তাকে শাস্তি দেবে । কাজেই ধর্মীয় আবরণ দিয়েই জীবনের অন্যতম স্বাভাবিক ক্ষুধারই একটি যে যৌনক্ষুধা, তার নিবৃত্তি করতে হবে নারীকে । অথচ পুরুষের বেলায় একাধিক স্ত্রী

নিয়ে বসবাস ও যৌন জীবনযাপনে কোন স্খালন বা পতন বা পাপ বোধের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় না ।

যে মন্ত্রেনামতী নিজ সন্তানাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করলেন গুরু গোর্খের বর নিয়ে, তার পুত্র গুপিচন্দ্রকে যখন বিবাহ দিলেন তার পিতা মানিকচন্দ্র, তখন দেখা গেল এক সঙ্গে তিনজন যুবতীকে পুত্রবধূ রূপে নিয়ে এলেন আর একজন নারী এলো যৌতুকরূপে । এই যৌতুক শব্দটিই তো প্রমাণ করে দেয় যে অসহায় নারী পুরুষ সমাজে গাইগরুবাছুরের মত যৌতুক দেবার সামগ্রীরূপে ব্যবহৃত হত । তাদের মানসিক চাহিদা রুচি, আশা, আকাঙ্ক্ষার কথা কেউই ভাববার অবকাশ পাননি । তাই কাব্যেও তার কোন প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় না। নিম্নোদ্ধৃত পদ কটিতে এই চিত্র প্রাজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে ।

যেন কন্যা অদুনা তেমতি গুপিচন্দ্র ।
একভাগে দুইতনু বিধাতার নিরবন্ধ ।।
কন্যাপাত্র দেখি রাজার মনেতে কৌতুক ।
ছোট কন্যা পদুনাক করিল যৌতুক ।।
তিন বিভা করিল রাজা পাইল চারি নারী ।
বিভা করিয়া রাজা আইল নিজ পুরী ।। (পৃঃ-১৫)

গুপিচন্দ্র যখন মাতার আজ্ঞায় সন্ন্যাস যাত্রার সংকল্প নিয়ে তার

স্ত্রীদের কাছে সে কথা জানালো তখন অদুনার উক্তির শেষে পদুনার উক্তি লক্ষণীয়। পদুনা এসেছে যৌতুক হিসেবে। কিন্তু সেও তো একটা জীবনের অধিকারী। তারও তো আশা আকাঙ্ক্ষা সাধ আহ্লাদ থাকতে পারে। কবি অবশ্য মরমীর সঙ্গে সেই মানসিকতাকে রূপ দিয়েছেন।

মরি আমি মনস্তাপে   বিভা না দিল বাপে
পিতা আমাক দিলেন যৌতুক।।
*   *   *   *   *
বিভা না হইল মোর   না হইল সয়ম্বর
অদুনার হইলাম আমি চেড়ী।।   (পৃঃ-১১৬)

মধ্যযুগের ধর্মীয় চেতনাও অদ্ভুত। যৌন ব্যাভিচারকে ধর্মের আবরণে ঢাকা দেবার প্রয়াস আমরা মত্রেনামতীর বেলায় লক্ষ্য করলাম। কিন্তু ধর্মজীবন যাপনের বেলায় যে সর্ত আরোপ করা হচ্ছে 'হাড়িফা'র মুখ দিয়ে, সেখানে পরিষ্কার বলা হচ্ছে যে ব্যক্তি নারী নিয়ে ঘর করতে চায়, জ্ঞান সাধন করে অমর হবার যোগ্যতা তার নেই। হায় মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থা। যে নারী হতে মানবজীবনের স্রোতধারা বহনশীল সে নারীকেই ধর্মজীবন যাপনের পক্ষে পুরুষ দ্বারা পরিত্যাজ্যা করেছে সমাজ। আধুনিক চিন্তাধারায় নারীকে সহধর্মিনী বলা হয়েছে। মধ্যযুগে নারীকে অপাংক্তেয় করে রাখা হয়েছে। নারী ছিল যৌনক্ষুধা মিটাবার বেলায় শয্যাসঙ্গিনী কিন্তু ধর্মসাধনার বেলায় পরিত্যাজ্যা।

হাড়িফা বলেন শুন মত্রে নামতী রাই ।
মৃকুল সহরে রাজা করেন রাজাই ।।
রাজ্য করেন গুপিচন্দ্র লইয়া চারি নারী ।
কিমতে তাহাকে আমি জ্ঞান দিতে পারি ।।
যেজন করিতে চাহে স্ত্রী লয়া ঘর ।
জ্ঞান সাধিতে না পারিবে না হবে অমর ।।
নারী পুরী ছাড়িয়া যদি হএ দেশান্তরী ।
তবে সে তাহাকে আমি জ্ঞান দিতে পারি ।। (পৃঃ- ২৪)

সাধক হাড়িফা মত্রে নামতীকে যে বিস্তর উপদেশ দিয়ে গুপিচন্দ্রের অমরত্ব বিধানের পথ দেখালেন সেখানেও নারীকে পরিত্যাগ না করলে যে সাধন পথে অগ্রসর হওয়া যায় না সেই মানসিকতারই প্রকাশ লক্ষ্য করি।

স্ত্রী লইয়া (যেবা) করে সংসারে বসতি ।
অমর হইতে পারে কি তার শকতি ।।
রাজ্য করে গুপিচন্দ্র লইয়া চারি নারী ।
কিমত প্রকারে তাহাকে জ্ঞান দিতে পারি ।।
নারী পুরী ছাড়ি যদি হএ দেশান্তর ।
সেবক করিয়া তখন করিব অমর ।। (পৃঃ- ৫৪)

আর এই নিষ্ঠুর যুক্তি-কে সমর্থন করার জন্য মত্রে নামতীরাই

নিজপুত্রকে বোঝাচ্ছেন রামায়ণ মহাভারতের উদাহরণ দিয়ে। এ সমস্ত উদাহরণগুলিকে কবি এমন যুক্তি দিয়ে সাজিয়েছেন যাতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে নারী হতেই সমস্ত সর্বনাশ সংঘটিত হয়েছে। এমনকি নারী সঙ্গমে পুরুষের ধাতুক্ষয়কে মৃত্যুর সমান রূপে চিত্রিত করে দেখিয়ে নারীর প্রতি পুরুষের ঘৃণার ও ভীতির ভাব জাগিয়ে তোলা হয়েছে। কেবলমাত্র 'ময়নামতীরাই', 'গঙ্গা', 'লক্ষ্মী' ইত্যাদি কিছু নারী ছাড়া সবাইকে বলা হয়েছে 'ইহা ছাড়া যত নারী সব দুরাচার।' স্ত্রী সঙ্গমে ক্রমে 'গাভুরালি' ক্ষয় হয়ে মৃত্যুপথে যেতে হবে। আর মৃত্যুর পর দুই-চার দিন দুঃখ করবে নারী তার বেশি নয়। এমনি এক নরনারীর মিলিত জীবনকে নিয়ে আঁকা হল যা ধর্মসাধনার দ্বারা কাল্পনিক অমরত্বের দ্বার হয়ত খুলে দেবে। কিন্তু বাস্তব জীবনে নারীর প্রতি সামাজিক অবজ্ঞা, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাবই প্রতিষ্ঠিত হবে।

> সর্বদোষ স্ত্রীর বাছা একখানি গুণ।
> স্ত্রীর পেটেতে যদি জন্মে মহাজন।।
> এক নারী তোমার মাও ময়নামতীরাই।
> আর যত নারীর কথা শুন আমার ঠাত্রি।। (পৃঃ- ৬৩-৬৪)

এই 'ময়নামতী' যিনি প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস দ্বারা স্বীয় ব্যভিচারকে ধর্মীয় মহাভাব দ্বারা মহিমা মণ্ডিত করে নিজপুত্রের পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য তৎপর, গুপিচন্দ্রের পিতার মৃত্যুর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলতে চেয়ে-

ছেন যে তিনি স্ত্রীর সেবক হ'তে চাননি জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। এখানে মাতৃতান্ত্রিকতার রেশটুকু বজায় আছে লক্ষ্য করা যায়। মঙ্গেনামতীর কার্যাবলীও মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থারই একটা কঙ্কালরূপ। কোন স্থির সিদ্ধান্তে সমাজ পৌঁছাতে পারেনি বলেই একদিকে নারী পরিত্যাজ্যা —অপরদিকে মঙ্গেনামতীদেরই প্রাধান্য সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে —

তোমার পিতা বলে আমি প্রাণে যদি মরি।
তবুও স্ত্রীর সেবক হইতে নাহি পারি ।।
এতেক কহিয়া রাজা করে অহঙ্কার।
তেকারণে গেল রাজা যমের দুয়ার ।।   (পৃঃ- ৭৯)

গুপিচন্দ্রের অন্যতমা স্ত্রী অদুনার অসহায় অবস্থা লক্ষণীয়। এই ছত্রগুলির মধ্য দিয়েই মধ্যযুগের নারীর আর্ত হাহাকার ফুটে উঠেছে। সমাজে নারীর অন্য কোন মর্যাদা নেই কেবল একজন পুরুষের দাসী রূপে নিজেকে জাহির করা ছাড়া। এ'না হলে নারীর জীবন ব্যর্থ, অর্থহীন এক মহাশূন্যতায় ভরা —

অদুনা বলেন প্রভু শুন গুণমান।
স্বামী বিনে নারীলোকের নিস্ফল জীবন ।।
নারীকুলে জন্ম যার নাহি প্রাণপতি।
চন্দ্রবিনে দেখি যেন অন্ধকার রাতি ।।

জলবিনে মৎস্যের জীবার নাহি আশ ।
স্বামী বিনে নারী লোকের সকলি বিনাশ ।।
জিউ বিনে শরীরের নাহিক উপাএ ।
স্বামী বিনে নারী লোকের মিথ্যারূপ হএ ।। (পৃঃ-৯০)

শ্রীকণ্ঠের হাজার আকুতি সন্ন্যাসে যাবার সিদ্ধান্তে অটল গুপিচন্দ্রের মনে কোন রেখাপাত করে না । যে গুপিচন্দ্র সিদ্ধান্তের পূর্বে এই নারী সমূহকে ত্যাগ করার কথা ভাবতেই পারেনি - যেটা তার ছিল স্বাভাবিক জীবন - সেই গুপিচন্দ্র যখন অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম সাধন জীবনে প্রবেশের সিদ্ধান্ত করল তখন তার যুক্তি পালটে গেল । সে এখন মধ্যযুগীয় সমাজের প্রতিনিধি । তাই তার কণ্ঠে ধ্বনিত হল সেই সব মধ্যযুগীয় যুক্তি যা নারীর জীবন, যৌবন সব কিছুকে ক্রীড়ার সামগ্রী বানিয়েছে । যখন সখ হল তখন শিশু যেমন আদর করে তার পুতুলগুলোকে সাজায় আর যেই খেলার সখ মিটে গেল অমনি খেলার পুতুলগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলে গেল মার কোলে । সেই খেলার পুতুলের মতই যেন মধ্যযুগের নারী ।

নারীর যৌবন (যেন) মহাকালের আকার ।
উপরে চিকন দেখি ভিতরে আঙগার ।।
নারীর যৌবন যেন মহাকালের ফল ।
নযরে পাপের কারণ সংসার বিকল ।। (পৃঃ-৯৫)

আর সেই সমাজে বসবাসকারী নারীরও মানসিকতা গড়ে উঠেছে পুরুষের উপর চরম নির্ভরশীলতা দিয়ে। তাই তারা ভাবতেও পারেনা পুরুষের আশ্রয় ছাড়া বাঁচবে কেমন করে। স্বামী মারা গেলে যে কঠোর নির্যাতন ভোগ করতে হত মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থায় সেই নির্যাতনশীল জীবনের বীভৎস সম্ভাবনাই নারীমনকে নিয়ন্ত্রিত করত। পুরুষের একজন স্ত্রী মারা গেলে তারা অবলীলা ক্রমে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে সমাজে মাথা উঁচু করে বেড়াবার অধিকারী। আর নারীর সে অধিকার নেই। আজও এই বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে দাঁড়িয়েও আমরা সেই সামাজিক অভিশাপ হতে মুক্তি পাইনি।

ভাগ্যবতী নারী যাত্রিও স্বামীর আগে মরে।
অভাগিনী নারী তাহার স্বামী নাহি ঘরে।। (পৃঃ-১০০)

পুরুষ তার স্বৈরতন্ত্রী চেহারা নিয়ে স্ত্রী সঙ্গ পরিত্যাগ করে মহাসাধকের অমর আসন লাভের আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার জন্য তাচ্ছিল্যকর যুক্তিতে অটল। গুপিচন্দ্রের উক্তি তারই প্রমাণ।

রাজা বলে শুন তোরা রাণী চারিজন।
স্ত্রীসঙ্গে লইয়া জ্ঞান সাধিবে কোন জন।।
স্ত্রীসঙ্গে করি যদি হইবে সন্ন্যাসী।
সর্বলোক কহিবে আমাক ভন্ড তপস্বী।। (পৃঃ-১০০)

গুপিচন্দ্রের স্ত্রীরা স্বামী-স্ত্রীর মিলিত জীবন যাপন দ্বারা সাধন প্রণালীর উল্লেখ করতে ছাড়লেন না। যে শাস্ত্র গ্রন্থ গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস যাত্রার অনুকূলে স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগের বা স্ত্রী হতে সর্বনাশের উদাহরণ বক্ষে ধারণ করে আছে — সেই শাস্ত্র গ্রন্থের উদাহরণ দিয়েই এরা প্রমাণ করতে চাইলেন যে ভোলানাথ মহামুনি আদি বহুসাধক স্ত্রী সহবাস করেও সিদ্ধলাভ করে জীবন সার্থক করেছেন।

স্ত্রী ছাড়িলে যদি অমর হএ কায়া।
তবে কেন নাহি ছাড়ে ভোলানাথ মহামায়া।।
পুরুষের স্ত্রী নারী নারী সে জননী।
নারী লয়া ঘর করে যত মহামুনি।।
*   *   *   *
স্বামী সঙ্গে মুনি যদি না করে রমন।
কিরূপে হইল রাজা তোমার জনম।।   (পৃঃ-১০২)

কিন্তু মধ্যযুগীয় যুক্তি এসব যুক্তিকে খণ্ডন করে স্বীয় পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থার জয়গানে মুখরিত। যে সব ক্ষেত্রে সস্ত্রীক সাধন জীবন সফল হয়েছে তাঁরা সবাই দেবতা। মানুষের বেলায় সে সব যুক্তি খাটে না।

রাজা বলে শুন তোরা রাণী চারিজনা।
মনুষ্য হইয়া [দিলে] দেবের তুলনা।।   (পৃঃ-১০৩)

মানুষের জন্য সমাজ বিধান আলাদা । আর তথাকথিত দেবতা, যাদের স্বর্গরাজ্যের কোন অস্তিত্ব আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত মানসিকতায় নেই সেই দেবতাদের বিধান আলাদা । এই আলাদা বিধানের মধ্যে যারা সর্বপ্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করেন তারা কিন্তু এই পার্থিব জগতেরই মানুষ । কিন্তু তারা সাধারণ দরিদ্র ও অধ:পতিত মানুষের সমাজ থেকে উর্দ্ধে বসবাস করেন । মর্তমানুষ প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র জনতা। আর স্বর্গ তাদের বাসস্থান যারা এই দরিদ্র জনতাকে শোষণ করে স্বীয় স্ফীত কলেবর নিয়ে সমাজ বিধায়ক রূপে দাঁড়িয়ে আছেন দন্ড মুন্ডের কর্তা রূপে । আর এই সমাজের নারীর স্থান কোন মর্যাদার আসনেই বসানো নেই ।

এই সাহিত্য অনুশীলনেও আমরা দেখলাম যে নারী কেবল ভোগ্য পণ্যদ্রব্যের মত প্রয়োজনে গ্রহণীয় আবার প্রয়োজনের দাবিতেই পরি - ত্যাজ্যা । 'গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস' গ্রন্থে নারীরা পুরুষের খেলার পুতুলের মতই জীবন যাপন করেছে । এই কাব্যে আমরা তৎকালীন সমাজ রূপেরই প্রতিফলন দেখতে পাই ।

গ) লোক-সাহিত্য — অষ্টাদশ শতক ।

ময়মনসিংহগীতিকার পল্লীকবিরা মধ্যযুগের কবিদের মত কোন ধর্মীয় প্রেরণা বা রাজকীয় পৃষ্টপোষকতা লাভ করেন নি । অবশ্য গীতি-কবিতা ধর্মীয় উদ্দেশ্য বা ভাবনা নিয়ে রচিত হয় না । গীতিকবিতা চিরকালই কবির অনুভূতি ও আন্তর প্রেরণা সঞ্জাত । কিছুটা ভাবাবেগ ও কিছুটা প্রকৃতি প্রেমদ্বারা গীতিকবিতা সম্পৃক্ত ।

ময়মনসিংহগীতিকা প্রকৃতপক্ষে ধর্ম নিরপেক্ষ বলেই অনেকটা মধ্যযুগীয় যাবতীয় রচনা থেকে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পেরেছে । এই গীতিকাগুলির অধিকাংশ কাহিনীই জীবনের বাস্তব পটভূমিতে রচিত ।

মহুয়া —

মহুয়ার গভীর প্রেমের পাত্র নদ্যার চাঁদ । নদ্যার বাঁশীর সুরে মহুয়া নিশীথে ঘর ছেড়ে চলে আসে নদীর ঘাটে — মহুয়া তার প্রাণের সই পালঙককে বলে —

চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী সই, সাক্ষী হইও তুমি ।
নদ্যার ঠাকুর হইল আমার প্রাণের সোয়ামী ।।

কিন্তু কঠোর সমাজ ব্যবস্থা এই প্রেমের মূল্য দিতে চায় না । হুমরা বেদে চায় দলের খেলার মান বজায় রাখতে এবং রোজগার অক্ষুন্ন রাখতে — সুতরাং মহুয়াকে সে ছেড়ে দিতে পারে না । কিন্তু নদ্যার চাঁদ ব্রাহ্মণ যুবক — সে কি করে এক অজ্ঞাত পরিচয় বেদের মেয়েকে বিবাহ করবে ? তবুও নদ্যার চাঁদ জাত কুল ত্যাগ করে পথে এসে নেমেছে । কিন্তু মহুয়া ?

হুমরা বেদে সব কথাই জেনেছে । বেদের দল একদিন খেলা দেখাতে দেখাতেই এসেছিল রাজকুমার নদের চাঁদের প্রাসাদবাটি বামনকাঁদা গ্রামে । খেলা দেখতে গিয়েই সে সুন্দরী মহুয়াকে দেখেছিল । নদের চাঁদ তাদের থাকবার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল । কিন্তু হুমরা বেদের দল সে স্থানে থাকেনি । তখন মহুয়া বলছে —

আমি যে অবলা নারী আছে কুলমান —
বাপের সঙ্গে নাহি গেলে নাহি থাকব মান ।।

'অবলা নারী' 'কুলমান'— শব্দ দুইটি লক্ষ্য করা যেতে পারে । মধ্যযুগের অন্যান্য নারীর মতই সে এই দুটি কথা মুখস্থ করে' রেখে

বলে ফেলেছে। আসলে মহুয়া অবলা নয় — সবলা। সে বিধাতার উপর সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে কর্তব্য শেষ করেনি। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের খড়্গ তার বিরুদ্ধে উদ্যত রয়েছে জেনেও সে দৃক্‌পাত করেনি। মহুয়া বিদ্রোহ করতে জানে, উপযুক্ত ব্যবস্থা করতেও জানে। ওদের প্রেম উপলব্দির সত্যকে প্রকাশ করেছে। একদিন ঘাটে দু'জনের দেখা — নায়ক বললো —

জল ভর সুন্দরী কন্যা জলে দিছ মন।
কাইল যে কইছিলাম কথা আছে নি স্মরণ।।

মহুয়া সলজ্জ ভঙ্গীতে বলেছিল —

তুমি তো ভিন্‌দেশী পুরুষ আমি ভিন্ন নারী।
তোমার সাথে কইতে কথা আমি লজ্জায় মরি।।
কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার হিয়া।
এমন যইবন কালে নাহি দিছে বিয়া।।

নায়কের কণ্ঠে কৌতুক — সে বলেছিল,

কঠিন আমার মাতাপিতা কঠিন তাদের হিয়া।।
তোমার মত নারী পাইলে আমি করি বিয়া।।

কৃত্রিম রাগে মহুয়ার উক্তি —

লজ্জা নাই নিলজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর ।
গলায় কলসী বাইন্দ্যা জলে ডুইব্যা মর ।।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল নদের চাঁদ —

কোথায় পাবো কলসীকন্যা কোথায় পাবো দড়ি ।
তুমি হও গহীন গাঙ্ আমি ডুইব্যা মরি ।।

—'তুমি হও গহীন গাঙ্ আমি ডুইব্যা মরি ।'— এতো সব দেশের সব যুগের সব সাহিত্যের চরম ও পরম কথা । প্রেমের এত অকূল নদীর তল খুঁজে কে পেয়েছে ? নদের চাঁদ এই প্রেমের গহীন গাঙে ডুবে গেল । এদিকে মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে নদের চাঁদও বের হল পথে ।

অনেক ঘুরতে ঘুরতে দেখা হল মহুয়ার সঙ্গে এদিকে হুমরা স্হির করেছে দলের তরুণ খেলোয়ার সুজনের সঙ্গে বিয়ে দিবে মহুয়ার । এক রাত্রিতে এক ধারালো ছুরি দিয়ে হুমরা তাকে আদেশ করলো — নদের চাঁদকে হত্যা করতে । হিজল গাছের তলে ঘুমিয়ে ছিল নদের চাঁদ — ওরা দুজন তখন দেশ ছেড়ে পালালো । একই রূপে প্রেম জেগে উঠেছিল মধ্যযুগীয় রোমান্স ট্রিস্টান ও ইসল্ট এবং অকাসিন ও নিকো-

লেটের মধ্যে। ট্রিস্টান ও ইসল্ট শেষ পর্যন্ত গাছের পাতা এনে ঘর বাঁধলো। সুখে কেটে যায় দিনগুলো ।

পরে শিকারী কুকুরের সাহায্যে হুমরা বেদে ওদের খোঁজ পেল । মহুয়ার হাতে ছুরি উঠলো আবার — পিতার আদেশ চাঁদকে হত্যা করতে হবে ।

মহুয়া একবার পিতা ও একবার প্রেমিকের দিকে চেয়ে দেখলো — তারপর তার নিজের বক্ষেই তা আমূল বসিয়ে দিল , বেদের দল হত্যা করলো নদের চাঁদকে । মহুয়া — নদের চাঁদের অরণ্য অভিসার চিত্রের সঙেগ ট্রিস্টান ও ইসল্ট এবং অকাসিন ও নিকোলেটের প্রেমের আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায় । মহুয়া মৃত্যুর আগে বলেছিল — 'আমার চক্ষু নিয়া যদি দেখতা তবে বুঝতা আমার নদের চাঁদ কত সুন্দর ।' এই পালার শেষ দৃশ্যে হুমরার চোখে যে অশ্রুধারা সে কি অনুতাপের অশ্রু ?

পূর্ববঙেগর গীতিকাগুলির বৈশিষ্ট্য মহুয়া পালাটির মধ্যেই সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে । শুধু এই একটিমাত্র পালার আলোচনা করলেই মোটা-মুটি অন্যান্য পালার প্রকৃতিও বোঝা যাবে ।

প্রধানত: দুটি প্রেরণার উপর মধ্যযুগের বাঙলা কাব্য সাহিত্য

দাঁড়িয়েছিল — তার প্রথমটি হল ধর্ম সম্প্রদায়, দ্বিতীয়টি রাজকীয় আনুকূল্য।

মলুয়া —

'মলুয়া' পালাটিতে তৎকালীন মুসলমান শাসককুলের ও তাদের কর্মচারীদের নারীদেহ লোলুপতা অপূর্ব ভাবে চিত্রিত হয়েছে। কাব্যের প্রারম্ভেই কবি বলেছেন —

ঘরের বউ টাইন্যা লইব
দেখিলে সেয়ানা।
দারুণ দেওয়ান কাজী
না মানিব মানা।। (পৃঃ-১০১)

'দারুণ দেওয়ান কাজীদের' ক্ষমতার কাছে পরাভূত হিন্দু কুলপতিরা দেওয়ান কাজীদের অসদাচরণের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিবাদ করার মত শক্তি বা সামর্থ রাখতেন না বলেই তাদের সমস্ত আক্রোশ সমাজের দুর্বল অংশের উপরেই গিয়ে বর্তেছে। মলুয়ার সারাটা জীবন যে সংগ্রাম, সে সংগ্রাম শুধু তৎকালীন যুগের পতিভক্তি পরায়ণাদের চরিত্রেই নয়, আধুনিক যুগের রমণীর চরিত্রেও দুর্লভ। স্বামীর সমস্ত বিপদ মলুয়া অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে দূর করেছে, কাজী ও দেওয়ানদের মধ্যে পরস্পর

ভুলবোঝাবুঝির সৃষ্টি করার জন্য কপট প্রেমের অভিনয় করেছে - এসবই তার স্বামীকে ঐ দুরাত্মাদের কোপদৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্যই। কন্যা কয় —

তোমার কাজী আমার দুষমন।
হেন কাজী থাকতে না হইব মনের মিলন ॥
ধইর‍্যা মোর পাছে লাইগ্যা আছে।
কোন ফয়দা না দেইখ্যা তোমারে কইল্যাছে ॥
অতি বড় পাপিষ্ঠ কাজী নারীর দুষমন।
যত দুঃখ দিল কাজী না হয় পাশরণ ॥ (পৃঃ- ১৭৩-১৭৪)

স্বভাবতই দেওয়ান হুকুম করেছে —

নিরল্যমার চরে গিয়া কাজীরে দেও শূলে।

এরপরেও মলুয়া দেওয়ানকে নানা ফন্দি ফিকির করে ভুলিয়ে রেখেছিল। আর প্রলুব্দ করে দেওয়ানকেও নারীদেহ লোলুপতার শাস্তি দিয়েছিল। কিন্তু এত করেও মলুয়া তার জীবনকে সহজ সরল করে নিতে পারলো না। কারণ কাজী দেওয়ানরা তার সতীত্ব হরণ করে তাকে বিবি করে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু হিন্দু কাপুরুষেরা তাদের সমাজের এক অসহায়া নারীর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে পারেনি। সেই নারী স্বীয় বুদ্ধিবলে যখন তার স্বামীকে বাঁচালো এবং নিজেও উদ্ধার পেল

তখন স্বভাবতই আমরা চাইবো ওরা দুজনে সুখে ঘর বাঁধুক । কিন্তু হীন বীর্য কাপুরুষতা সোজাপথে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগের চরিতার্থতা সাধন করতে না পেরে নারী নির্যাতনে মেতে উঠলো ।

দুষমনি করিল যত জ্ঞাতী বন্ধু জন ।। (পৃ:- ১৭৮)

তাদের মত —

মুসলমানের ভাত খাইল মুসলমানের ঘরে ।
এমন সুন্দর কন্যা ধর্ম রাখিতে না পারে ।।
হাউলীতে খাইলে নারী সতী নাইত রয় ।
বলবান লুব্জা তার জাতী নাশ করয় ।। (পৃ:- ১৭৯)

এবং সেই রামায়ণের প্রভাব রামচন্দ্রের সীতা বিসর্জন এ যুগের কাব্য নায়কের জীবনেও এসে গেল ।

ভাইব্যা চিন্তা চান্দ বিনোদ ত্যাজে ঘরের নারী ।
(পৃ:- ১৭৯)

চমৎকার সমাজ ব্যবস্থা । আরও চমৎকার নারী জীবনের সহনশীলতা ও প্রতিষ্ঠিত আদর্শবাদ ।

কোথায় যাই কারে কই মনের বেদন ।
সোয়ামীতে ছাড়িল যদি কি ছার জীবন ।।

ধিক্কার নেই, গালাগালি নেই নীরব আত্মসমর্পণ। যে মলুয়াকে লম্পট শাসককে বা লম্পটের প্রস্তাব বহনকারী নেতাই কুটনীকে তীর্যক ভাষায় নিন্দা করতে দেখি সেই মলুয়া স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েও এতটুকু নিন্দা, তিরস্কার বা প্রতিবাদ করলো না। স্বামী পরিত্যাগ করলেই জীবন মূল্যহীন হয়ে পড়ে। শুধু এখানেই শেষ নয় আরও আছে। যে স্বামী স্ত্রীর দৌলতে জীবন ফিরে পেলো, যে স্ত্রী কাজীকে তার স্বামীর জন্য খোঁড়া কবরেই নিক্ষেপ করেছে বুদ্ধি বলে, যে স্ত্রী দোর্দণ্ড প্রতাপশালী দেওয়ানকে নাজেহাল করে ছেড়ে দিয়েছে যার ফলে 'দেওয়ান সাব রইলো নীরব' (পৃঃ-১৭৮) সেই কাপুরুষ স্বামীর জন্য মলুয়া প্রস্তাব করেছে।

ভালা দেইখ্যা সোয়ামীরে আগে করাও বিয়া।
পঞ্চ ভাইরে মলুয়া কয় মাথার কিরা দিয়া।।

আর নিজের জন্য বিধান নিয়েছে —

বাইর কামুলীর কাম করে মনের সন্তোষে।
সতীনেরে রাখে মলুয়া মনের হরষে।। (পৃঃ-১৮০)

বাইরের কাজ কর্ম করে দিন কাটাচ্ছে মলুয়া — আর চাঁদ বিনোদ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নিয়ে সুখে সংসার করছে। নিজের জীবনের কোন স্বাদ আহ্লাদ নেই - শুধু আছে আদর্শ বোধ আর তার জন্য কর্তব্য।

তাই চাঁদ বিনোদ যখন আবার সাপের কামড়ে মৃত্যু মুখে পতিত হল তখন আমরা নব পরিনীতা সতী সাধ্বী স্ত্রীর কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করতে দেখিনা। আবারও ঐ অপমানিতা রমণীকেই এগিয়ে আসতে হল স্বামীকে বাঁচাবার জন্য। মনসামঙ্গলের প্রভাব যুক্ত কবি এবার মলুয়াকে দিয়ে মৃত স্বামীকে জীইয়ে আনলেন।

এর পরেও দেখা গেল বিনোদের মামা ও পিসার দল বিধান দিলেন যে দেওয়ানের হাউলীতে যে নারী থাকে তার জাতিধর্ম সব চলে গেছে। কাজেই তাকে ঘরে তোলা মহাপাপ। জাতি নেই ধর্ম নেই এমন নারী যদি মৃত মানুষের প্রাণ নিজের জীবনকে তুচ্ছ করেও ফিরিয়ে আনে সে স্পর্শে পাপ হয় না। পাপ হয় এমন আত্মত্যাগিনী নারীকে তার ন্যায্য মর্যাদা দিতে। এটা শুনতেও ভাবতে অবাক লাগে।

অবশ্য বিনোদের মা তার বক্তব্য ঠিকই রেখেছেন। তার কাছে 'মরা জীয়াইল বউ সতীর মান রাইখ্যা।' তাই তিনি বউকে বাইরের ঘরে না রেখে তার কোলে রাখবেন। নারীর প্রতি নারীর এই স্নেহ-বোধ ও কর্তব্য বোধের নিদর্শন মধ্যযুগে দুর্লভ। কিন্তু তাতে তো আর মলুয়া তার পাওনা মর্যাদা পেল না।

নিষ্ঠুর বিধি এই আত্মত্যাগিনী মলুয়াকে বাঁচতে দিল না —

তাকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হল। ভাঙা নৌকায় উঠে মাঝ দরিয়ায় গিয়ে ডুবে মরতে হল। ব্যর্থ জীবন সংগ্রামের যুক্তি 'আমি বেঁচে থাকতে আর স্বামীর জীবনের কলঙ্ক যাবে না -- তাই স্বামী যাতে নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন করতে পারে তার সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে, সেজন্য আমার আত্মহত্যা করাই শ্রেয়।'

কঙ্ক ও লীলা —

'কঙ্ক ও লীলা'র কাহিনীটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা বিরহ অংশের দ্বারা প্রভাবিত।

কঙ্ক ও লীলার প্রেমের স্বীকৃতি গর্গমুনি দেননি। গর্গমুনির কন্যা লীলা। কঙ্ক তাঁর আশ্রিত। তাঁর অগোচরে তাদের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হয়। লীলার সঙ্গে কঙ্কের যে প্রেম তাকে স্বীকৃতি দেওয়া দূরে থাক, তিনি লীলাকে দিয়ে কঙ্ককে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন। লীলা তা পারেনি — প্রেমিকের প্রাণরক্ষা করেছে কিন্তু প্রেমিককে হারিয়ে তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করেছে।

লীলা আশ্রিত কঙ্কের প্রেমে আসক্তা। একথা প্রকাশ হয়েছে লোক মুখে।

আর এক কথা রটে না যায় কথন ।
কঙ্করে সঁপেছে লীলা জীবন যৌবন ।।
মিথ্যা বদনাম তারা দিল রটাইয়া ।
কলঙ্কী হইয়াছে লীলা কুল ভাঙ্গাইয়া ।।
একেত কুমারী কন্যা অতি শুদ্ধমতি ।
কলঙ্ক রটাইল তার যত দুষ্টমতি ।।

গর্গ তার কন্যার পবিত্রতা সম্পর্কে রটনা শুনেই সন্দিহান হয়ে পড়লেন । লীলা ও কঙ্ক উভয়ের প্রাণনাশের ব্যবস্থা করলেন। লীলা সব লক্ষ্য করলো আর সেই বিষ মাখানো ভাত কঙ্ককে খেতে না দিয়ে কঙ্ককে পালিয়ে যেতে নির্দেশ দিল ।

কাল গরল বিষ অন্নে মাখাইয়া ।
আসিছে রাক্ষসী লীলা তোমারে খুজিয়া ।।
নাহী দয়া নাহী মায়া পাষান তার হিয়া ।
রাক্ষসী হইয়াছে লীলা মনুষ্য হইয়া ।।
কেমন করিয়া কিবা পরাণে ধরাই ।
নিজ হস্তে বিষ দিয়া তোমাকে খাওয়াই ।।
আজ তুমি ভিন্ন দেশে যাওরে পলাইয়া ।
মরিবে অভাগী লীলা এ বিষ খাইয়া ।।

শুন শুন শুনরে কঙ্ক আরে কঙ্ক আমার বচন ।
যাইবার বেলা দেইখা যাও লীলার মরণ ।।

—কঙ্ক আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে গেল । লীলার জীবনে নেমে এল শবরীর প্রতীক্ষা ।

সারাটি কাব্য ঘিরে লীলার আর্তক্রন্দন — এ যেন রাধার বিরহেরই মতো ।

মহুয়া পালায় বীরাঙ্গনা মহুয়ার একটি সুস্বরূপ যাও ফুটে উঠেছিল, কঙ্ক ও লীলা পালায় তার কোন চিহ্ন নেই — এখানেও দৈবনির্ভরশীলা অসহায়া এক বালিকার ছবি ।

কিন্তু হায়রে হৃদয় । লীলাকে না পেলে কঙ্কই বা কেমন ক'রে বাঁচবে ? সেকথা তো লীলা একবারও ভাবলো না । লীলা আধুনিক নারী হলে আর যাই হোক নিজের মৃত্যু কামনা করতো না । জীবন-কে উপভোগ করার জন্য তার সাহসিকতার অভাব থাকবে কেন ? মধ্য-যুগীয় চেতনায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার বোধের উন্মেষ হয়নি বলেই কাব্যের এই সব মহীয়সী প্রেমিকা তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে গিয়েছে ।

জীবনের জন্য জীবনকে বলি দেওয়ার অর্থতো মৃত্যু নয়। যে পিতৃ-হৃদয় প্রেমের মর্যাদা না দিয়ে প্রেমের পরিবর্তে মৃত্যুকে আহ্বান করেন — তাকে ত্যাগ করে' অনায়াসে লীলা চলে যেতে পারতো কঙ্কের সঙ্গে — তারপর সহস্র বাধা অতিক্রম করে' সাফল্য অর্জন করতো সেই সাফল্যে আজকের মানুষ অধিকতর তৃপ্তি পেতো।

জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতী —

যে কোন কাব্য গ্রন্থই সমকালীন সমাজ জীবন ও চেতনার প্রতিফলন বক্ষে ধরে রাখে। জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতী পালাতেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। চন্দ্রাবতীর প্রেম পবিত্র। জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতীর প্রেম তাদের মনের অলক্ষ্যে তিল তিল করে গড়ে উঠেছে, চন্দ্রাবতী ফুল তুলতে যেতো, জয়ানন্দ তাকে সাহায্য করতো।

> একদিন না তুইল্যা ফুল মালা গাইন্থ্যা তায়।
> সেইত না মালা দিয়া নগরে সাজায়।। (পৃঃ- ২১০)

ক্রমে যৌবন এলো। সঙ্গে সঙ্গে আসে লজ্জা। চন্দ্রাবতী আর জয়চন্দ্রের গলায় মালা পরিয়ে দেয় না। সে মালা গেঁথে গাছের ডালে রেখে দেয়। জয়ানন্দ গোপনে সে মালা নিজের গলায়

পরে। দুজনেই পরস্পরের প্রেমাসক্ত। কিন্তু বাক্যে তার প্রকাশ নেই। জয়চন্দ্র পুরুষ — প্রকাশের অধিকার তার ছিল, কিন্তু চন্দ্রাবতী নারী, নারী জীবনের মানসিকতা দিয়ে বাঁধা। পাছে নিজেকে প্রকাশ করলে লোকে কিছু বলে, পাছে সমাজে আলোড়ন জাগে। জয়চন্দ্র ওর ছোট-বেলার জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করে — তার উত্তরে চন্দ্রাবতী বলে —

ছুটুকালের কথা পরে স্বপন হয়্যা যায়।
সেই না কথা ধইর‍্যা কেউ সে কথা নাইত কয়।।

(পৃঃ- ২১৪)

জয়ানন্দ ওকে জানতে চায় — সে চিঠির সাহায্য নিলো। চন্দ্রা-বতী এই পুষ্পপত্রের জবাবে জানালো —

ঘরে মোর আছে বাপ আমি কিবা জানি।
আমি কেমনে দিবাম উত্তর অবলা কামিনী।। (পৃঃ- ২১৯)

জয়চন্দ্রের পক্ষ থেকে ঘটক পাঠানো হলো — বিয়ের ব্যবস্থা পাকাপাকি হলো।

এরপর জয়চন্দ্রের জীবনে আর একটি নারীর আবির্ভাব ঘটলো। রমণীর নাম আশমানী। কবি হয়তো সামাজিক অনুশাসনের ভয়েই হিন্দু পুরুষের সঙ্গে মুসলমান রমণীর প্রেমলীলাকে মধুর করে দেখাতে সাহস

করেন নি । জয়চন্দ্র আশমানীর দাম্পত্য জীবনের কোন চিত্রও কাব্যে উপস্থিত করেন নি ।

কিন্তু আবাল্য গড়ে ওঠা এক প্রবল মানসিকতা তাকে অবিরাম হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগলো । সে চন্দ্রাবতীর কাছে ফিরে আসবার প্রার্থনা জানিয়ে চিঠি লিখলো চন্দ্রাবতীকে । চন্দ্রাবতীকে সে একবার দেখবে — এই ছিল তার প্রার্থনা । চন্দ্রাবতী জয়চন্দ্রকে শেষ পর্যন্ত প্রার্থনার কোন জবাব দিতে পারেনি — তার অনুরোধে মন্দির নির্মিত হয়েছে — শিবপূজা করে আর রামায়ণ রচনা করেই সে জীবন কাটিয়ে দেবে — এই তার সংকল্প ।

চন্দ্রাবতী তখন মন্দিরে ধ্যানে নিবিষ্ট — দ্বারে করাঘাতের শব্দ । মন্দিরের দ্বার খুললো না চন্দ্রাবতী । পরে ঘাটে জল আনতে গিয়ে দেখলো — জয়চন্দ্রের মৃতদেহ জলে ভাসছে ।

আঁখিতে পলক নাই - মুখে নাইরে বাণী ।
পাড়ে খাড়াইয়া দেখে চন্দ্রা উমেদা কামিনী ।।

জয়চন্দ্র বিশ্বাস ঘাতক , সে ধর্মান্তরিত — সুতরাং তার এই পরিণতি স্বাভাবিক ।

কিন্তু জয়চন্দ্র অনুতপ্ত। ভুল মানুষেই করে — অনুতপ্ত হয়ে পূর্ব জীবনের পথে সে আবার ফিরে আসতে চেয়েছিল। সুতরাং সে মধ্য-যুগীয় সমাজ ব্যবস্থার অসহায় শিকার। কবি বলেছেন —

ক্ষমা যেথা হীন দুর্ব্বলতা
হে রুদ্র নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা।

চন্দ্রাবতী যদি মন্দিরের দ্বার খুলতো, জয়চন্দ্রের সঙ্গে কথা বলতো — সেকি তার দুর্বলতা? আমরা চন্দ্রাবতীকে অনর্থক নিষ্ঠুর দেখতে চাইনা — মানুষ অপরাধ করে — দেবীরা ক্ষমা করেন। চন্দ্রাবতীও নিষ্ঠুর সমাজ ব্যবস্থার শিকার। আর তার পিতা বংশী-বদন? তিনি এই পালার পরিণতির মুখে এত নীরব কেন? তিনি কেন চন্দ্রাবতীর প্রস্তাবে সম্মত হলেন? শিব পূজা আর আত্মত্যাগ — সে তো আত্মপ্রতারণা তথা আত্মনির্যাতনেরই নামান্তর।

ত) মহাভারত — কাশীরাম দাস — অষ্টাদশ শতক।

মহাভারত মহাকাব্য ভারতের সমাজ জীবনের একটি স্মরণীয় চিত্র। কিন্তু এই মহাকাব্যে তৎকালীন সমাজ জীবনের যে প্রতিফলন হয়েছে তাতে

নারী সমাজের গৌরব বোধের কারণ নেই। সামাজিক জীবনে নারীর স্হান ছিলনা একথা অবশ্য বলা চলে না — কিন্তু তা এত সামান্য যে সেই বিকাশও যেন দৈবানুগ্রহের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। আর নারীর সামাজিক ভূমিকা বলতে কিছু ছিল একথা বলাই চলে না। পারিবারিক জীবন ছিল। কিন্তু সেই পরিবার জীবনের নিয়ন্তা কোন অর্থনীতি নয়, ব্যক্তিগত মানসিক সম্পর্ক নয় যেন একটা নীতির ছকে বাধা সিদ্ধান্ত সমূহ। তাই যদিও পুরুষের জীবনে কোথাও কোথাও তার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায় নারীর বেলায় সেটা প্রায় দুর্লক্ষ্য। লক্ষণের দেওয়া গন্ডীর বাইরে এসেই সীতা বিরাট এক দুর্যোগ এনেছিলেন রামায়ণে, এটাই আমরা বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত। তাই পুরুষের দেওয়া জীবন-বৃত্তের মধ্যেই নারী জীবনের সার্থকতা ও সমাজ জীবনের শৃঙখলা নির্ভরশীল এটাই লক্ষ্য করা গিয়েছে মধ্যযুগের সাহিত্যে।

কাশীরাম দাস মহাভারত অনুবাদ করেছেন। এই অনুদিত মহা-ভারতের বিরাট দেহের সর্বত্র ইতস্তত: ছড়িয়ে আছে অনেক নারীচরিত্র। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা উপাখ্যানে মহারাজ দুষ্মন্ত আশ্রম বালিকা শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করে রাজধানীতে ফিরে গেছেন। পরে যখন শকুন্তলা রাজসভায় এসে স্ত্রীত্বের অধিকার চাইল তখন রাজা দুষ্মন্ত অত্যন্ত অশালীন ভাবে শকুন্তলাকে বললেন —

বেশ্যাবলি মেনকারে কেবা নাহি জানে ।
বেশ্যার প্রকৃতি তোর খণ্ডিবে কেমনে ।।
বেশ্যা গর্ভে জন্ম তোর বেশ্যার প্রকৃতি ।
এই পুত্র সেই মত নহে মোর মতি ।। (পৃঃ-৫৭)

—এই তীব্র অপমানের প্রতিক্রিয়ার ভাষা কবি তার কণ্ঠে যা দিলেন তা অতিমার্জিত — এ ভাষা দুর্বলের ভাষা, অসহায়ের আত্ম-তৃপ্তি মাত্র ।

যত নিন্দা কর, সহি স্বামীর কারণে ।
আপনা না জান, নিন্দা কর অন্যজনে ।।
* * * *
হেন মিথ্যাবাদী তুমি হইলে নিশ্চয় ।
তোমার নিকটে থাকা উচিত না হয় ।। (পৃঃ-৫৭)

এখানে শকুন্তলা ধর্মানুশাসিতা — নিয়তিকে মেনে নেবার ধর্মীয় চেতনা তার ব্যক্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে ।

দেবযানী শর্মিষ্ঠা কলহ উপাখ্যানেও এই চিত্রই দেখতে পাই । শর্মিষ্ঠা শূদ্রারমণী — ভুল করে সে দেবযানীর কাপড় পরেছে —সেই অপরাধে দেবযানী তার জাত তুলে গালিগালাজ দিয়েছে । শর্মিষ্ঠা

অপমানে অধীরা হয়ে দেবযানীকে কূপে নিঃক্ষেপ করে চলে গেছে। দেবযানী রাজা যযাতি কর্তৃক উদ্ধার প্রাপ্তা হয়ে পিতা শুক্রাচার্যকে সব কথা জানাল। শুক্রাচার্য দৈত্যরাজপুরী ছেড়ে যাবার সংকল্প করলেন। দৈত্যরাজ অনুনয় করলে দেবযানী সর্তারোপ করল — শর্মিষ্ঠা তার সহ-চরী সহ তার দাসী হয়ে থাকলে তারা দৈত্যপুরী ছেড়ে যাবেন না। অতঃপর —

শর্মিষ্ঠা বলেন, পিতা যে আজ্ঞা তোমার।
হইলাম দাসী আমি কর্ম্মে আপনার।।
*　　*　　*　　*
জ্ঞাতির কুশল আর পিতার বচন।
দুই ধর্ম্ম রাখিতে করিনু দাসীপণ।।　　(পৃঃ- ৬৪)

'জ্ঞাতির কুশল আর পিতার বচন' রূপ দুই ধর্মরক্ষার জন্য এই স্বেচ্ছা-কৃত দাসীত্ব মেনে নেওয়া আজকের দিনে আমরা ভাবতেই পারিনা। এখানে জাতপাতের যে নির্মম চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা আধুনিক রুচির বিরোধী। শর্মিষ্ঠার বীর্যোদ্দীপ্ত যে চরিত্রের পরিচয় আমরা পেলাম দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপের মধ্যে হঠাৎ ধর্মানুশাসনে এসে তা দপ্ করে নিভে গেল যেন। অবশ্য দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপ করে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়াকে সমর্থন করা চলেনা। আর এটা নারীর প্রতি নারীর আচরণ।

ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদূরের জন্ম কাহিনীতে যে চিত্রের উল্লেখ

রয়েছে তাতে বংশরক্ষায় বিধবা নারীকে পরপুরুষে আত্মসমর্পণ করাকেও নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হয়নি। শ্বশ্রূ মাতা সত্যবতীর আদেশে অম্বিকা ও অম্বালিকাকে অনিচ্ছায় নীরবে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণের নিকট। পরবর্তীকালে অনুরূপ আদেশে তাদের ব্যক্তিসত্ত্বা বিদ্রোহ করেছে, কিন্তু প্রতিবাদের সামাজিক সাহস তারা পায়নি। তাই তারা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণের কাছে শূদ্রাদাসীকে পাঠিয়েছে।

নারীত্বের এই অবমাননাকর নির্দেশ নারীর কাছ থেকেই এসেছে। এই আদেশের পেছনে রয়েছে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের কঠোর বিধান।

গান্ধারীর বিবাহ বর্ণনায় পাই —

> গান্ধারী শুনিল, অন্ধবরে সমর্পিল।
> আপন কুকর্ম্ম ভাবি চিত্তে ক্ষমা দিল।। (পৃঃ-১৪)

রাজা সুবলের কন্যা গান্ধারী। ভগবৎভক্তি পরায়ণা গান্ধারী ভগবানের কাছে মহাবলশালী শতপুত্রের জননী হবার আশীর্বাদ লাভ করেন। ভীষ্ম যখন তার পিতার কাছে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে গান্ধারীর বিবাহের প্রস্তাব পাঠায় তখন সুবল ভাবেন —

'সকল সম্পন্ন দেখি অন্ধ মাত্র বর ।
না দিলে কুপিত হবে ভীষ্ম কুরুবর ।।   (পৃ:-১৪)

কুরুবংশের এ প্রস্তাবকে উপেক্ষা করার মত সাহস সুবল সত্রুচয় করতে পারেন নি । বর অন্ধ জেনেও আপন কন্যাকে দান করতে হয়েছে। গান্ধারী যখন জানলেন যে অন্ধের সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে তখন তার মুখে কোন প্রতিবাদের ভাষা আমরা খুঁজে পেলাম না , পদ্মিনীর মত আত্মরক্ষার সংকল্প দেখলাম না , পেলাম নিজের কল্পিত কুকর্মের জন্য মনকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা । এই মানসিকতা মধ্যযুগের মানসিকতারই প্রতিফলন । এইসব নীরব আত্মদান বা আত্মবিসর্জন থেকে মুক্তির আহ্বান পাই মাইকেলের রচনায় । মাইকেলের প্রমীলার মধ্যে যে 'আমি' দেখি ('আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে ?') — কাশী-রাম দাসে সে নারীত্ব নেই — সবই যেন প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মবোধ, ও তথাকথিত নীতি জ্ঞানের কাছে পূর্বাহ্নেই আত্মসমর্পণ করে রয়েছে , সে ব্যবস্থা তাদের মর্যাদায় আঘাত আনলেও কিছু বলার যেন অধিকার নেই ।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের ভূমিকায় কবি বলছেন —

অনুপমরূপা-কৃষ্ণা অনঙ্গ মোহিনী ।
সবাকার মন হরিয়াছে সে ভাবিনী ।।

এইহেতু সবাই করিবে প্রাণপণ।
কন্যা লাগি দ্বন্দ্ব করিবেক রাজাগণ।। (পৃঃ- ১৮০)

আবার দুর্যোধনের দূত অর্জুনকে খবর দিচ্ছে —

দুর্যোধন রাজা এই কহেন তোমায়।
মুখ্যপাত্র করি তোমা রাখিব সভায়।।
বহুরাজ্য-দেশ ধন নানা রত্ন দিব।
একশত দ্বিজ কন্যা বিবাহ করাব।। (পৃঃ- ১৮২)

অর্জুনের উত্তর —

আমি দিব তা-সবারে পৃথিবী জিনিয়া।
কুবেরের নানা রত্ন দিব যে আনিয়া।।
তোমা-সবাকার ভার্য্যা মোরে দেহ আনি।
এই কথা সভাস্হলে কহিবা আপনি॥ (পৃঃ- ১৮২)

পাশাখেলে সর্বহারা যুধিষ্ঠিরের কাছে শকুনি প্রস্তাব করছেন লক্ষ্মী স্বরূপা দ্রৌপদীকে বাজী ধরলে তাঁর ভাগ্য ফিরে আসতে পারে। সতী সাধ্বী স্ত্রীকে কোন খেলায় বাজী রাখা সামাজিক রীতি কিনা — আর তিনি একজন নারী — তারও ব্যক্তিগত মতামত থাকতে পারে এসব কোন প্রশ্নই ধর্মরাজ নামধেয় যুধিষ্ঠিরের মনে এলো না। তিনি

কারো সঙেগ আলোচনা না করেই বাজী ধরলেন। পাশাখেলায় দ্রৌপদীকে পণ ধরে যুধিষ্ঠির হেরে গেলেন। সম্পত্তির মত দ্রৌপদীও এখন দুর্যোধনদের অধীনা। কাজেই দুঃশাসন ইন্দ্রপ্রস্থে গেলেন দ্রৌপদী-কে নিয়ে আসতে। সেখানে কুন্তী ও দুঃশাসনের কথোপকথন —

কহ দুঃশাসন, এই কেমন বিহিত।
দ্রৌপদী ধরিতে চাহ, না বুঝি চরিত।।
কুলবধূ লৈয়া যাবে সভার মাঝার।
কুলের কলঙক-ভয় নাহিক তোমার।।
শুনি দুঃশাসন ক্রোধে উঠিল গর্জ্জিয়া।
দুই হাতে কুন্তীরে সে ফেলিল ঠেলিয়া।।
অচেতন হৈয়া দেবী পড়িল ভূতলে।
দুঃশাসন ধরিলেক দ্রৌপদীর চুলে।। (পৃঃ-৩৩৩-৩৩৪)

অসহায়া দ্রৌপদী সভাস্হলে বিবস্ত্রা হবার সম্ভাবনায় কাতরা। তার প্রত্যাশা যে সভায় অধিষ্ঠিত বীরগণ তাকে উদ্ধার করবেন। কিন্তু--

এই ভীষ্ম দ্রোণ দেখ আছেন সভাতে।
ধার্ম্মিক এ-দুই বড়, খ্যাত পৃথিবীতে।।
স্বধর্ম্ম ছাড়িল এরা, হেন লয় মনে।
মম এত দুঃখ কেন না দেখে নয়নে।। (পৃঃ-৩৩৪)

একটি ধিক্কার বাণী উচ্চারিত হল না দ্রৌপদীর কণ্ঠে ।

বনবাস যাত্রাকালে দ্রৌপদীকে সম্বোধন করে দুঃশাসন যে উক্তি করলেন তা আধুনিক রুচিতে কল্পনাও করা যায় না ।

শুন ওহে যাজ্ঞসেনী , মোর বাক্য ধর ।
কোথা দুঃখ পাবে গিয়া কানন-ভিতর ।।
এই কুরু-জন-মধ্যে যারে মনে লয় ।
তাহারে ভজিয়া সুখে থাকহ আলয় ।। (পৃঃ-৩৪৭)

পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী দ্রৌপদীর প্রতি দুঃশাসনের কুরুচি পূর্ণ উক্তি লক্ষ্য করার মত । নিজ সন্তানগণের বনবাস কালে কুন্তী বিলাপ করলেন। তাঁর সমস্ত বিলাপের মধ্য দিয়ে কৌরবদের দুষ্কৃতির প্রতি কোন নিন্দা নেই আছে আত্ম বিলাপ — নিজ কৃত কর্মের জন্য নিজেকেই দায়ী করার তৎকালীন নৈতিকতা ।

দ্বৈতবনে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের প্রতি যে পরিতাপ বাক্য প্রয়োগ করেছেন তার মধ্যে আমরা দ্রৌপদীর ব্যক্তিত্বের একটু পরশ পাই । কিন্তু সেই বাক্য সমূহে ক্ষুরধার শ্লেষ নেই ।

ক্ষত্র হ'য়ে ক্রোধ নাহি, নাহি হেন জন ।
তোমাতে নাহিক রাজা ক্ষত্রিয়-লক্ষণ । (পৃঃ-৩৯৫)

ইন্দ্রপুরীতে উর্বশীকে অর্জুনের কাছে পাঠানো হল। উর্বশী চির যৌবনা। তিনি অর্জুনকে আত্ম নিবেদন করতে গিয়ে হলেন প্রত্যাখ্যাতা। অর্জুন প্রত্যাখ্যান করলে উর্বশী ক্ষিপ্তা হয়ে দিয়েছেন অভিশাপ। বারাঙ্গনা মনোবৃত্তিকেও অতিক্রম করেছে এই নারী। এ মূর্তি তৎকালীন নারী সমাজের যে চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে তা আমরা কোন মতে সমর্থন করতে পারি না। নারীত্ব যে অর্থে আধুনিক যুগে প্রযুক্ত সে অর্থে মহাভারতে নারীত্বের মর্যাদা খুব কম জায়গায়ই রক্ষিত হয়েছে।

দময়ন্তীকে নিদ্রিতাবস্থায় বনে ফেলে নল নিরুদ্দিষ্ট হলেন। সেই দময়ন্তী যখন কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করার পর ঘোষণা করলেন যে তিনি দ্বিতীয়বার স্বয়ম্বরা হবেন তখন ঋতুপর্ণরাজের সারথী 'বাহুক' নামে আত্মগোপনকারী নল গোপনে দময়ন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলছেন —

এ হেন কুৎসিৎ কর্ম্ম, রাজকুলে ল'য়ে জন্ম,
কহ, করিয়াছে কোন্ জনে ।। (পৃ:-৪০০)

নিজে কাপুরুষের মত ধর্মপত্নীকে নিদ্রিতাবস্থায় বনে ফেলে আসার সময় এই নীতিজ্ঞ পুরুষের স্মরণ ছিলনা যে তিনি কোন্ কুৎসিৎ কর্ম করছেন। আর যেই তার পরিত্যক্তা স্ত্রী দ্বিতীয়বার স্বয়ম্বরা হবেন বলে ঘোষণা করলেন অমনি তার পৌরুষ জাগ্রত হল। তার স্ত্রী কেমন

করে বেঁধে আছে সেটাই তাঁর ভাবনার বিষয় ছিল। সে সব কোন কথাতো নেই আছে নীতির বাক্য - কুকর্ম করা অবিধেয়। এ যেন নারীর উপরই একচেটিয়া প্রয়োগের বস্ত। আরও বিচিত্র নারীর মানসিক গঠন — দময়ন্তী বলছেন —

যদি কর পাপজ্ঞান, তোমার সাক্ষাতে প্রাণ,
বাহির হউক এইক্ষণে ।।　　　(পৃ:- ৪৩১)

যে সমাজ বিধান নারীর মর্যাদা রক্ষার কোন নৈতিক ব্যবস্থা রাখেনি, সেই সামাজিক পরিবেশে দময়ন্তীর কাছে এর চেয়ে আর কি প্রত্যাশা আমাদের থাকতে পারে? যে স্বামী স্ত্রীকে নিদ্রিতাবস্থায় অরণ্যে অরক্ষিতা রেখে একদা পলায়ন করে পৌরুষ প্রদর্শন করেছেন তার কটূক্তির প্রত্যুত্তরে দময়ন্তীর কণ্ঠে কোন তীব্র জোড়ালো যুক্তি কবির ভাষায় আসেনি। সে অসহায়ার মত নিজেকে পাপীজ্ঞান করে সেইক্ষণে প্রাণ ত্যাগ করার ইচ্ছা জানিয়েছে মাত্র। এটা পুরুষ ও পুরুষ রচিত স্মৃতি শ্রুতি পুরাণের বিধির কুফল।

অগস্ত্যমুনীর পিতৃপুরুষগণ উদ্ধার পাওয়ার জন্য অগস্ত্যকে আদেশ করলেন তিনি যেন বংশ সৃষ্টি করে তাদেরকে উদ্ধার করেন। তাই শুনে অগস্ত্য বিদর্ভ রাজের গৃহে উপনীত হলেন।

পিতৃগণ-আদেশেতে জন্মাব সন্ততি ।
তবকন্যা লোপামুদ্রা দেহ নরপতি ।।
এত শুনি নরপতি হ'ল অচেতন ।
প্রত্যুত্তর দিতে মুখে না আসে বচন ।। (পৃ:- ৪৩৭)

অত:পর নরপতি ভাবলেন —

মাগে লোপামুদ্রারে অগস্ত্য মহাঋষি ।
নাহি দিলে শাপেতে করিবে ভস্মরাশি ।। (পৃ:- ৪৩৭)

লোপামুদ্রা পিতার এই অসহায় অবস্থার কথা উপলব্দি করে খুব সহজেই সমাধানে পৌঁছে গেলেন । যেখানে আধুনিক সাহিত্যের পদ্মিনী, কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতি নারীর মধ্যে ভোগের সামগ্রীরূপে অনাকাঙিক্ষত পুরুষে আত্মদান অপেক্ষা আত্মহত্যাই শ্রেয় বলে পরিগণিত হতে দেখি সেখানে লোপামুদ্রা বলছেন —

মম হেতু তাপ কেন ভাবহ হৃদয় ।
আমারে অগস্ত্যে দিয়া খণ্ডাহ এ ভয় ।। (পৃ:- ৪৩৭)

এবং তাই হলো । লোপামুদ্রা রাজকন্যার বেশভূষা পরিত্যাগ করে জটাচীর ধারণ করলেন এবং অগস্ত্যের আশ্রিতা হলেন ।

পরবর্তীকালে অবশ্য সন্তান ধারণের উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করার জন্য লোপামুদ্রা অগস্ত্যকে বাধ্য করেছিলেন। জটাচীর ফলাহার পরিত্যাগ করে কামিনীর বেশ ধারণ করার স্বীকৃতিও তাকে দিতে হয়েছিল।

অগস্ত্যের উদ্দেশ্য তথা তৎকালীন সামাজিক বিধান এতে হয়তো রক্ষিত হয়েছিল কিন্তু লোপামুদ্রার নারীত্ব, তার সামাজিক মর্যাদা বা আশা আকাঙ্ক্ষার স্বাতন্ত্র্যরক্ষিত হয়েছে বলে আধুনিক দৃষ্টিতে আমরা মনে করতে পারি না। কারণ পিতৃপুরুষের উদ্ধারের জন্য ঋষি অগস্ত্যের সন্তান সৃজনের প্রয়োজন হয়েছে বলেই অভিশাপের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত পিতাকে উদ্ধার করার মানসিকতাই এখানে বড়। রাজনন্দিনী, সুন্দরী লোপামুদ্রার ব্যক্তিগত রুচি, আবেগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা বা বর মনোনয়নে কোন স্বাধীনতাই রক্ষিত হয়নি। প্রতিষ্ঠিত সামাজিক কাঠামোর যূপকাষ্ঠে স্বেচ্ছায় আত্মহননের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ মহাভারতের এই লোপামুদ্রা।

অজ্ঞাতবাস পর্বে বিরাট রাজার গৃহে ভীম বল্লভ নাম নিয়ে সূপকার রূপে, অর্জুন বৃহন্নলা নাম নিয়ে নর্তকীরূপে, নকুল গ্রন্থিক নামে অশ্বচিকিৎসক রূপে, সহদেব তন্ত্রিপাল নামে গোধন রক্ষক রূপে, যুধিষ্ঠির কঙ্ক নামে রাজপারিষদ রূপে এবং দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী নামে পরগৃহে শিল্পাদির দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারিণী রূপে আত্মগোপন করে রইলেন।

বিরাট রাজার সেনাপতি শ্যালক কীচক দ্রৌপদী রূপে মুগ্ধ হলো। সরাসরি দ্রৌপদীকে বললো —

দেখিয়া তোমারে মন মজিল আমার।
কামবাণে দহে প্রাণ, করহ উদ্ধার।। (পৃ:-৫৬২)

কিন্তু দ্রৌপদীর কাছে কোনরূপ সাড়া পেলনা। কাজেই ভগ্নীর শরণাপন্ন হল।

ভগিনী, দেখহ মোর বাহিরায় প্রাণ।
যদি মোরে চাহ, শীঘ্র কর পরিত্রাণ।।
সৈরিন্দ্রী আছয়ে যেই তোমারে সদনে।
তাহারে আমারে আনি দেহ এই ক্ষণে।।
না দিলে সোদর-হত্যা হইবে তোমার।
জানিবে, এখনি প্রাণ যাইবে আমার।। (পৃ:-৫৬৩)

যে রাণী সৈরিন্দ্রীরূপী দ্রৌপদীকে স্বীয় কন্যা বা ভগিনীর মত রক্ষা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজ সদনে আশ্রয়দান করেছেন সহোদরের প্রাণ রক্ষার জন্য তিনি তার প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেলেন। নারী হয়ে অপর এক নারীর মর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে ভাইকে সুযোগ করে দিলেন দ্রৌপদীর প্রতি অপমানের সূচক আচরণ করতে। অত:পর নির্যাতিতা

দ্রৌপদী সূপকার রূপী ভীমের কাছে নিজ অপমানের কাহিনী বর্ণনা করে বললেন —

দ্রুপদের কন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী ।
পঞ্চস্বামী ভজি এবে হৈনু অনাথিনী ।।
বজ্রের অধিক মোর কঠিন শরীর ।
তেঁই এত কষ্টে প্রাণ না হয় বাহির ।। (পৃ:-৫৬৭)

কীচককে অবশ্য তার এ অন্যায় লালসার প্রতিফল পেতে হয়েছিল সূপকার রূপী ভীমের হাতে নিহত হয়ে । কিন্তু তার জন্য দ্রৌপদীর ব্যক্তিত্বের কোন প্রকাশ আমরা দেখতে পাইনা । একটি লালসায় উন্মত্ত পুরুষের কাছে প্রেরিত হয়ে দ্রৌপদী কোন প্রতিবাদ করলেন না অথবা পুরুষটির কাছে গিয়ে কোন ব্যক্তিত্বও প্রকাশ করতে পারলেন না । কেবলমাত্র তার পঞ্চস্বামীর অস্তিত্বের কথা জানিয়ে কামোন্মত্ত পুরুষের কাছে কাল্পনিক ভীতি সঞ্চারের এক দুর্বল আত্মরক্ষার পথ মাত্র অবলম্বন করলেন ।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে কুন্তী স্বীয় পুত্রদের কল্যাণ কামনায় কর্ণকে পান্ডবপক্ষে নিয়ে আসার জন্য কর্ণের কাছে আত্মপ্রকাশ করলেন। এই আত্মপ্রকাশের ভাষায় কুন্তীর কুমারীকালে দেহদানের যে কাহিনী-টি বর্ণিত হয়েছে তাও মধ্যযুগীয় চিন্তাধারায় নারীর ভোগ্যপণ্য দ্রব্য সামগ্রীর রূপটি প্রস্ফুটিত হয়েছে । কুন্তী যমুনায় জল আনতে গিয়ে

কৌতুক করে সূর্যকে ধ্যান করে মন্ত্র জপে ছিলেন , অমনি —

তখন আসিল সূর্য্য মোর বিদ্যমানে ।
সূর্য্য দেখি ভীত আমি হইলাম মনে ।।
অনেক বিনয় করি কহিনু বচন ।
না বুঝি তোমারে আমি করি আবাহন ।।
অজ্ঞান স্ত্রীজন, দোষ ক্ষমিবে আমার ।
শুনিয়া হাসিয়া সূর্য্য কহে আর বার ।।
কভু মিথ্যা নাহি হয় মুনির বচন ।
কভু মিথ্যা নহে কন্যা, মম আগমন ।।
আমারে ভজহ তুমি, নাহিক সংশয় ।
না ভজিলে মন্ত্র মিথ্যা হইবে নিশ্চয় ।।
বিবাহিতা নহ, চিন্তা করিছ অন্তরে ।
মম বরে মহারাজ বরিবে তোমারে ।।
এত শুনি বশ আমি হইনু তাহার ।
বর দিয়া গেল সূর্য্য ভুক্তিজয়া শৃংগার ।।
সূর্য্য-সঙ্গমে হইল গর্ভের উৎপত্তি ।
তখন তোমারে প্রসবিলাম সুমতি ।।
প্রসব করিয়া তোমা সচিন্তিত মন ।
কুমারীর কালে জন্ম হইল নন্দন ।।

লোকে খ্যাত হয় পাছে এ-সব কাহিনী ।
যমুনায় ভাসাইনু তাম্র কুণ্ড আনি ।। (পৃ:-৭০০ - ৭০১)

কোন মন্ত্র জপ করে সূর্যের ধ্যান করলে সূর্য নরদেহ ধারণ করে কোন কুমারী মেয়ের সামনে আবির্ভূত হন একাহিনী আধুনিককালে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য । অথচ সেই পুরুষের কামনার কাছে আত্মদান করে কুন্তী গর্ভ ধারণ করেছিলেন । পুরুষটি অবশ্য তাকে সাহস দিয়েছিলেন যে তার কৌমার্য লঙ্ঘিত হলেও তাঁর বরে কোন মহারাজ কুন্তীকে বিবাহ করবে । অসহায়া দুর্বলা রমণীর একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে একটি বলবান পুরুষের কামনা তৃপ্তির কাহিনী শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থেও কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার দেহ সম্ভোগ দৃশ্যে আমরা লক্ষ্য করি । অবশ্য এক্ষেত্রে রাধা ছিলেন বিবাহিতা । রাধা অবশ্য এই পাপ প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল বলে বড়াইকে চড় মেরেছিলেন এবং কৃষ্ণ প্রেরিত তাম্বুল পদতলে দলিত করে কিছুটা ব্যক্তিত্বের পরিচয় প্রদান করেছিলেন । কুন্তীর ক্ষেত্রে আমরা সে ব্যক্তিত্বের কোন প্রকাশ দেখতে পাই না । অথচ সন্তান প্রসব করবার পরে কুন্তীর মনে প্রশ্ন জাগলো 'লোকে খ্যাত হয় পাছে এসব কাহিনী' — তাই তিনি তাম্রকুণ্ডে নবজাত সন্তানকে ভাসিয়ে দিয়ে নিজ কলঙ্ক কাহিনীকে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিক্ষেপ করার দুর্বল প্রচেষ্টা অবলম্বন করলেন । এই চিত্রেও নারী পুরুষের ভোগ্য পণ্য দ্রব্য সামগ্রীর মত চিত্রিত হয়েছে । কুন্তীর সমাজ সচেতনতা যা

পরবর্তীকালে সন্তানকে বিসর্জন দেওয়ার সময় আমরা দেখতে পেলাম সূর্যের কাছে দেহদানের সময় সেই নারী কোন ব্যক্তিত্ব দেখিয়ে প্রয়োজনে অভিশাপের ঝুঁকি নিয়েও আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করেন নি। এতেই বোঝা যায় তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থায় নারীর নারীত্ব স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে সর্বহারা গান্ধারীর কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে মৃদু ভর্ৎসনা বাক্য বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যেও সেই একই দৈবনির্ভর - শীলতা। গান্ধারী কৃষ্ণকেই সমস্ত বিনষ্টির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং সেজন্য তাকে অভিশাপও দিয়েছেন —

ওহে কৃষ্ণ জনার্দন দেবকী-কুমার।
তোমা হ'তে হৈল মোর বংশের সংহার ।।
অনর্থের মূল তুমি দেব নারায়ণ।
কর্ম্মভোগ বলি কর দোষ বিদূরণ ।।
তোমাতে সংহার হয় মিলন তোমাতে।
জীবের কর্ত্তৃত্ব আর রহে কোথা হ'তে ।।
সকলি তোমার মায়া, তুমিই প্রধান।
গুণ-দোষ ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি ভগবান ।। (পৃঃ-১৫৫)

** * * *

এখন জানিনু , তুমি অনর্থের মূল ।
বিনাশিলে তুমি মম যত কুরুকুল ।।
*   *   *   *
কৌরবের বংশ হৈল যেমন সংহার ।
শুন কৃষ্ণ , এইমত হইবে তোমার ।।   (পৃ:-১৬০)

ঘ) অন্নদামঙ্গল — রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র — অষ্টাদশ শতক (১৭৫২)

১। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তার অন্নদামঙ্গল কাব্যে তদানীন্তন সমাজের এক নিখুঁত চিত্র তুলেছেন । তাঁর দৃষ্টি ছিল মোহমুক্ত । তাই তিনি যা দেখেছেন , বুঝেছেন ও অনুভব করেছেন তাই প্রকাশ করেছেন । তিনখণ্ডে বিভক্ত তার কাব্য । গ্রন্থের সূচনাতে একটি উক্তি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে —

'লুঠি নিল নারী গাড়ী দিল বেড়ি তোক'—

এতে স্পষ্টভাবেই তৎকালীন সমাজে নারীর স্থানটি নির্দেশ করে। মেয়েরা ছিল লুণ্ঠনের সামগ্রী । তখন আলিবর্দী খাঁ ছিলেন বাঙ্লার

শাসনকর্তা। অত্যাচার ও নিপীড়ন ছিল সেই সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট। এই নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাঙালী মন দেবীর দ্বারস্থ হয়েছিল — দৈবশক্তির উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্যকোন পথ তারা খুঁজে পায়নি। এই যুগটা ছিল আত্মপ্রত্যয়হীনতার যুগ। তাই সর্বশক্তিশালিনী দেবীও কবির হাতে দ্বিধাগ্রস্তা আত্মপ্রত্যয়হীনা রমণীরূপে চিত্রিতা হয়েছেন।

শিবনিন্দা না করেও দক্ষ যজ্ঞকর্ম সুসম্পন্ন করতে পারতেন। এই অকারণ নিন্দুক, ঈর্ষাপরায়ণ, অহঙকারী দক্ষরাজের কৃতকর্মের ফল যোগ্যই হয়েছে। যে পিতা কন্যার দেহত্যাগের সঙকল্প শ্রবণেও স্বীয় অন্যায় আচরণে আত্মসংযমের প্রয়োজন বোধ করেন না — তিনি যত বড় শক্তিশালী হোন না কেন, তিনি মানবিক কোমলতা বর্জিত এক দানব মাত্র। তার স্ত্রী তাকে 'মূঢ়' আখ্যা দিয়েছেন। একটি কুসুম কোমল নারীর জীবনের প্রতি যার কোন মায়া মমতা নেই সেই দানব মানুষটি নৈতিকতার দায়ে স্ত্রীর কাছে সহানুভূতি লাভ করছে। নারীই শুধু নিয়ম শাসনের দায় বহন করবে অথচ তার হৃদয়ের কোন মূল্যই পুরুষ দেবে না — এই মধ্যযুগীয় বোধই এই চিত্রে প্রস্ফুটিত হয়েছে। বসুন্ধরার জন্ম অংশে বসুন্ধরা পতি শোকে কাতর হয়ে বলছেন —

স্বামীহীনা আমি ফিরি কান্দিয়া কান্দিয়া।
এত দুঃখ দেহ মোরে কিসের লাগিয়া।।

আপনি ত জান স্ত্রীলোকের ব্যবহার ।
সতিনী লইলে পতি বড়ই প্রহার ।। (পৃ:-১৪৮)

অন্তর্যামিনী অন্নপূর্ণার কাছে বসুন্ধরার এই বিলাপ নারী মনের স্বাভাবিক বৃত্তিকে ফুটিয়ে তোলে । তার স্বামী তিন নারী নিয়ে সুখে ঘর করছেন । এটাই সামাজিক রীতি — নারী হৃদয়ের কোন মূল্যই পুরুষ দেয় না ।

সেই সমাজে পুরুষেরা তাদের মনোরঞ্জনের জন্য বহু বিবাহ করতে পারতেন — সমাজে প্রচলিত ধারণার আভাসও কবির দু'একটি উক্তি থেকে পাওয়া যায় — ভবানন্দের সমস্যা —

দুই নারী দুই ঘরে কোথা যাবো আগে ? (পৃ:-৩২৯)

অথবা —

দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর । (পৃ:-৩২৯)

কবির উক্তিতে মনে হয় নারীরা সতীনের ঘর করতো — তারপর —

'পতিলয়ে দুই সতীনে হানাহানি ।'

একথা বহুবার বলা হয়েছে — নারীরা আসলে ছিল পুরুষের ভোগ্য

বস্তু। ভারতচন্দ্রের কাব্যেও তার পরিচয় মিলবে। দুর্গার সন্তান পালনে অসুবিধা থাকায় ইন্দ্রের কাছ থেকে পাঁচজন দাসী চেয়ে এনেছেন কিন্তু তাদের দেখামাত্রই —

জেনমাত্র মহাদেব দাসীকে দেখিল।
মদনে বিভোর হইয়া সাক্ষাতে আইল।।
আর
দুর্গা বুঝিল শিবের উন্মাদ হইল।
পঞ্চ দাসী পাছ করি তখনি রাখিল।। (পৃ:-২৪)

নারী পুরুষকে বোঝে — পুরুষ চিনেছে বলেই বোঝে।

২। **বিদ্যাসুন্দর —**

বিদ্রোহী প্রতাপাদিত্যকে শায়েস্তা করে মোঘল সেনাপতি মানসিংহ এসে গেছেন বর্ধমানে। ভবানন্দ তাকে সাহায্য করতে গিয়ে বিদ্যা ও সুন্দরের প্রিয় কাহিনীর মাধ্যমে কালিকা দেবীর মহিমা প্রকাশ করেছেন। একদিকে প্রজাগণ নবাবের বিলাসবাসনা চরিতার্থ করছে আর অন্যদিকে রয়েছে ইংরেজের নবসংস্কৃতি। এই উভয় পর্বের ক্রিয়া বিক্রিয়ায় বাঙলার উচ্চমধ্য সম্প্রদায় খানিকটা বিভ্রান্ত। এই অবস্থায় কবি তার কাব্যে যে নারী চরিত্রগুলো এনেছেন — তাতে যুগমানসের প্রভাবই দেখতে

পাওয়া যায়। সেই প্রাণহীন আড়ম্বর, বিকার প্রাপ্ত রুচি অতি সহজেই চোখে পড়ে।

গুণসিন্ধু রাজার পুত্র সুন্দর এলো বর্ধমানে।

সুন্দর, সত্যি সুন্দর, তাকে দেখে নাগরিকাদের ক্ষোভ —

ধিক বিধাতায়   হেন যুবরায়
না দিলে আমায় দিবেক কারে ।।
এই চিত্তগামী   হবে যার স্বামী
দাসী হয়ে আমি সেবিব তারে।
ঘরে গিয়া আর   দেখিব কি আর
মিছা সংসার ভাতার জরা।
সতিনী বাঘিনী   শাশুড়ী রাগিনী
ননদী নাগিনী বিষের ভরা ।।   (পৃঃ-১৭৩)

এই খেদোক্তিতে তৎকালীন সমাজ জীবনের যৌন সর্বস্বতাকেই ফুটিয়ে তুলেছে।

বেলা হয়েছে। বিদ্যা পূজার ফুলের আশায় বসে আছে — মালিনী পূজার ফুল দিতে দেরী করছে।

মালিনীর সঙ্গে দেখা হল। মালিনীকে তিরস্কার করায় সে বললো—

পাইয়া সুজন রাজার নন্দন
রাখিনু করিয়া ছল।
* * * *
বক্রিচাপ যায় একেলা বেড়ায়
করিয়া দিগবিজয়।
পথে দেখা পেয়ে রেখেছি ভুলায়ে
স্নেহে মাসী মাসী কয়।।
অশেষ প্রকারে কহিনু তাহারে
তোমার পণের মর্ম্ম।
শুনিয়া হাসিল ইঙ্গিতে ভাসিল
নারী বিনা কোন কর্ম্ম। (পৃঃ-১৯০)

হীরা মালিনীর মুখে সুন্দরের দেহ বর্ণনা শুনে বিদ্যা সুন্দরের প্রতি আসক্ত হল। অনেকটা রাধার পূর্বরাগের মতই, রূপ বর্ণনা শুনে প্রেমোদয় — 'রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শন শ্রবণা দিজা।' এখন কি করে উভয়ের সাক্ষাৎ হবে তাই হল সমস্যা।

পূজায় বসে নিজের মন স্থির রাখতে পারে না। দৈববাণীতেও

বিদ্যা দেবীর আদেশ পেলো — কিন্তু তবু সে প্রকাশ্যে নিজের মত ব্যক্ত করতে পারছে না ।

হীরা এই গোপন প্রণয়ের সংবাদ রাজাকে ও রাণীকে জানাতে চাইলে বিদ্যা বাধা দেয় — তার মনে সংশয় দেখা দেয় এতে হয়তো বিবাহ বাধা প্রাপ্ত হবে ।

কিন্তু ক্রমে বিদ্যাকে দেখে মনে হতে লাগলো — সে যেন কৃষ্ণ বিরহিনী রাধা ।

তারপর একদিন সুরঙ্গ পথে সুন্দরের প্রবেশ ঘটলো । একদিন বিদ্যা ও সুন্দরের মধ্যে ভাষার মারপ্যাচ দিয়ে বিষয় বিচার শুরু হল তখন সুন্দরের মুখে ধ্বনিত হল নারীর প্রতি মধ্যযুগীয় দৃষ্টি ভঙ্গী ।

> শ্রুতি বিনা উপায় না পায় সমাধার ।
> স্ত্রীলোকে করিতে নারে শ্রুতির বিচার ।
> *　　*　　*　　*
> বিদ্যা বলে হারিলাম — তুমি মোর স্বামী ।

বিদ্যার সমস্ত বিদ্যার অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল — নারী হয়েছে বলেই সে শ্রুতির বিচার করতে পারবে না — সুন্দরের এই কথারও সে

কোন প্রতিবাদ জানালো না । এরপর

'হরগৌরী সাক্ষী করি দিলা বরমালা ।'

গোপনে ওদের বিয়ে হয়ে গেল । এরপর গোপন অভিসার ও যৌনসম্ভোগ ।

সুন্দর যদিও মালিনীর মধ্যস্থতায় বিদ্যাকে পেয়েছে তবুও নারীর প্রতি পুরুষের উক্তিটি ঠিকই ধ্বনিত হয়েছে তার কণ্ঠে —

'মেয়ের আশ্বাসে রহে সে বড় পামর ।

বিদ্যা তার জবাব দিচ্ছে —

বিদ্যা বলে বড় মেনে ঠাট কর কত ।
নারীর কপাল নহে পুরুষের মত ।।
পুরাতন ফেলাইয়া নূতনেতে মন ।
পুরুষে যেমন পারে নারী কি তেমন ।। (পৃ:- ২২৫)

অপরিণামদর্শী দেহসর্বস্বতা মধ্যযুগীয় এক নেশা । এই অবস্থাতেও বিদ্যার হাহাকার ও কপটতা আমাদের মনে তিক্ততার সৃষ্টি করে । এখনও কি নিজের দুরবস্থার কথা বলতে পারেনা ? নিজের কাজের দায়িত্ব বিধাতার মাথায় চাপিয়ে অর্থহীন হাহাকার মধ্যযুগীয় সাহিত্যের

অন্যতম বৈশিষ্ট্য ।

রাজার নন্দিনী   চির বিরহিনী
      মোর সমা কেবা আছে !
বাপে না জিজ্ঞাসে   মায়ে না সম্ভাষে
      দাঁড়াইব কার কাছে ।
কি করি বাঁচিয়া   ভাবিয়া ভাবিয়া
      গুল্ম হইল বুঝি পেটে ।   (পৃ:- ২৩৯)

কালিকার আনুকূল্যে সুরঙ্গ পথে নিত্য মিলন, রমণ, বিহার — প্রশ্ন জাগে, সামাজিক অস্বীকৃতির ভয় যদি তাদের ছিল তবে তারা একাজে নামবে কেন ? আর নামলোই যদি তবে দিবালোকে মাথা উঁচু করে সে কাজের সমর্থন খুঁজে পায়না কেন ? এখানেই তৎকালীন সমাজ মনের নিষ্ঠুরতা । স্খলন 'পাপ' আর পুরুষের বহু নারী সম্ভোগ 'লীলা'— এই পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টনীতিই এখানে প্রতিফলিত হয়েছে ।

আসল কথা, বধ্য ভূমিতে কালিকাস্তব তো এখনও সমাপ্ত হয়নি । দৈবী অলৌকিক লীলায় সুন্দরের প্রাণ সঞ্জীবিত হবে — এইতো কালিকা-মঙ্গলের উদ্দেশ্য ।

সেই মধ্যযুগীয় ভ্রান্ত , সংস্কারাচ্ছন্ন , পুরাণাশ্রিত, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভাবিত ক্লান্তিকর নীতির পুনরাবৃত্তি । এছাড়া আর কি ?

।। উপসংহার ।।

মধ্যযুগের কাব্য পরিক্রমা করে একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হল। সাহিত্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকা মানব সমাজ ও মানব মনের ইতিহাসের ধুলাচ্ছন্ন পাতার অন্তরাল থেকে আমরা বার করে নেবার চেষ্টা করেছি নারীর আসন। মানব সভ্যতার বিকাশ ও ক্রমোন্নতির গতিপথে একটি চিরন্তন সত্য এতে ধরা পড়েছে — তা হল শোষণ। সবল দুর্বলকে আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে এসে দুর্বলের কর্ম-ক্ষমতা ও সৃজন ক্ষমতাকে নিজ স্বাচ্ছন্দের জন্য শুষে নিয়ে ভোগ ও আরাম করেছে। দুর্বল সবলের ঐ সর্বগ্রাসী ক্ষমতার কাছে আত্ম সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। প্রতিবাদের ভাষা যেখানে মূক, শক্তি যেখানে ক্লীব সেখানে এসেছে এক কাল্পনিক অশরীরী দেবতা বা ভগবান। এই দেবতা বা ভগবান প্রকৃতপক্ষে সবলের হাতের শিখণ্ডী। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে যে ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনি যদি কোন-দিন তার সামনে শিখণ্ডীকে দেখেন তবে অস্ত্র ত্যাগ করবেন। এই কথা প্রতিপক্ষের জানা ছিল। মহাশক্তিধর ভীষ্ম যখন সেনাপতিত্ব দিয়ে কৌরব পক্ষকে নিশ্চিত জয়ের সীমানায় পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছিলেন তখন তাঁর সামনে এনে দাঁড় করানো হল শিখণ্ডীকে। আর সত্যব্রত ভীষ্ম অস্ত্র ত্যাগ করলে তাঁকে নিরস্ত্র অবস্থায় বধ করা হল। দুর্বল যখনই

প্রতিবাদ করেছে বা সবল শক্তির সঙেগ পাল্লা দিয়ে জয়লাভ করার সামর্থ অর্জন করেছে তখনই দেবতা , বিধাতা , ভগবান , ভাগ্য প্রভৃতি প্রবঞ্চনার শিখণ্ডী উদিত হয়ে ন্যায্য অধিকার আদায়ের তীব্র প্রচেষ্টাকে স্তিমিত করা হয়েছে । সবলের সৃষ্ট নীতি মালার মন্ত্র পাঠ করে দুর্বলকে বলা হয়েছে 'এ তোমার অনধিকার চর্চা'। আর যুগ যুগ ধরে শোষিত ও নির্যাতিত মানসিকতা তখন হাহাকার করেও স্বীকার করে নিয়েছে বিধির বিধানকে ভাগ্য বা আপন কর্মফল বলে ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর তথা আনবিক অস্ত্রের ধ্বংস ক্ষমতা লক্ষ্য করার পর শোষক ও শোষিত উভয় প্রকার মানব মনের গতানুগতিক চিন্তাধারায় এসেছে এক দ্বন্দ্ব । এসেছে নতুন ধরণের এক ভীতি । দেবতা , ভগবান বা বিধির ভীতি পার হয়ে এসেছে মানুষ । একবিংশ শতকের দ্বারদেশে এসে মানুষ আজ ভয় করছে মানুষকেই আর মানুষের তৈরি অস্ত্রকে । তাই মানুষ মানুষের জন্য কিছু করতে পারে কিনা এ ভাবনা প্রকট হয়ে উঠেছে ক্রমশ । কাউকে উপেক্ষা করে কেউই আজ আর চলতে চাইছে না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা মধ্যযুগের পটভূমিকায় নারীর স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি । মধ্যযুগের ঐতিহাসিক , আর্থ সামাজিক ও শাস্ত্র - পুরাণাদি শাসিত সমাজ ব্যবস্থা নরনারীর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করেছে । আধুনিক মানবিক মূল্যবোধ সেকালে ছিল অনুপস্থিত । বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এসে আমরা যে মানবিক মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে

আমাদের নরনারীর সম্পর্ক রচনা করতে চাইছি সে মানসিকতার প্রত্যাশা মধ্যযুগে রচনা করা যায় না । জৈবিক প্রয়োজনের উদ্দের্ধ যে নরনারীর একটা সম্পর্ক আজকের প্রত্যাশা সেদিন তার আশা আমরা করতে পারিনি।

যতই প্রাচীনতা বা সাংস্কৃতিক কৌলীন্যের বড়াই করিনা কেন আমাদের সংস্কৃতির প্রাগৈতিহাসিক কল্পিত স্বর্গলোক থেকে আমরা বিচ্যুত হয়েছিলাম । কতকগুলি অন্ধ কুসংস্কারের আবর্জনা স্তূপে চাপা পড়ে গিয়েছিল আমাদের ঐতিহ্য । প্রাচীন যুগের সমাজ ব্যবস্থা মধ্যযুগে এসে একটা অচলাবস্থার মধ্যে দীর্ঘদিন আবদ্ধ হয়েছিল । পাশ্চাত্তের যান্ত্রিক বিপ্লব, কৃষি বিপ্লব, শিল্প বিপ্লব ও রাজনৈতিক বিপ্লব ও তজ্জাত যুক্তি-নির্ভর জীবন জিজ্ঞাসার ঢেউ আমাদের দেশে এসে পড়েছিল বলেই এদেশে আজ বিশ্বের দরবারে আপন আসন করে নিতে পেরেছে । কাজেই আধুনিক পৃথিবীর অন্যতম দেশ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য আমরা পাশ্চাত্তের নিকট ঋণী । এই এক শতাব্দী ব্যাপী মানসিক অভ্যুদয় আমাদের চিন্তাধারায় যে বিবর্তন এনেছে সেই বিবর্তিত মানসিক প্রেক্ষিতে মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থায় নরনারীর জীবন যাপন পরিক্রমায় পারস্পরিক সম্পর্ক ও অবস্থান নির্ণয় করতে আমরা নবমূল্যায়ণের যে প্রচেষ্টা চালিয়েছি তার সম্পর্কে একটি সাধারণ আলোচনা করা যেতে পারে ।

১। ত্রয়োদশ শতকের সূচনা থেকে পঞ্চদশ শতকের শেষ পর্যন্ত

বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাস ক্ষণস্থায়ী শাসককুলের উত্থান পতনের ইতিহাস। এই দুই শতাব্দী ধরে বাঙালীর উপর চলেছিল আমীর ওমরাহ্‌দের স্বৈরাচারী নিপীড়ন ও শোষণ। তুর্কী, পাঠান মোগল আক্রমণ ও শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাঙলার সমাজ জীবনে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিলনে যে মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছিল তার ফলে সংস্কৃত শাস্ত্রানুমোদিত নৈতিকতা বোধ ও পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী আর্য জীবন যাপন প্রণালীকে পাশ কাটিয়ে স্বকীয়তা বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন পরমত সহিষ্ণু পাল রাজাদের আমলে তারা বেশ ভালই ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির গোড়া সমর্থক সেন রাজাদের আমলে তারা সামাজিক নির্যাতনের শিকার হয়ে যন্ত্রণা ভোগ করেন এবং পাঠান মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এই জন গোষ্ঠীর অনেকেই ধর্মান্তরিত হয়ে আত্মরক্ষার পথ বেছে নেন।

সংস্কৃত মহাভারতের যে বঙগানুবাদ কাশীরাম দাস করেন তা প্রকৃত-পক্ষে আক্ষরিক অনুবাদ নয়। ভাবানুবাদ। এই গ্রন্থে প্রতিফলিত হয় মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার একটা শীর্ণ স্রোত। অম্বিকা, অম্বালিকা ও দাসীর গর্ভধান, কুন্তীর কুমারী মাতৃত্ব ও কর্ণের সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ যদিও কিছুটা মাতৃতান্ত্রিকতার ছাপ বহন করে তবুও আমাদের আলোচ্য যুগে পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থাই দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। এযুগের সমাজ জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর প্রমুখ স্মৃতিকার-

দের অনুশাসন । মনুর 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি' ছিল এযুগের নিয়ন্ত্রাবাণী। মনুর মতে স্ত্রী জাতির স্বাধীনতা বা স্বকীয় চিন্তা ভাবনার বিকাশ নিষিদ্ধ । নারী চলতে বাধ্য থাকবে পুরুষের ইচ্ছায় । অন্তঃপুর তাদের একমাত্র বাসস্থান । পুরুষের সন্তান ধারণ , পালন ও রন্ধনাদি দ্বারা পুরুষের সেবাই নারীর একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য । যে পাঠান মোঘল শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে উচ্চবর্ণ দ্বারা নির্যাতিত অনার্য নামধেয় সমাজের মানুষ ধর্মান্তর গ্রহণ করে আত্মরক্ষার পথ খুঁজেছিল সেই ইসলাম প্রবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীর স্থান আরও একধাপ নীচে বলে মনে হয় । কারণ এই সমাজ ব্যবস্থায় গৃহের বাইরে নারীর আপন মুখও অপর পুরুষের সম্মুখে উন্মোচিত করে চলাচল করা নিষিদ্ধ । বোরখা পরিহিত হয়ে সূর্যা - লোকিত রাজপথে চলতে হতো ।

উপরোক্ত বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজে শিল্পী সাহিত্যিকেরাও স্বচ্ছন্দভাবে নিঃশ্বাস ফেলে তাদের শিল্পী মনের সাহিত্যিক প্রকাশ করতে পারতেন না । এক কথায় এক বিদগ্ধ দার্শনিকের মন্তব্যানুযায়ী বলতে হয় সমাজ জীবন যেন রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীর যক্ষপুরীর বোবা শ্রমিকের জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়ে চলছিল । নারীই ছিল এই উপেক্ষা ও নির্যাতনের অন্যতম শিকার । বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে আমরা নির্যাতীতা , অবহেলিতা নারীর প্রতিনিধি স্থানীয়া একদেবী ও এক মানবীর সাক্ষাৎ পাই । তাঁরা হলেন দেবী মনসা ও মানবী বেহুলা ।

অবহেলা , উপেক্ষা , নির্যাতন মনসাকে করেছে নিষ্ঠুরা ও প্রতিহিংসা পরায়ণা । পূজা আদায় করার জন্য দেবী মনসা চাঁদ সওদাগরের চরম সর্বনাশ সাধন করেছেন । কিন্তু তাতে সওদাগরের পৌরুষ ও নারীর প্রতি ঘৃণা কমেনি । একজন সমাজপতির মুখের কথা —

যে হাতে পূজেছি আমি দেবশূল পাণি ।
সে হাতে পূজিব পুনি চেংমুরি কানী ।।

বেহুলা নারীদেহ ভোগলোলুপ বহু পুরুষের উদ্ধত প্রস্তাব উপেক্ষা করে নিজ স্বামীর জীবন ফিরিয়ে এনেছে । দেবতাদের সম্মুখে নৃত্যরতা বেহুলাকে দেখে পুনর্জীবন প্রাপ্ত লখিন্দরের উক্তি প্রমাণ করে নারী ন্যূনতম সামাজিক মর্যাদার বদলে লাভ করেছে পুরুষের সন্দিগ্ধ ও হেয় দৃষ্টিভঙ্গী ।

লখাই বোলে সুন বালী   কুলে লাগাইলি কালি
তোমার কেনে এমতি বেভার ।
এতেক সমাজ মাঝে   নৃত্যকর কোন লাজে
ত্রিভুবনে রাখিলে খাখার ।। (পৃঃ- ৪৮৩)

কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্যের নায়ক ধনপতি সদাগরও বলেছেন —

'স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি ।' (পৃঃ- ১৯৩)

২। রাজধানী দিল্লীর সিংহাসনে বসে সম্রাট ভারত শাসন করছেন। দেশের দূরবর্তী প্রান্তের শাসন ব্যবস্থা তাই নির্ভরশীল ছিল সামন্ত প্রথার উপর। রাজা, জমিদার বা সৈনাধ্যক্ষ প্রভৃতি প্রতিনিধির মাধ্যমে চলত বাঙলার মত এক প্রত্যন্ত দেশের শাসন। মূলত এই সামন্তরা ছিলেন দিল্লীর শাসনকর্তার আস্থাভাজন ও আঞ্চলিক ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত। দিল্লী এদের কাছে নিয়মিত অর্থ ও রকমারি উপঢৌকনাদি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। যদি কখনও কোন সামন্ত এই নিয়ম পালনে গড়িমসি করতেন বা উপেক্ষা প্রদর্শন করতেন তবে তার বিরুদ্ধে দিল্লী কোন সৈনাধ্যক্ষ প্রেরণ করে তাকে সাজা দেবার ব্যবস্থা করতেন। অধিকতর ক্ষমতাশালী সামন্তরা বিজয়ী হলে নতুন সন্ধি স্থাপন করে আর পরাজিত হলে অন্যকোন অনুগত সামন্তকে বিদ্রোহীর স্থলাভিষিক্ত করে দিল্লী তার আর্থ সামাজিক শাসন দন্ড রক্ষা করে চলতেন। এই প্রথাকেই মোটামুটি সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বলা চলে।

এই রকম একটা চুক্তিবদ্ধ অবস্থায় পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার কাছে রাষ্ট্রনৈতিক ভাবে সমাজ জীবনে কোন পরিবর্তন বা সংস্কার প্রত্যাশা করা যায় না। ক্ষমতাসীন সামন্তরাজ ও তাদের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের তুষ্ট করে পুরুষ সমাজ তাদের গার্হস্থ্য জীবনের রুজি রোজগার পরিচালনা করেছেন। আর পূর্ববর্তী আলোচনাংশে প্রকাশিত শাস্ত্রপুরাণাদির নৈতিক অনুশাসন মেনেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নরনারীর জীবন পরি -

চালিত হত। আর বহিরাগত সামন্তরা রাজকর্মচারীর মত বাঙলায় কিছুদিন চাকুরী করে প্রচুর ধনসম্পত্তি নিয়ে দিল্লী আগ্রায় ফিরে যেতেন। বাঙলার সঙ্গে এই সব সামন্তদের শাসন ও শোষণ কার্য ছাড়া অন্য কোন সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অস্থিরতা ও হিন্দু সমাজের উপর ইসলাম সংস্কৃতির আক্রমণ বাঙলার জনজীবনের ইতি-হাসের এক করুণ কাহিনীমাত্র। এই আঘাত হজম করে যাতে হিন্দু সংস্কৃতি আত্মরক্ষা করতে পারে সেজন্য পঞ্চদশ শতকে শূলপাণি, শ্রীকর আচার্য ও আচার্য চূড়ামণি প্রমুখ স্মৃতিকারেরা কিছু স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করে সমাজকে বেঁধে রাখার প্রয়াস করেছিলেন। কিন্তু এই সব গ্রন্থে ব্রাহ্মণের স্তুতি, নারী নির্যাতনের প্রয়াস ও শূদ্রনিন্দার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।

স্বৈরাচারী সামন্তরা যাদের মাধ্যমে কর সংগ্রহ করতেন তারা ততো-ধিক উৎপীড়ক ছিলেন। তারা শুধু রাজস্বই সংগ্রহ করতেন না। নারী সংগ্রহ করে নারীরত্ন উপঢৌকন দিয়ে নিজেদের লুণ্ঠন, ধর্ষণ, নিপীড়ন ও পণ্যসামগ্রীর মত ধর্ষিতা নারী বিক্রয়ের দ্বারা সম্পদ সৃষ্টির কাজকে বাঁচিয়ে রাখার পাকাপাকি বন্দোবস্তকে অক্ষুন্ন রাখতে চেষ্টা করতেন।

বিদেশী পর্যটক মানরিকের বিবরণ এই চিত্রটি সুন্দর করে তুলে ধরেছে — 'খাজনার টাকা দিতে না পারলে হিন্দুদের স্ত্রী ও সন্তানদের

নিলামে বিক্রয় করা হত। কর্মচারীরা কৃষকদের নারী ধর্ষণ করতো এবং পিয়াদারা নানা প্রকার উৎপীড়ন করতো — এর কোন প্রতিকার ছিল না। ....'

বল্লাল সেনের কৌলীন্য প্রথা সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকার ফলে নারীর ব্যক্তি-সত্তার কোন মূল্যই ছিল না। সমসাময়িক কাব্য সমূহে তার স্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। মলুয়াকে কাজী দেওয়ানের কাছে উপঢৌকন হিসেবে পাঠালো। সমাজ তাকে রক্ষা করতে পারলো না। মলুয়া আপন সতীত্ব রক্ষা করে দেওয়ানের দ্বারা কাজীর-শাস্তি বিধান করে অক্ষত দেহে দেওয়ানের হারেম থেকে বেরিয়ে এলো তার তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা ও সুনিপুণ অভিনয় কৌশল দ্বারা। স্বামী চাঁদ বিনোদের অবস্থার পরি-বর্তন এনে দিল মলুয়া। কিন্তু যেহেতু দেওয়ানের গৃহে রাত্রিবাস করেছে সেহেতু এই বীরাঙ্গনা নারী আর দাম্পত্য জীবন যাপনের সুযোগ পেলনা সমাজপতিদের আপত্তির জন্য। মলুয়াকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়ে বিনোদকে নতুন করে বিয়ে করে সংসার করার ছাড়পত্র দিতে হল। মৈমনসিংহ গীতিকার এই চিত্রই কেবল নয় মঙ্গলকাব্যগুলিতেও এরূপ চিত্রের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়।

কৌলীন্য প্রথার ফলে একজন অপদার্থ কুলীন পুরুষ বহুবিবাহ করার অধিকার লাভ করেছিল। এজন্য বহু স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব সেই

পুরুষকে বহন করতে হত না । স্মৃতিশাস্ত্রগুলির বিধানে স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলা , বেড়ানো ছিল ব্যভিচার । স্বামীর অনুপস্থিতিতে নারী প্রসাধনও করতে পারবে না । ব্যভিচার পরায়ণা স্ত্রীর শাস্তির বিধান আছে কিন্তু পরদেশে ভ্রমণকারী স্বামী যদি উপঢৌকন স্বরূপ কোন নারীরত্ন লাভ করে সঙ্গে নিয়ে আসেন তবে প্রশ্ন ও দ্বিধাহীন চিত্তে সেই সপত্নীকে স্বীকার করে নিতে হবে নারীকে ।

এইরূপ সমাজ পরিবেশে রচিত বড়ুচন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের নায়ক কৃষ্ণ বলছেন — 'অবতার কৈল আহ্মো তোর রতি আশে'। নারীদেহ সম্ভোগ লিপ্সু একটি পুরুষের এবংবিধ আচরণের জন্য কোন প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি কৌলীন্য প্রথা ও স্মৃতিকারদের বিধানেই । কবিও তাই কেবল চিত্র রচনা করেই এইরূপ চরিত্রের দেবত্ব প্রমাণ করে আইহণের স্ত্রী রাধাকে কৃষ্ণময়ী করে পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন ।

বৈষ্ণব সহজিয়া তান্ত্রিক দর্শন নারীকে ধর্ম সাধনের যন্ত্রহিসাবে ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে প্রকারান্তরে নারীদেহ ভোগাকাঙ্ক্ষাকে বাড়িয়ে দিয়েছে ।

যুদ্ধ বিগ্রহের সময় সৈন্যদের দ্বারা নারীজাতির অপমানের সীমা থাকে না । 'মহারিস্তান-ই-গ্রায়েরি' গ্রন্থে গ্রন্থকার সেনানায়ক লিখে-

ছেন যে তার সৈন্যেরা চার হাজার স্ত্রীলোককে বন্দী করে এনে সবাইকে বিবস্ত্র করে রেখেছিল। সংবাদ পেয়ে তাদের মুক্তি দেবার সময় পাজামা, বিছানার চাদর, আলোয়ান প্রভৃতি দ্বারা কোন মতে লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থা করে তাদের ঘরে পাঠানো হয়েছিল।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার আর একটি ফসল সতীদাহ প্রথা। সামন্তরাজারা সামাজিক প্রথাগুলির সুফল কুফল নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তাদের একমাত্র চেষ্টা ছিল দিল্লীর সিংহাসনকে তুষ্ট রেখে নিজেদের সম্পদকে যথাসাধ্য বাড়িয়ে তোলা, তাদের সমস্ত-শক্তি ও চিন্তাই নিয়োজিত ছিল একটা বাণিজ্যিক কায়দায়। শাসনযন্ত্র যখন সমাজ জীবন সম্পর্কে একটা চরম উদাসীনতা নিয়ে চলে তখন সমাজ-জীবনের মধ্যে একটা মাৎস্য ন্যায় সৃষ্টির আবহাওয়া রচিত হওয়াই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। শক্তিশালী রাজশক্তির কাছে অবনত মস্তক পুরুষ সমাজ তখন দুর্বলতর নারী সমাজের উপর স্বীয় নির্যাতনের বদলা নেবার মানসিক প্রবণতায় মেতে ওঠে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই প্রবণতায় তথাকথিত শাস্ত্রজ্ঞ সমাজপতিরাও স্বীয় হীনমন্যতা বোধ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। কোন পুরুষের স্ত্রী মারা গেলে পুনরায় কোন কুমারী কন্যাকে বিবাহ করে সসম্মানে সংসার যাত্রা নির্বাহ করতে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু কৌলীন্য প্রথা সিদ্ধ কোন বৃদ্ধ যদি তরুণী ভার্যা রেখে শ্মশান যাত্রা করতেন তখন সেই তরুণীকে ধর্মীয় প্রেরণা দিয়ে সতী

হবার আছিলায় তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা হত। এই বর্বর প্রথা সমাজ মনে এমন ভাবে গেড়ে বসেছিল যে উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন, বিদ্যাসাগরের নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রভূত বিরোধিতা দানা বেঁধে উঠেছিল। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে একবিংশতি শতাব্দীর প্রবেশদ্বারে পৌঁছেও ১৯৮৭ তে রাজস্থানে রূপকানোয়ার নামে এক তরুণীকে সতী করা হয়েছে তার স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মেরে। মধ্যযুগীয় বর্বর প্রথার এই আকস্মিক প্রকাশ এবং সেই সতীর শ্মশানে স্মৃতি বেদী স্থাপনের পৈশাচিক পৌরুষ এযুগের মানুষও যখন দেখাতে পারছে তখন স্বাভাবিক ভাবেই সন্দেহ জাগে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এখনও সম্ভব হয়ে উঠেছে কিনা। এর মূলেও রয়েছে ঐ সামন্ততান্ত্রিক মানসিক প্রবণতা।

৩। স্মৃতিশাস্ত্রকারদের নির্ধারণ মেনে চলতে গিয়ে নারীকে নানাভাবে বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে। স্বামীর সম্পত্তিতে তার কেবল খেয়ে বেঁচে থাকার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু সম্পত্তি হস্তান্তরের কোন অধিকার সে পায়নি। মনুসংহিতার একটি উদধৃতি এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

নাস্তি স্ত্রীনাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্ম্মে ব্যবস্থিতিঃ।
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োহনৃতমিতি স্থিতিঃ।। (৯.১৮)

অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী নারীজাতির কোন কর্মই শাস্ত্রের

বিধি অনুযায়ী মন্ত্রদ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। এরা শ্রুতি ও স্মৃতিহীনা তাই ধর্মজ্ঞ হতে পারে না। পাপ করলে মন্ত্রের সাহায্যে এদের পাপের স্খালন হয় না। নারী মিথ্যার মতই অশুচি।

এইরূপ বহু উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি যে নারী জাতির প্রতি স্মৃতিকারগণের এই দৃষ্টি ভঙ্গীই মধ্যযুগের নারী জীবনকে পরিচালিত করেছে। ফলে শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণও নারীর পক্ষে অপরাধ বলে গন্য হয়েছে। জ্ঞানহীন মানুষ পশুর সমান। জ্ঞানহীনা নারীকুল তাই গৃহপালিত পশুর মতই পুরুষের নিয়ন্ত্রণে, উপভোগে নির্যাতনে ও বঞ্চনায় যুগের পর যুগ ধরে জীবন ধারণ করে এসেছে। সমাজের সবলতর ও পরিচালক অঙ্গ পুরুষের সমমর্যাদা লাভের স্বপ্নও মধ্যযুগের নারীর কাছে অলীক ছিল।

স্ত্রীজাতি প্রজাসৃষ্টির উপাদান। অর্থাৎ শ্রমিককে জন্ম দিয়ে লালন পালন করে সমাজের চাকাটাকেই সচল রাখাই নারীর অন্যতম কাজ। আর এই যূপকাষ্ঠের মধ্যে গলা দিয়ে যারা জীবন যাপন করতে বাধ্য ছিল তাদের পক্ষে কেবলমাত্র দেহ কেন্দ্রিক হওয়াই স্বাভাবিক। তাই মধ্যযুগের সাহিত্যে যুবতী নারী দেখা মাত্রই পুরুষের প্রস্তাব এসেছে 'রতি আশা' করে। শিব চরিত্র অঙ্কনেও যেমন এই চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে আবার

বেহুলার মাত্র জমে করে মৃত স্বামীকে বাঁচাবার জন্য যাত্রার ঘাটে ঘাটে-ও বেহুলার কাছে এরূপ প্রস্তাবের ছড়াছড়ি। নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টি এমনই ছিল যে শিব যেমন তার নিজ কন্যা মনসার যৌবন দেখে ভোগা-কাঙক্ষা প্রকাশ করেছে তেমনি বেহুলার ভাই বানিজ্য করে ফেরার পথে বেহুলার পরিচয় ভাল করে না জেনে একইভাবে প্রস্তাব করেছে।

অপরপক্ষে কবি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে - সুন্দরের নগরে প্রবেশ কালের বর্ণনাও অনুরূপ। নারীকুল সুন্দরকে দেখে নিজ নিজ পতির সহবাস স্মৃতি মন্থন করেছে। নিজ নিজ স্বামীর অপদার্থতা তথা নিন্দা তাদের কণ্ঠে কবি দিয়েছেন সুললিত ভাষায়। আবার রমণীয় ভাষায় সুন্দরকে স্বামী হিসেবে পেলে তারা কত বেশি তৃপ্ত হতে পারত সে কথাও ফুটে উঠেছে। এই তালিকা থেকে কিশোরী থেকে বৃদ্ধা কেউই বাদ পড়েনি।

সেই ভাগ্যবতী এই যার পতি
সুখে ভুঞ্জে রতি মন আবেশে।
এ মুখ চুম্বন করয়ে যখন
না জানি তখন কি করে শেষে।। (বিদ্যাসুন্দর -ভারতচন্দ্র)

ভারতচন্দ্রের বিদ্যা পত্র লেখার মত শিক্ষিতা। কিন্তু তার পত্রখানিতে

কেবল একজন সুন্দর পুরুষের কাছে নিজদেহ সমর্পণের নির্লজ্জ প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নেই ।

এককথায় নারীর জীবনবৃত্তে যে চেতনার সঞ্চার সমগ্র মধ্যযুগে হয়েছিল তাতে নারী নিজেকে কেবল পুরুষের ভোগ্য পণ্য দ্রব্য বিশেষ হিসেবেই মেনে নিয়েছিল । দ্বিতীয়ত: নারী তার জীবনের সমস্ত পরিণতির জন্য মানব সমাজে তার অন্যতম প্রতিপক্ষ পুরুষকে দায়ী করার শিক্ষা বা মানসিকতা লাভ করেনি । তার সমস্ত পরিণতির জন্য হয় ভাগ্যকে নতুবা পূর্বজন্মের কৃতকর্মকে দায়ী করে চোখের জলের গঙ্গা বইয়ে দিয়ে বেদনামুক্ত হতে চেয়েছে ।

এই মানসিকতার কারণ হিসাবে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে নারী জীবনের বেদনাময় মুহূর্তগুলোকে সে সমাজের কারও কাছ থেকে সহানুভূতি পায়নি । মধ্যযুগের সাহিত্যে এই চিত্রের যতগুলি প্রতিফলন ঘটেছে সেগুলি বিশ্লেষণ করলে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে ।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গলকাব্যের নায়িকা গৌরী বলছে —

ময়ূর-মূষায় দ্বন্দ্বাদ্বন্দ্বী সদাই কন্দল ।
ওই নিমিত্তে সদাগালি মোর কর্মফল ।।
দারুণ দৈবের ফলে হইনু দুঃখিনী
ভিক্ষার ভাতে দারুণ বিধি করিল গৃহিনী ।। (পৃঃ-১১৯)

অপর নায়িকা ফুল্লরা বলছে —

বিধাতা আমারে দণ্ডী জীয়ন্ত স্বামীতে রাণ্ডী
কৈল দৈব দুঃখের ভাজন ।।

মনসামঙ্গলের বেহুলার উক্তি —

এত দুঃখে রান্ধিনু ব্যঞ্জন আর ভাত
অভাগিনীর কর্মদোষে পড়িলা নিদ্রাত ।। (পৃঃ-৩২৮)

* * * *

কোথা গেলে পাইব প্রাণে রতন নিধি ।
পূর্ব জন্মের পাপে বিড়ম্বিল আমায় বিধি ।। (পৃঃ-৩৬৯)

এই প্রকার বহু উদধৃতি দিয়ে বলা যায় নারীর জীবনে যখনই দুর্যোগ নেমে এসেছে তখনই তার প্রতি কোন পুরুষ তো দূরের কথা - কোন নারীও সমবেদনা বা সহানুভূতি জানাতে বা তার পক্ষ সমর্থন করতে এগিয়ে আসেনি।

পরন্তু সবাই সমবেত কণ্ঠে সেই নারীকে নিন্দা করেছে আর তার প্রতি সামাজিক নিপীড়নের চাপকে শতগুনে বর্দ্ধিত করতে সাহায্যই করেছে। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের নায়িকা রাধার জীবনে শ্রীকৃষ্ণের বলিষ্ঠ আবির্ভাবের সহায়িকা বড়াই। রাধার প্রতিবাদের সমর্থন সে তার অভিভাবিকা বড়াই-এর কাছে পায়নি। আবার কৃষ্ণময়ী রাধা যখন কৃষ্ণের জন্য অধীরা তখন কৃষ্ণের সুরে সুর মিলিয়ে বড়াই-ও রাধাকে তার নিজ কর্মদোষের জন্য বিদ্রূপ করেছে। আর রাধা বলেছে তার সমস্ত পরিণতি নিশ্চয়ই তার পূর্বজন্মের কোন খণ্ড ব্রতেরই ফল। মনসামঙ্গলকাব্যের নায়িকা বেহুলাও পুরুষ বা নারী কোন মানুষের কাছে সহানুভূতি পায়নি। পেয়েছে নিন্দা তার বৈধব্যের জন্য - যে বৈধব্য তার নিজের কোন অপরাধের ফলশ্রুতি নয়। মনসা যখন শিবের সঙ্গে বাড়ীতে এসেছে তখন নিজ পরিচয় দেবার বা আত্মপক্ষ সমর্থন করে শিব যে তার পিতা একথা বোঝাবার সুযোগ পায়নি তার মাতৃস্থানীয়া শিবের দুই পত্নীর কাছে। পরন্তু এতই প্রহৃত হয়েছে যে তার একটা চোখ পর্যন্ত হারাতে হয়েছে, কাঁকালের হাড়ও গেছে ভেঙ্গে। তাদের স্বামী শিব চরিত্রহীন একথা তারা জানতো। কিন্তু সেজন্য শিবকে নিন্দা করার বদলে কল্পিত তৃতীয় সপত্নী মনে করে কন্যা সাদৃশ্যা মনসাকে প্রহার করেছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের মানবিক মূল্য কমে যায়, মানুষ স্বার্থপর, স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে এবং দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার চরমে উঠে যায়। মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রতিফলিত অসহায় নারী এমনি এক দুর্বলতর সামাজিক অঙ্গ। একদিকে

স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান অপরদিকে সমাজ ব্যবহার কুফল মধ্যযুগে নারীর জীবনে মানবিক ও মানসিক বিকাশ লাভের পথে পর্বত প্রমাণ বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৪। মধ্যযুগের সাহিত্য সম্ভার যে সব কাব্য দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে আছে তাদের বেশির ভাগই ধর্মীয় প্রেরণামূলক ও দেবমাহাত্ম্য প্রকাশ মূলক। কেবলমাত্র রোসাঙ রাজসভাকে কেন্দ্র করে কতিপয় মুসলমান কবির রচনা এবং মৈমনসিংহ গীতিকা নামে পরিচিত পূর্ববঙ্গের লোকগাথার সংগ্রহে নরনারীর প্রণয়মূলক রচনার সাক্ষাৎ মেলে। দেবমাহাত্ম্য প্রচার মূলক কাব্য সমূহের আপাত উদ্দেশ্য কোন শাপ ভ্রষ্টা দেবীর মর্তে আগমন ও মানব মানবীর নিকট পূজা আদায় করা। লক্ষ্যণীয় যে একমাত্র ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বা শ্রীকৃষ্ণবিজয়, চৈতন্যমঙ্গল প্রমুখ কাব্যসমূহে পুরুষ দেবতাদের প্রতিষ্ঠা মূলক কাব্য সমূহে সংশ্লিষ্ট দেবতা-গণের প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করতে হয়নি। বলা চলে এই পুরুষ-দেবতাদের মঙ্গল গীত হয়েছে প্রতিষ্ঠিত দেবতা হিসেবে। ব্যতিক্রম কেবল 'স্ত্রীলিঙ্গ' দেবতাদের নিয়ে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলি। এই দেবীর মধ্যে আমরা মনসা ও চন্ডীর নাম উল্লেখ করতে চাই। মনসার পূজা করতে অনিচ্ছুক চাঁদ সওদাগরকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলতে শুনি যে হাতে তিনি দেব শূলপাণীর পূজা করেছেন সে হাতে চেঙমুড়ি কানীর পূজা করতে পারবেন না। আর চন্ডীমঙ্গলের ধনপতি সদাগর

আরও এক পা এগিয়ে স্পষ্টই বলেছেন - 'স্ত্রীলিঙগ দেবতা আমি পূজা নাহি করি ।'

এই যুগের কাব্যে নারীর অবস্থার প্রতিফলন খুঁজতে গিয়ে আমাদের আর একটি দিক লক্ষ্য করার সুযোগ হয়েছে । সে দিকটা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার একটা যেন ঊষালগ্ন । তান্ত্রিক সাধনার পীঠস্থান তথা পুরুষ-দেবতার আরাধনায় অভ্যস্ত বাঙলাদেশে দেবশূলপাণীর পাশাপাশি মনসা বা চণ্ডী নামের নারী দেবতার বিজয়াভিযান । নির্যাতন, উপেক্ষা, বঞ্চনা, ও মর্যাদাহানির গ্লানি মনসাকে করেছে প্রতিহিংসা পরায়ণা । এক হিসেবে মনসা হচ্ছেন বহুযুগের নিপীড়িতা নারী আত্মার প্রতিনিধি স্থানীয়া । পুরুষ প্রধান ও পুরুষের স্বার্থরক্ষার জন্য রচিত শাস্ত্রপুরাণ ও স্মৃতি গ্রন্থাবলীর অনুশাসনে পরিচালিত মানব সমাজে নারীর কোন মানবিক অধিকারই স্বীকৃত ছিল না । সেই সমাজে শিবের ঔরসজাত সন্তান হয়েও মনসাকে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করতে গিয়ে যে সব বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সে সব বাধা সে অতিক্রম করেছে দৈবক্ষমতার অধিকারী বলে । বেহুলার জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতার অবসান ও ঘটেছে দেবী মনসার পরোক্ষ অথচ নিরবচ্ছিন্ন সহায়তার ফলে । এমনি করে বিভিন্ন কাব্য বিশ্লেষণ করে আমরা একটা সিদ্ধান্তে এসেছি । যে যুগে ন্যায্য অধিকার আদায় করে নেবার জন্য কোন সঙঘবদ্ধ মানবলোকের আন্দোলন গড়ে তোলার মানসিকতার খোঁজ মানুষ পায়নি সে যুগের কবি তার কাব্যের

পাত্রপাত্রীর জীবনের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য দৈববলের উপর নির্ভর করেছেন। এই দৈবনির্ভরশীলতাই মধ্যযুগের মানুষের ছিল একমাত্র অবলম্বন। সমাজ ব্যবস্থায় যখন শাসক ও শোষক শ্রেণীর হাতেই সমস্ত স্তরের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে তখনই মানুষকে পূর্বজন্মের কর্মফল বা বিধিলিপি মেনে নিতে শিক্ষা দেয় সমসাময়িক সমাজের শাস্ত্র পুরাণাদির শিল্পীবৃন্দ। আর এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বসে কাব্যরচনাকারী শিল্পীবৃন্দও সেই শাস্ত্রীয় ও সামাজিক তত্ত্বকেই কাব্যে মূর্ত করে থাকেন। মধ্যযুগেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। নারীচিত্র চিত্রণে কবিদের যদি কিছু স্বকীয়তা বা সহানুভূতি বোধ জাগ্রত হয়েও থাকে তবুও সে জাগরণ খণ্ডিত বা গন্ডীবদ্ধ হয়েছে। কবিরা সমাজ জীবনের ঊর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে নারীজীবন সমীক্ষা করার অবকাশ পাননি বা সে রকম চেষ্টা করতে পারেন নি।

তাই আমাদের বিচারে বীরাঙ্গনা বেহুলা শ্বশুরকুলের সমস্ত সম্পদ উদ্ধার করে এলো আপন নারী জীবনের তথাকথিত শ্রেষ্ঠ সম্পদ স্বামীর জীবনসহ। তখনও কবি গতানুগতিকতাকে পাশ কাটিয়ে একটা বিজয় মুকুট পড়িয়ে দিতে পারলেন না বেহুলার শিরে। সেই রামায়ণে সীতার সতীত্বের পরীক্ষার পুনরাবর্তন। মৃতস্বামীকে নিয়ে একা বেহুলাকে নিয়ে কবি দেবলোক পরিক্রমা সেরে তার মানসী বেহুলাকে নিয়ে এলেন বিজয়িনী করে। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় এই নারীর জন্য কবি প্রথমেই তার পুনরুজ্জীবিত স্বামীর কণ্ঠে দিলেন সন্দেহের সুর। যে

নারী দেবতা মনসার অনুগ্রহে চাঁদসদাগরের সৌভাগ্যের অস্তমিত চন্দ্রের পুনরভ্যুত্থান সম্ভব হল সেই দেবীর প্রতি সসম্ভ্রম শ্রদ্ধার বদলে পুরুষ সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় চাঁদ পুত্রবধূর অনুরোধে পিছন ঘুরে দিলেন ফুল জল তাও বাঁ হাতে। কবি এখানে ব্যক্তি নিরপেক্ষ কাব্যমালিকার মালাকারের ভূমিকাই কেবল পালন করলেন।

এই মাৎস্য ন্যায়ের যুগের আপাত ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের মত স্ফুলিঙ্গের আলো কোথাও লক্ষ্য করা যায়নি তা নয়। সনকা যখন বেহুলাকে দায়ী করেছে তার পুত্রের মৃত্যুর জন্য তখন বেহুলাকে বলতে শুনি অন্য ছয়পুত্র যে তার শাশুড়ীর মারা গেছেন তারাও কি তারই জন্য। ফুল্লরা সুন্দরী নারীরূপী চণ্ডীকে বলছে সতীনের সঙ্গে দ্বিগুণ ঝগড়া করে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে। বলছে সেজন্য গৃহত্যাগ করা বা আত্মহত্যা করা ঠিক নয়। কিন্তু এই বাদানুবাদ হয়েছে নারীতে নারীতে। বেহুলা স্বামীর কাপুরুষের মত কথার প্রতিবাদ করে নি, সনকার বা খুল্লনার দেবীপূজার মঙ্গলঘট যখন তাদের স্বামী পদাঘাতে চূর্ণ করেছে তখন সেই নারীদেবতা তথানারী বিদ্বেষী স্বামীর সামনে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কোন তেজ দেখায় নি। অশ্রুজলে দেবীরই নিকট স্বামীর কল্যাণ কামনায় রয়েছে। যে ফুল্লরা সতীনের ঘর করার সম্ভাবনায় ভীতা হয়ে নারীরূপী দেবীকে তার গৃহ থেকে চলে যাবার জন্য অনুরোধ করছে তখন একটি বারের জন্যও তার স্বামীর তথা পুরুষের বিরুদ্ধে কটূক্তি করেনি। কেবল কল্পিত

বারমাসী দারিদ্র দুঃখ দুর্দশার জন্য নিজ কর্মদোষ ও পূর্বজন্মের কর্মফলের বা বিধিলিপিকে দায়ী করেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নায়িকার প্রাথমিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ চিত্রিত হয়েছে তাম্বুলখণ্ডে। যখন সে বড়ায়িকে চপেটাঘাত করে দেহভোগাকাঙ্ক্ষার আমন্ত্রণ মূলক কৃষ্ণপ্রেরিত তাম্বুলকে পদদলিত করেছে তখন যেন মনে হয়েছে রাধার নারী সত্তা প্রতিবাদ মুখর। কিন্তু অসহায়া রাধা তার দৈহিক পবিত্রতা রক্ষার জন্য সমাজ ও পরিবেশ থেকে কোন সাহায্য, প্রেরণা বা সমর্থন পায়নি তখন তাকে পরিস্থিতির পরিণামে রূপান্তরিত হতে হয়েছে। আইহনের বিবাহিতা স্ত্রীর কৃষ্ণময়ী রাধায় রূপান্তর ও তজ্জনিত বৈষ্ণবীয় দর্শনানুগ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সঙ্গে তাঁর হলাদিনী শক্তির মিলন প্রভৃতি ধর্মীয় মহিমামণ্ডিত মধুর রসের স্বাদ আলাদা। আমরা সেই তত্ত্বের আলোচনায় যেতে চাই না। আমরা এই পরিণতিকে সোজা কথায় বুঝতে চাই। ধর্মীয় বা রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী যে বা যারা তাদের কাছে অসহায়ের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ও আত্মরক্ষার পথ সবদিক থেকেই তারা অবরুদ্ধ করে আপন শাসন ও শোষন চালিয়ে থাকেন। অসহায়ের সেখানে স্বাতন্ত্র্যবোধ বিসর্জন দিয়ে লীন হয়ে যাওয়া ছাড়া বেঁচে থাকার অধিকার থাকে না। বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা মধ্যযুগের অসহায় নারীচরিত্রের এমনি এক উদাহরণ।

মঙ্গলকাব্যের নারীরা যেখানে পতিনিন্দা করেছেন সেখানে একটা অদ্ভূত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কোন 'সুন্দর'কে বা 'বালা'কে দেখে

পর্দার আড়ালে বা জনশ্রুতিগোচর না করে আপন মনে পতিনিন্দা করেছেন। এইসব নিন্দা করার মধ্যদিয়ে কবি চিত্রিত করেছেন এমন সব নারীকে যারা কেবল ভাবতে শিখেছে যে নারীদেহ মাত্রই পুরুষের ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করার জন্য গঠিত। তাই এদের পতিনিন্দা কোন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। দেহসর্বস্বা রমণ পিয়াসী অতৃপ্ত রমণীর সুন্দর পুরুষের অঙ্ক - শায়িতা হবার কাল্পনিক বিলাপমাত্র। এর দ্বারা সে যুগের কবি কল্পনার বিকাশে যে সমাজ ব্যবস্থা, শাসনযন্ত্র ও শাস্ত্রপুরাণাদির অনুশাসন কাজ করেছে তার সম্যক পরিচয় লাভ করি আর উপলব্দি করি নারী ছিল বুদ্ধি-হীনা, অবলা, অসহায়া একটা সামাজিক অংশ বিশেষ যার মর্যাদা ভোগ্য ও পণ্য দ্রব্য-সামগ্রীর ঊর্দ্ধে ছিল না।

৫। মনুসংহিতায় আছে — 'প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ সন্তানার্থঞ্চ - মানবাঃ'। (নবম স্বর্গ) আরও আছে যে কোন পিতার জ্যৈষ্ঠ সন্তান নারী হলে তার পিতার সম্পত্তিতে অধিকার বর্তায় না। সংহিতাকার ও স্মৃতিকারদের বহু উক্তি দিয়ে, আমরা বিস্তার বিশ্লেষণ করেছি আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে। এইরূপ শাস্ত্রাদির অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল মধ্যযুগে বেশ কয়েক শতাব্দী ধরেই। ফলে মজ্জাগত হয়েছিল পুরুষ সমাজের প্রতি তাদের আচরণ। পুরুষ সমাজ স্বীয় বাহুবল ও শাস্ত্রানু - মোদিত ধর্মবলে বলীয়ান হয়ে নারী জাতির স্বাতন্ত্র্যকে কোন দিনই স্বীকার করেন নি। ফলে নারী জাতিকে মর্যাদা দেবার মত মানসিকতা

পুরুষ সমাজে গড়ে ওঠেনি। অপরপক্ষে নারী তার আপন ভাগ্যকে পুরুষ ও দেবতা বা বিধাতার উপর ছেড়ে দিয়ে পুরুষ সমাজের গৃহপালিতা নরদেহ-ধারী প্রজা সৃজনের একটি যন্ত্রের মত জীবন যাপন করেছে।

সমগ্র মধ্যযুগ ধরে এদেশে যে রাজনৈতিক উত্থান পতনের ইতিহাস আমাদের সামনে উপস্থিত তাতে করে কোন সাংস্কৃতিক আন্দোলন দানা বাঁধার সুযোগ পায়নি। আদি তান্ত্রিক প্রভাব যুক্ত হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের উপন ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাসক কুলের প্রভাব যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তার ফলে হিন্দু সমাজ আপন সমাজকে এক কড়া বাঁধনে সংহত করে রাখার চেষ্টা চালায়। কিন্তু রাজকার্যে মুসলমান শাসক ও কর্মচারী-দের সঙ্গে মেলামেশার সুবাদে দেশে সংস্কৃত শাস্ত্রাদি ও মাতৃভাষায় রচিত ধর্মমত প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত গ্রন্থাদির প্রভাব কাটিয়ে সংস্কৃত চর্চার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালী, আরবী ও ফারসী শিক্ষালাভ করতেন। উচ্চ-বর্ণের অত্যাচারের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য অনেক নিম্নবর্ণের বাঙালী হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ফলে হিন্দু-মুসলমান সং সংস্কৃতির একটা সহাবস্থান বহুদিন ধরে চলে এসেছিল। কিন্তু এই সংস্কৃতির সহা-বস্থান কেবলমাত্র পুরুষ সমাজের মধ্যেই সীমিত ছিল। উভয় সমাজ আপনা-পন নারী সম্পদকে এই পরিবর্তনের আলো থেকে সচেষ্ট ভাবেই আড়ালে রেখেছিলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় বাঙালা দেশের তথা সারা ভারতের শাসন ক্ষমতা দখলেন একটা সুযোগ

এনে দিলো ইংরাজ বণিক শক্তির হাতে। ক্রমে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হলে খ্রীষ্ট ধর্মপ্রচার অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো। এই দুই রাজশক্তির ধর্মের মধ্যে শেষ রাজশক্তি খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাবই যে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক।

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকেরাও এদেশে যীশুর সমাচার প্রচারের জন্য আসেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অবশ্য এই মিশনারী কাজের এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু উইলবার ফোর্স ও লর্ড ওয়েলেসলি মিশনের পক্ষে বক্তৃতা করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ মঞ্জুর করার সময় সর্ত দেন যে ভারতে প্রজাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রবর্তন এবং তাদের ধর্ম ও নৈতিক উন্নতির জন্য যে সব ব্যক্তি ভারতে গিয়ে বসবাস করতে ইচ্ছে করেন, আইন দ্বারা তাদের কাজ করার যথোপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধা দিতে হবে। এই সনদ রচিত হয় ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে। এর ফলে মিশনের কাজে কোম্পানী বা স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান সমাজের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ শেষ হয়ে যায়। আর হিন্দু ও মুসলমান সমাজের নিম্নস্তরের মানুষেরা সামাজিক নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এবং ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার সুযোগ নেবার জন্য ধর্মান্তরিত হয়।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ইংরেজ শাসন ও ইংরেজী শিক্ষা

ঘোর তামসিকতাচ্ছন্ন জাতিকে প্রবল ভাবে আঘাত হানে। জাতির প্রাণ মনে বহু যুগের তন্দ্রাচ্ছন্নতা কেটে যায়। বাঙালীর অন্তর্জীবনে এক বিরাট বিপ্লবের সূচনা হয়। এই বৈপ্লবিক জাগরণের মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে জাতি তার আত্মপরিচয় খুঁজে পায়। প্রচলিত কুসংস্কার ও অন্ধ ধর্মবোধের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করার ক্ষমতা অর্জন করে।

এই আত্মবিস্মৃত জাতির বিদেশী পথ প্রদর্শকদের অবদান স্বীকার করেও যাকে সর্বপ্রথম অর্ঘ্য দিতে হয় তিনি রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। তিনিই সর্বপ্রথম বাস্তবপ্রয়োজন ও যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে প্রচলিত সমাজ শাসন ও শাস্ত্রবিধি অমান্য করার পথ নির্দেশ দেন। শাস্ত্রবিধির শাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা যুক্তি বিজ্ঞানের সাহায্যে রামমোহন যে ভাবে প্রবর্তন করেন তাকে যুগের মুক্তি মন্ত্র বললে অত্যুক্তি হয় না।

রামমোহনই বুঝেছিলেন যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতিকে বাঁচাতে হলে পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন। তার সেজন্য তিনি সব বাধা তুচ্ছ করে সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ, কৌলীন্যপ্রথাজনিত বহুবিবাহ রোধ, ইত্যাদির জন্য আন্দোলন করে নারী জাতির মুক্তি আন্দোলনের জন্য কাজ করে যান। বিলাত গেলে জাত যায় না এটা প্রমাণ করার জন্য তিনি বিলাত যান।

মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর রামমোহন রায়ের প্রারব্ধ কাজকে আরও এগিয়ে দিয়েছিলেন। রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ব্রহ্মবাদী ছিলেন। একেশ্বরবাদী ছিলেন বলেই হিন্দু পৌত্তলিকদের সঙ্গে তাদের একটা ব্যবধান ছিল। কিন্তু সমাজ সংস্কারের ও স্ত্রী শিক্ষার প্রসারের জন্য তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়।

এইসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) কথাও স্মরণীয়। তিনি ছিলেন হিন্দু সমাজের প্রগতিশীল নেতাদের অন্যতম। সংস্কৃত শাস্ত্রের অসাধারণ পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র গোঁড়া ছিলেন না, কুসংস্কারের দাসত্ব তিনি করেন নি। তিনি প্রাচ্য দর্শনের ব্যবহারিক মূল্যের বিচারে পাশ্চাত্য দর্শনের মূল্য নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন জন্য রাম-মোহন রায় থেকে একটু আলাদা। কিন্তু সতীদাহ, কৌলীন্য প্রথা জনিত বহু বিবাহ প্রভৃতি কুসংস্কারের বিরোধিতা করেছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা ও বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে তাঁর দান অনস্বীকার্য। হিন্দু ব্রাহ্মণের পোশাক পরিচ্ছদ ধারণ করেও আধুনিক যুক্তি বিজ্ঞান ও অন্ধ কুসংস্কার মুক্ত জীবন যাপন করে এবং দেশবাসীর সামনে আদর্শ স্থাপন করে তিনি স্মরণীয় হয়েছেন। নারী মুক্তির জন্য বিদ্যাসাগর অধিকতর স্মরণীয়।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনে ইংরেজ বেথুন সাহেবের নাম

স্মরণীয় । বিদ্যাসাগর বেথুন সাহেবের এই কাজে সহায়তা করেছিলেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে জে, ই, ডি, বেথুন একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং বিদ্যাসাগরকে এই প্রতিষ্ঠানের অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত করেন । এই দুই ব্যক্তির চেষ্টায় বিভিন্ন জেলায় অনেক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ।

বিধবা বিবাহ আন্দোলন বিদ্যাসাগরকে অধিকতর স্মরণীয় করেছে। স্বদেশীয় লোকদের বহু বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে ঈশ্বরচন্দ্র বিধবা বিবাহ আইন পাশ করাতে সক্ষম হয়েছিলেন । যদিও এই আইনের বাস্তবায়নের পথে নারীর শত শত শতাব্দীর স্থবির মানসিকতা এবং সমাজ ব্যবস্থা এক পর্বত প্রমাণ বাধা হয়ে আছে আজও ।

কাব্য যুগ পেরিয়ে গদ্য যুগে প্রবেশ কাল থেকে সাহিত্যে সামাজিক প্রতিফলন আরও বিচিত্রতা লাভ করেছে । নবজাগ্রত রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের চেতনা , ধর্মীয় সংস্কার চেতনা , সমস্ত প্রকার শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে আসার জন্য মানসিক সংগ্রামের চেতনার প্রতিফলন হয়েছে সাহিত্যে । কিন্তু উষালগ্নে উপন্যাসে ও নাটকে আমরা কিছু নারী চরিত্র অঙ্কিত হতে দেখেছি । তাদের অনেকেই হয়ত কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার ঔপন্যাসিকের মানসলোকবিহারিণী, কিন্তু ঐ মানসলোকবিহারিণীগণ তো সমাজ থেকেই এসেছেন । তাই সে সব সাহিত্যে

বিশেষ করে সামাজিক উপন্যাসে সমাজে নারীর অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে রোহিনী, কিরণময়ী, সাবিত্রী, সুচরিতা, ললিতারা এই যুগের প্রতিনিধি স্থানীয়া। রোহিনীর দল কিরণময়ী সাবিত্রীতে এসে লড়াই করে হেরে গেছে। কিন্তু সুচরিতা ললিতাতে এসে আপন অধিকার জয় করে নিয়েছে।

কিন্তু আইন পাশ হয়ে থাকলেও বিধবাদের পুনর্বিবাহের ব্যাপক মানসিকতা তৈরি হয়নি বলে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। শরৎচন্দ্র সাবিত্রী তার উদাহরণ। তেমনি স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ প্রভৃতির অত্যাচার নিপীড়ণ থেকে মুক্ত হবার জন্য 'হিন্দু কোড' বিল পাশ হয়ে থাকলেও সে আইনের আশ্রয় না নিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে আত্ম-নিধনের পথ গ্রহণ করতে হচ্ছে আজও নারীকে - বর্তমান সংবাদ সাহিত্য তার প্রমাণ, তা প্রতিদিনই আমাদের চিত্ত ভারাক্রান্ত করছে। ক্ষমতা-শালী মধ্যযুগ যেন তার প্রভাবকে অক্ষুন্ন রেখেছে আধুনিক যুগেও।

যে চিত্র আমরা মধ্যযুগের কাব্য পাঠে পেলাম তা নৈরাশ্য ব্যঞ্জক সন্দেহ নেই। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রভাব থেকে আপন সমাজ দেহকে রক্ষা করার জন্য স্মৃতি ও পুরাণকারেরা যে বিধি নিষেধ আরোপ করে নারী জীবনকে রুদ্ধ ও অবসন্ন করে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন তার কল্যাণের দিক যদি কিছু থেকেও থাকে তা ব্যর্থ হয়ে

অকল্যাণকেই ডেকে এনেছে। তাই আজও সমাজ নারীকে তার ন্যায্য আসন ও মর্যাদা পুরোপুরি দিতে পারছে না।

কোন কথারই শেষ কথা কেউ বলতে পারে না, তাই কবি **Wordsworth** অতৃপ্তির সাথে বলেছিলেন **--'One word more'** রবীন্দ্রনাথ বললেন 'তার শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?' আমারও সে দু:সাহস নেই। শেষ যার নেই তার শেষ না বলেই শেষ করলাম।

***
****
***

গ্রন্থপঞ্জী

প্রাথমিক উৎস

কাশীরাম দাস	: মহাভারত	: দেবসাহিত্য কুটীর প্রকাশিত। ১৯৭৬
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ	: মনসামঙ্গল	: (১ম খন্ড) পরিবর্তিত সংস্করণ। যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য, এম, এ, তত্ত্ব রত্নাকর, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক, কটন কলেজ, গৌহাটি-সম্পাদিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৯৪৯
কৃত্তিবাস	: রামায়ণ	: দেবসাহিত্য কুটীর প্রকাশিত।
কবি শুকুর মাহমুদ	: গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস	: আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯৭৪
ঘনরাম চক্রবর্তী	: ধর্মমঙ্গল	: শ্রী পীযূষ কান্তি মহাপাত্র, এম, এ, সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯৬২

জগজ্জীবন ঘোষাল	: মনসামঙ্গল	: শ্রী সুরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কাব্যতীর্থ ও অধ্যাপক ড: আশুতোষ দাস এম, এ, ডি, ফিল সম্পাদিত । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯৬০
তন্ত্র বিভূতি	: মনসাপুরাণ	: ড: আশুতোষ দাস, এম, এ (ডবল), পি, এইচ, ডি, ডি, লিট, এফ, আর, এ, এস (লণ্ডন) সম্পাদিত । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত । ১৯৬০
দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত	: মৈমনসিংহ-গীতিকা	: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ।
দৌলতকাজী	: সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী	: ড: মযহারুল ইসলাম ও মুহম্মদ আব্দুল হাকিম সম্পাদিত । দ্বিতীয় সংস্করণ । ১৯৭০
নারায়ণ দেব	: পদ্মাপুরাণ (মনসামঙ্গল)	: অধ্যাপক তমোনাশ দাশগুপ্ত, এম, এ, পি, এইচ, ডি, সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত । ১৯৬২

বড়ু চণ্ডীদাস	: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	: বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রী মদন মোহন কুমার সম্পাদিত নবম সংস্করণ। ১৩৮০ বঙ্গাব্দ
বিজয়গুপ্ত	: পদ্মাপুরাণ	: শ্রী জয়ন্ত কুমার দাসগুপ্ত, এম, এ, প্রধান শিক্ষক, বরিশাল, ব্রজমোহন বিদ্যালয় কর্তৃক সম্পাদিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত।
মানিক দত্ত	: চণ্ডীমঙ্গল	: শ্রী সুনীল কুমার ওঝা, এম, এ, পি, এইচ, ডি, সম্পাদিত। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ
মানিকরাম গাঙ্গুলী	: ধর্মমঙ্গল	: শ্রী বিজিত কুমার দত্ত ও শ্রী সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ব - বিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯৬০
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	: চণ্ডীমঙ্গল	: শ্রী সুকুমার সেন সম্পাদিত। সাহিত্য একাডেমী, নয়াদিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩৮২ বঙ্গাব্দ

রামকৃষ্ণ রায় : শিবায়ন : শ্রী দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য : শিবসঙ্কীর্তন বা শিবায়ন : আমতা কলেজের অধ্যাপক শ্রী যোগিলাল হালদার, এম, এ, কর্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯৫৭

রায়গুনাকর ভারতচন্দ্র : অন্নদামঙ্গল : ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কলিকাতা-৬ কর্তৃক প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

সহায়ক গ্রন্থ

অরবিন্দ পোদ্দার : মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য ও মানব স্বীকৃতি :

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড)	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় । ১৯৫৯
আশুতোষ ভট্টাচার্য্য	বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় । ১৯৭০
আশুতোষ ভট্টাচার্য্য	বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা	
ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত)	পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খণ্ড) প্রথম সংস্করণ	শ্রী হিমাংশু ভূষণ মৌলিক কর্তৃক প্রকাশিত । ১৯৭০
গিরীশ চন্দ্র দাস	বাংলা পীর সাহিত্যের কথা	শেহিদ লাইব্রেরী, কাজীপাড়া, বারাসত, চব্বিশ পরগণা ।
নীহার রঞ্জন রায়	বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)	সাক্ষরতা প্রকাশন । ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

রমেশ চন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম ও ২য় খন্ড)। : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

শঙ্করী প্রসাদ বসু : কবি ভারতচন্দ্র : ১৩৮১ বঙ্গাব্দ

সুকুমার সেন : ক) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম ও ২য় খন্ড)। :
খ) ইসলামী বাংলা সাহিত্য।

Haridas Bhattacharyya : The Cultural Heritage of India. : Ramkrishna Institute of Culture.

Jadunath Sarkar : History of Bengal. : Dacca University.

Ramesh Chandra Majumder : The History of Bengal -Vol.I (Hindu period) : Dacca University.

S.A.A. Rizvi : The wonder that was India-Vol.II : Sidgwick & Jackson, London, 1987.

NORTH BENGAL
UNIVERSITY LIBRARY
RAJA RAMMOHUNPUR